২

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

দ্বিতীয় খণ্ড

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সূচীপত্র

আবু মূসা আল-আশয়ারী (রা)

আবদুল্লাহ নাম, আবু মূসা কুনিয়াত। কুনিয়াত দ্বারাই তিনি অধিক পরিচিত। পিতা কায়েস, মাতা 'তাইয়্যেবা'। তাঁর ইসলামপূর্ব জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়না। এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন। তথাকার 'আল-আশয়ার' গোত্রের সন্তান হওয়ায় তিনি 'আল-আশয়ারী' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত আবু মূসা ইসলামের পরিচয় লাভ করে ইয়ামন থেকে মক্কায় আসেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত হন। মক্কার 'আবদু শামস' গোত্রের সাথে বন্ধু সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিছুদিন মক্কায় অবস্থানের পর স্বদেশবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইয়ামন ফিরে যান।

হযরত আবু মূসা ছিলেন তাঁর খান্দানের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। খান্দানের লোকেরা খুব দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয়। প্রায় পঞ্চাশজন মুসলমানের একটি দলকে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যাওয়ার জন্য ইয়ামন থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। সমুদ্রের প্রতিকূল আবহাওয়া এ দলটিকে হিজাযের পরিবর্তে হাবশায় ঠেলে নিয়ে যায়। এদিকে হযরত জাফর বিন আবী তালিব ও তাঁর সংগী সাথীরা—যাঁরা তখনও হাবশায় অবস্থান করছিলেন, মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। আবু মূসা তাঁর দলটিসহ এই কাফিলার সাথে মদীনার পথ ধরলেন। তাঁরা মদীনায় পৌঁছলেন, আর এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী খাইবার বিজয় শেষ করে মদীনায় ফিরেন। রাসূল (সা) আবু মূসা ও তার সংগী সকলকে খাইবারের গনীমতের অংশ দান করেন।

হযরত আবু মূসা মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধে শরিক ছিলেন। হুনাইনের ময়দান থেকে পালিয়ে বনু হাওয়াযিন 'আওতাস' উপত্যকায় সমবেত হয়। রাসূল (সা) তাদেরকে সমূলে উৎখাতের জন্য হযরত আবু আমেরের নেতৃত্বে একটি দল পাঠান। তারা আওতাস পৌঁছে হাওয়াযিন সরদার দুরাইদ ইবনুস সাম্মাকে হত্যা করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে হাশামী নামক এক মুশরিকের নিক্ষিপ্ত তীরে হযরত আবু আমের মারাত্মকভাবে আহত হন। আবু মূসা আশয়ারী পিছু ধাওয়া করে এই মুশরিককে হত্যা করেন।

হযরত আবু আমের মৃত্যুর পূর্বে আবু মূসাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং আবু মূসার কাছে এই বলে অনুরোধ করেন যে, 'ভাই, রাসূলুল্লাহর (সা) খেদমতে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দুআ করতে বলবেন।' আবু আমের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আবু মূসা তাঁর বাহিনীসহ মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবু আমেরের অন্তিম অসীয়াতের কথা বর্ণনা করলেন। রাসূল (সা) সাথে সাথে পানি আনিয়ে অযু করলেন এবং আবু আমেরের মাগফিরাত কামনা করে দুআ করলেন। আবু মূসা আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্যও একটু দুআ করুন।' রাসূল (সা) দুআ করলেন, "হে আল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবন কায়েসের পাপসমূহ মাফ করে দিন। কিয়ামতের দিন সম্মানের সাথে তাকে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দিন।"

হিজরী নবম সনে তাবুক অভিযানের তোড়জোড় চলছে। আবু মূসার সংগী-সাথীরা তাকে পাঠালেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তাদের জন্য সওয়ারী চেয়ে আনার জন্য। ঘটনাক্রমে আবু মূসা যখন পৌঁছলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তখন যে কোন কারণেই হোক একটু উত্তেজিত ছিলেন। আবু মূসা না বুঝে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার সাথীরা আমাকে পাঠিয়েছে, আপনি যেন

তাদেরকে, সওয়ারী-দান করেন। 'রাসূল (সা) বসে ছিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন ঃ' আল্লাহর কসম, তোমাদের কোন সওয়ারী আমি দেবনা।' আবু মূসা ভীত হয়ে পড়লেন, না জানি কোন বেয়াদবী হয়ে গেল। অত্যন্ত দুঃখিত মনে ফিরে এসে সংগী-সাথীদের তিনি এ দুঃসংবাদ দিলেন। কিন্তু তখনও তিনি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেননি, এর মধ্যে হযরত বিলাল দৌড়ে এলেন ঃ' আবদুল্লাহ ইবন কায়েস, কোথায় তুমি ? চলো রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে ডাকছেন।" তিনি বিলালের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হলেন।

রাসূল (সা) নিকটেই বাঁধা দু'টি উটের দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ 'এ দু'টিকে তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে যাও।' হযরত আবু মূসা উট দু'টি নিয়ে গোত্রীয় লোকদের কাছে ফিরে এসে বললেনঃ "রাসূল (সা) এ দু'টি উট তোমাদের সওয়ারী রূপে দান করেছেন, তবে তোমাদের কিছু লোককে আমার সাথে এমন একজন লোকের কাছে যেতে হবে যে রাসূলুল্লাহর পূর্বের কথা শুনেছিল। যাতে তোমাদের এ ধারণা না হয় যে, আমি আগে যা বলেছিলাম তা আমার মনগড়া কথা ছিল।" লোকেরা বললো ঃ আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলেই বিশ্বাস করি। তবে আপনি যখন বলছেন, চলুন।' এভাবে কিছু লোককে সংগে নিয়ে তিনি তাঁর পূর্বের কথার সত্যতা প্রমাণ করেন।

তাবুক থেকে ফেরার পর একদিন আশয়ারী-গোত্রের দু'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশয়ারীকে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে গেল। তারা রাসূলুল্লাহর কাছে যে কোন একটি পদ লাভের আকাঙ্খা ব্যক্ত করলো। রাসূল (সা) মিসওয়াক করছিলেন। তাদের কথা শুনে তাঁর মিসওয়াক করা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আবু মূসার দিকে ফিরে বললেন ঃ 'আবু মূসা, আবু মূসা !' আবু মূসা আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাদের অন্তরের কথা জানতাম না। আমি জানতাম না এ ভাবে তারা কোন পদ লাভের আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে।" রাসূল (সা) বললেন ঃ যদি কেউ নিজেই কোন পদের আকাঙ্খী হয়, আমি কক্ষনো তাকে সেই পদে নিয়োগ করবো না। তবে, আবু মূসা তুমি ইয়ামন যাও। আমি তোমাকে সেখানকার ওয়ালী নিয়োগ করলাম।"

সেই প্রাচীনকাল থেকে ইয়ামন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ ইয়ামন আকসা ও ইয়ামন আদনা, হযরত মুয়াজ বিনজাবালকে ইয়ামন আকসার এবং আবু মূসাকে ইয়ামন আদনার ওয়ালী নিয়োগ করা হয়। দু'জনকে বিদায় দেওয়ার সময় রাসূল (সা) তাদেরকে এই বলে উপদেশ দেন ঃ "ইয়ামনবাসীর সাথে নরম ব্যবহার করবে, কোন প্রকার কঠোরতা করবে না। মানুষকে খুশী রাখবে, ক্ষেপিয়ে তুলবে না। পরস্পর মিলে মিশে বসবাস করবে।"

নিজ দেশ হওয়ার কারণে ইয়ামন বাসীর ওপর হযরত আবু মূসার যথেষ্ট প্রভাব পূর্ব থেকেই ছিল। তাই সুষ্ঠু ভাবেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। পার্শ্ববর্তী ওয়ালী হযরত মুয়াজ বিন জাবালের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। মাঝে মাঝে সীমান্তে গিয়ে তাঁরা মিলিত হতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর মত বিনিময় করতেন।

হিজরী দশম সনে রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ হজ্জ আদায় করেন। হযরত আবু মূসা ইয়ামন থেকে এসে হজ্জে অংশ গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন কায়েস, তুমি কি হজ্জের উদ্দেশ্যে এসেছ ?' জবাব দিলেন ঃ হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! প্রশ্ন করলেন ঃ 'তোমার নিয়ত কি ছিল ? বললেন ঃ আমি বলেছিলাম, রাসূল্লাহর (সা) যে নিয়াত আমারও সেই নিয়াত।' আবার প্রশ্ন করলেন ঃ কুরবানীর পশু সংগে এনেছো কি ?' বললেন ঃ না।' রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন. তাওয়াফ ও সায়ী করার পর ইহরাম ভেঙ্গে ফেল। (সহীহুল বুখারী) উল্লেখ্য যে, রাসূল (সা) হজ্জে 'কিরান' আদায় করেছিলেন। আর হজ্জে কিরানের জন্য কুরবানীর পশু সংগে নেওয়া জরুরী।

হজ্জ শেষে আবু মূসা ইয়ামন ফিরে আসেন। এদিকে আসওয়াদ আনাসী নামক এক ভণ্ড নবী নবুওয়াত দাবী করে, বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। এমনকি হযরত মুয়াজ বিন জাবাল আবু মূসার রাজধানী- 'মারেব' চলে আসতে বাধ্য হন। এখানেও তারা বেশী দিন থাকতে পারলেন না। অবশেষে তারা হাদরামাউতে আশ্রয় নেন। যদিও ইবন মাকতুহ মুরাদী আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করেন, তবুও রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালে আবার বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অতঃপর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) মদীনা থেকে একটি বাহিনী পাঠিয়ে এই বিদ্রোহ নির্মূল করেন। ইয়ামনের দুই ওয়ালী নিজেদের স্থানে আপন আপন দায়িত্বে ফিরে গেলেন। হযরত আবু মূসা হাদরামাউত থেকে স্বীয় কর্মস্থল মারেব ফিরে আসেন এবং দ্বিতীয় খলীফার খিলাফত কালের প্রথমপর্যায় পর্যন্ত অত্যন্ত সফলভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা শুরু হলে আবু মূসা (রা) জিহাদে শরিক হওয়ার প্রবল আকাঙ্খায় ওয়ালীর দায়িত্ব ত্যাগ করে হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাসের বাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। হিজরী ১৭ সনে সেনাপতি সা'দের নির্দেশে তিনি 'নাসিবীন' জয় করেন। এ বছরই বসরার ওয়ালী মুগীরা ইবন শু'বাকে (রা) অপসারণ করে তাঁর স্থলে আবু মূসাকে (রা) নিয়োগ করা হয়।

খুযিস্তান হচ্ছে বসরার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা। ঐ এলাকাটি তখনও ইরানীদের দখলে ছিল। হিজরী ১৬ সনে খুযিস্তান দখলের উদ্দেশ্যে হযরত মুগীরা (রা) আহওয়াযে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। আহওয়াযের সর্দার অল্প কিছু অর্থ বার্ষিক কর দানের বিনিময়ে মুগীরার সাথে সন্ধি করে। মুগীরা ফিরে যান। হিজরী ১৭ সনে মুগীরার স্থলে আবু মূসা দায়িত্ব গ্রহণ করলে আহওয়াযবাসী কর প্রদান বন্ধ করে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাধ্য হয়ে আবু মূসা সৈন্য পাঠিয়ে আহওয়ায দখল করেন এবং মানাযির পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত রাখেন। বিশিষ্ট সেনা অফিসার হযরত মুহাজির ইবন যিয়াদ (রা) এই মানাযির অভিযানের এক পর্যায়ে শাহাদাত বরণ করেন। শত্রু বাহিনী তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে কিল্লার গম্বুজে ঝুলিয়ে রাখে। আবু মূসা হযরত মুহাজিরের ভাই হযরত রাবীকে মানাযির দখলের দায়িত্ব দেন। রাবী মানাযির দখলে সফল হন।

এদিকে হযরত আবু মূসা 'সোস' অবরোধ করেন। শহরবাসী কিল্লায় আশ্রয় নেয়। অবশেষে তাদের নেতা এই শর্তে আবু মূসার সাথে সমঝোতায় পৌঁছে যে, তাঁর খান্দানের এক শ' ব্যক্তিকে জীবিত রাখা হবে। নেতা এক এক করে এক শ' ব্যক্তিকে হাজির করলো এবং আবু মূসা তাদের মুক্তি দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নেতা নিজের নামটি পেশ করতে ভুলে গেল এবং সন্ধির শর্তানুযায়ী তাকে হত্যা করা হলো। 'সোস' অবরোধের পর আবু মূসা 'রামহরমুয' অবরোধ করেন এবং বার্ষিক আট লাখ দিরহাম কর আদায়ের শর্তে তাদের সাথে সন্ধি হয়।

চারদিক থেকে তাড়া খেয়ে শাহানশাহে ইরানের সেনাপতি 'হরমুযান' শোশতার-এর মজবুত কিল্লায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। আবু মূসা শহরটি অবরোধ করে বসে আছেন। শহরটির পতনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এক ব্যক্তি গোপনে শহর থেকে বেরিয়ে আবু মূসার ছাউনীতে চলে এলো। সে প্রস্তাব দেয়, যদি তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, সে শহরের পতন ঘটিয়ে দেবে। লোকটির শর্ত মনজুর হলো। সে 'আশরাস' নামক এক আরবকে সংগে নিল। আশরাস চাদর দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে চাকরের মত লোকটির পিছে পিছে চললো। তারা নদী ও গোপন সুড়ঙ্গ পথে শহরে প্রবেশ করে এবং নালা অলি-গলি পেরিয়ে হরমুযানের খাস মহলে গিয়ে হাজির হয়। এভাবে আশরাস শহরের সব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গোপনে আবার আবু মূসার কাছে ফিরে আসে এবং বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে। অতঃপর আবুমূসার নির্দেশে আশরাস দু'শো জানবাজ সিপাহী সংগে করে হঠাৎ আক্রমণ করে দ্বার-রক্ষীদের হত্যা করে দরযা খুলে দেয়। এদিকে

আবু মূসা ও তাঁর সকল সৈন্যসহ দরজার মুখেই উপস্থিত ছিলেন। দরযা খোলার সাথে সাথে সকল সৈনিক একযোগে নগর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। শহরে হৈ চৈ পড়ে যায়। হরমুযান দৌড়ে কিল্লায় আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী কিল্লার পাশে পৌঁছলে হরমুযান কিল্লার গম্বুজে উঠে ঘোষণা করে যে, যদি আত্মসমর্পণের পর মদীনায় 'উমারের কাছে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি আত্মসমর্পণে রাজী। তাঁর শর্ত মনজুর করা হয় এবং তাকে হযরত আনাসের (রা) সাথে দারুল খিলাফাত মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

'শোশতার' বিজয়ের পর আবু মূসার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী 'জুনদিসাবুর' অবরোধ করে। এ অবরোধ বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। একদিন শহরবাসী হঠাৎ শহরের ফটক উন্মুক্ত করে দেয়। তারা অত্যন্ত শান্তভাবে আপন আপন কাজে ব্যস্ত। মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করে তাদের এমন নিঃশঙ্কভাব দেখে অবাক হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলে তারা জানালো, কেন আমাদের তো জিযিয়ার শর্তে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, মুসলিম বাহিনীর এক দাস সকলের অগোচরে একাই এ নিরাপত্তার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সেনাপতি আবু মূসা দাসের এ চুক্তি মানতে অস্বীকার করলেন। শহরবাসী বললো, কে দাস, কে স্বাধীন তা আমরা জানিনে। শেষে বিষয়টি মদীনায় খলিফার দরবারে উত্থাপিত হলো। খলীফা জানালেন, 'মুসলমানদের দাসও মুসলমান। যাদেরকে সে আমান বা নিরাপত্তা দিয়েছে, সকল মুসলমানই যেন তাদের আমান দিয়েছে।' এভাবে আবু মূসার নেতৃত্বে গোটা খুযিস্তানে ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং সেই সাথে তাঁর অবস্থান স্থল বসরা শত্রুর হুমকি থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

খুযিস্তানের পতনের পর হিজরী ২১ সনে ইরানীরা নিহাওয়ান্দে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। খলীফা উমার (রা) নু'মান ইবনে মুকরিনকে বিরাট এক বাহিনীসহ নিহাওয়ান্দে পাঠান এবং আবু মূসাকে তাঁকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। খলীফার নির্দেশ পেয়ে বিরাট এক বাহিনীসহ তিনি নিহাওয়ান্দে পৌঁছেন। এ যুদ্ধেও ইরানী বাহিনী মারাত্মকভাবে পরাজয় বরণ করে।

খুযিস্তান জয়ের পর বিজিত এলাকা বসরার সাথে একীভূত করার জন্য আবু মূসা আবেদন জানালেন খলীফার কাছে। এদিকে কুফাবাসীরাও কুফার সাথে একীভূত করার দাবী জানালো তাদের ওয়ালী আম্মার বিন ইয়াসিরের (রা) নিকট। খলীফা আবু মূসার দাবী সমর্থন করে বিজিত এলাকা বসরার সাথে একীভূত করলেন। এ দিকে কুফাবাসী তাদের দাবী পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় হযরত আম্মারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অবশেষে খলীফা কুফাবাসীদের দাবী অনুযায়ী আম্মারকে সরিয়ে হিজরী ২২ সনে আবু মূসাকে কুফার ওয়ালী নিযুক্ত করেন। কিন্তু একবছর পর হিজরী ২৩ সনে আবার বসরায় বদলী হন।

এ বছরই [হিঃ ২৩] 'দাব্বা' নামক এক ব্যক্তি খলীফার কাছে আবু মূসার বিরুদ্ধে নিম্নের অভিযোগগুলি উত্থাপন করে ঃ

১· আবু মূসা যুদ্ধবন্দীদের থেকে ষাটজন সর্দার পুত্রকে নিজেই নিয়ে নিয়েছেন।

২· তিনি শাসন কার্যের যাবতীয় দায়িত্ব যিয়াদ ইবন সুমাইয়্যার ওপর ন্যস্ত করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে যিয়াদই এখন সকল দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

৩· তিনি কবি হুতাইয়্যাকে এক হাজার দিরহাম ইনয়াম দিয়েছেন।

৪· 'আকলিয়্যা নাম্নী তাঁর এক দাসীকে দু'বেলা উত্তম খাবার দেওয়া হয়, অথচ তেমন খাবার সাধারণ মানুষ খেতে পায় না।

হযরত 'উমার নিজহাতে অভিযোগগুলি লিখলেন। আবু মূসাকে মদীনায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। অভিযোগগুলির সত্য মিথ্যা নিরুপনের জন্য যথারীতি অনুসন্ধান চালালেন। প্রথম অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণিত হলো। দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব দিলেন যে, যিয়াদ একজন তুখোড়

রাজনীতিক ও দক্ষ প্রশাসক। তাকে আমি উপদেষ্টা নিয়োগ করেছি। খলীফা যিয়াদকে ডেকে পরীক্ষা নিলেন এবং তাঁকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পেলেন। যিয়াদকে তাঁর পদে বহাল রাখার নির্দেশ দিলেন। তৃতীয় অভিযোগের জবাবে বললেন, হুতাইয়্যা যাতে আমার হিজু (নিন্দা) না করে এ জন্য আমি তাকে আমার নিজস্ব অর্থ থেকে উপঢৌকন দিয়েছি। কিন্তু চতুর্থ অভিযোগের কোন জবাব তিনি দিতে পারলেন না। হযরত উমার (রা) একটু বকাবকি করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। (তাবারী)

আবু মূসা এ বছরই (হিঃ ২৩) ইস্পাহানে অভিযান চালিয়ে অঞ্চলটি ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইস্পাহান বিজয় শেষ করে ফিরে এলে সেই বছরই তাঁকে বসরা থেকে কুফায় বদলী করা হয়।

বসরাবাসীদের ভীষণ পানি-কষ্ট ছিল। বিষয়টি খলিফার দরবারে পৌঁছানো হলো। দিজলা নদী থেকে খাল কেটে বসরা শহর পর্যন্ত নেওয়ার জন্য খলীফা নির্দেশ দিলেন। আবু মূসার নেতৃত্বে দশ মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করে বসরাবাসীর পানি-কষ্ট দূর করা হয়। ইতিহাসে এ খাল 'নহরে আবী মূসা নামে প্রসিদ্ধ।

হিজরী ২৩ সনে জিলহজ্জ মাসে দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) শাহাদাত বরণ করেন। হযরত 'উসমান খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রশাসনের কাঠামোতে অনেক রদবদল করেন। কিন্তু হিজরী ২৯ সন পর্যন্ত আবু মূসা বসরার ওয়ালীর পদে বহাল থাকেন।

হিজরী ২৯ সনে কুর্দীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবু মূসা মসজিদে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পর্কে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন। ভাষণে আল্লাহর রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলার ফজীলাত বর্ণনা করেন। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কিছু মুজাহিদ তাদের নিকট ঘোড়া থাকা সত্ত্বেও পায়ে হেঁটে চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু আবু মূসার কিছু সমালোচক তাদেরকে বললো ঃ "আমাদের এত তাড়াতাড়ি করা উচিত হবে না। দেখা যাক আমাদের আমীর আবু মূসা কি ভাবে চলেন।" আবু মূসাও ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে বের হয়ে এলেন। মুজাহিদরা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রতিবাদ করে বসলো।

আসলে আবু মূসার ভাষণের অর্থ এমন ছিলনা যে, যাদের ঘোড়া আছে তারা তাদের কাজে তা ব্যবহার করবে না। বস্তুতঃ তখন সময়টি ছিল ফিতনা ও ষড়যন্ত্রের। হাঙ্গামাবাজরা এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে মদীনায় চলে গেল এবং তাঁর অপসারণ দাবী করলো। খলীফা 'উসমান তাঁকে সরিয়ে নিলেন।

হিজরী ৩৪ সনে কুফাবাসীদের অনুরোধে সাঈদ ইবনুল 'আসের স্থলে খলীফা 'উসমান আবু মূসাকে আবার কুফার ওয়ালী নিয়োগ করেন। খিলাফতের সর্বত্র তখন চলছে দারুণ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণী আবু মূসার স্মরণে ছিল। তাই তিনি তাঁর বক্তৃতা-ভাষণে সর্বদা কুফাবাসীদের এ ভবিষদ্বাণীর কথা শোনাতেন। তাদেরকে সব ফিতনা থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিতেন। হিজরী ৩৫ সনে হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাত ও হযরত আলীর (রা) খলীফা হওয়ার পর সেই ফিত্না আত্মপ্রকাশ করে।

তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানের (রা) রক্তের কিসাসের দাবীতে সোচ্চার হয়ে হযরত আয়িশা, তালহা ও যুবাইর (রা) মক্কা থেকে বসরার দিকে রওয়ানা হলেন। এদিকে তাঁদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে খলীফা হযরত আলী (রা) উপস্থিত হলেন যি'কার নামক স্থানে। অন্যদিকে তিনি আম্মার বিন ইয়াসিরের সাথে হযরত হাসানকে (রা) পাঠালেন কুফায়। হযরত হাসান যখন কুফা পৌঁছলেন, আবু মূসা আশয়ারী তখন কুফার মসজিদে এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণে তিনি জনগণকে এই ফিত্না থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিচ্ছিলেন। হযরত হাসান সেখানে উপস্থিত

হয়েছেন এবং মূসার (রা) সাথে তার কিছু বাক বিতণ্ডা হয়। আবু মূসা নীরবে মসজিদের মিম্বর থেকে নেমে আসেন এবং কোন রকম প্রতিবাদ না করে সোজা সিরিয়ার এক অজ্ঞাত গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এভাবে তিনি এ গৃহযুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।

সিফফিনে হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা) যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলেন এই শর্তে যে, উভয় পক্ষে একজন করে দু'জন নিরপেক্ষ বিচারকের ওপর বিষয়টি নিস্পত্তির ভার দেওয়া হবে। তাদের মিলিত সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষ মেনে নেবে। আলীর (রা) পক্ষ আবু মুসাকে এবং মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষ 'আমর ইবনুল 'আসকে (রা) বিচারক নিযুক্ত করেন।

উভয় পক্ষ 'দুমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে একত্র হলেন। বিষয়টি নিয়ে দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হলো। অবশেষে তারা উভয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, উম্মাতের স্বার্থে আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে খিলাফতের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে এবং মজলিসে শূরা তৃতীয় কাউকে খলীফা নির্বাচন করবে। তাঁরা উভয়ে জনগণের সামনে হাজির হলেন তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য। 'আমর ইবনুল আসের অনুরোধে আবু মূসা প্রথমে উঠে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন; কিন্তু 'আমর তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে হযরত মুয়াবিয়াকে খলীফা ঘোষণা করে বসলেন। আবু মূসা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

আসলে আবু মূসা (রা) ছিলেন অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে প্রকৃতির। ধোঁকা ও কূটনীতি কি জিনিস তা তিনি জানতেন না। এ কারণে তাঁকে বিচারক নিযুক্ত করার ব্যাপারে হযরত আলী (রা) দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষের লোকদের চাপাচাপিতে তিনিও মেনে নেন। 'আমর ইবনুল আসের কূটনৈতিক চালে পরাজিত হয়ে আবু মূসা অনুশোচনায় এত দগ্ধিভূত হলেন যে, সেই মুহূর্তে তিনি মক্কার পথ ধরলেন। জীবনে আর কোন ব্যাপারে তিনি অংশ গ্রহণ করেননি। তাঁর মৃত্যু সন ও স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো মতে মক্কায় আবার কারো মতে তিনি কুফায় মৃত্যু বরণ করেন। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে তিনি মক্কায় ইনতিকাল করেন। অনুরূপভাবে তাঁর মৃত্যু সন হিঃ ৪২, ৪৪ ও ৫২ সন বলে একাধিক মত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মতে হিঃ ৪৪ তাঁর মৃত্যু সন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ)

হযরত আবু মূসা (রা) জীবনের শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ নিষেধ পালনে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। এমন কি যখন তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে এবং তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন, তখন মহিলারা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। সেই মারাত্মক মুহূর্তেও ক্ষণিকের জন্য চেতনা ফিরে পেয়ে বলে ওঠেন ঃ যে জিনিস থেকে রাসূল স্বীয় দায়িত্বমুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন আমিও তা থেকে দায়িত্বমুক্ত। রাসূল (সা) এমন বিলাপকারিনীদের থেকে দায়িত্ব মুক্তির কথা বলেছেন।'

প্রথম জীবনে দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। কিন্তু পরবর্তী জীবন সচ্ছলতায় কেটেছে। হযরত উমার (রা) তাঁর ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল হযরত আবু মূসা (রা) সেই সব বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যে ছয় ব্যক্তি ফাতওয়া দানের অনুমতি পেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ)। আসওয়াদ নামক একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী বলেন, আমি কুফায় হযরত আলী ও হযরত আবু মূসা (রা) অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আর দেখিনি। হযরত আলী (রা) বলতেন ঃ 'মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবু মূসা ইলমের রঙে রঞ্জিত।' তিনি সব সময় জ্ঞানী-ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে থাকতেন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। এ আলোচনা কখনও কখনও বাহাস-মুনাজিরা পর্যন্ত পৌছে যেত। বিশেষতঃ আবদুল্লাহ ইবন মাস্উদ ও মুয়াজ বিন জাবালের (রা) সাথে তাঁর বিশেষ তর্ক-বাহাস হতো। একবার তায়াম্মুমের মাসয়ালার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবন মাস্উদ ও আবু মূসার (রা) মধ্যে বিতর্ক হয়। ইমাম বুখারী-'তায়াম্মুম' অধ্যায়ে এ বিতর্ক বর্ণনা করেছেন।

তিনি যে শুধু জ্ঞান পিপাসু ছিলেন তাইনা, জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি মনে করতেন, যতটুকু তিনি জানবেন অন্যকে তা জানানো ফরয। একবার এক ভাষণে বলেনঃ 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন, তার উচিত অন্য ভাইদের তা জানানো। তবে যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই সে সম্পর্কে একটি শব্দও মুখ থেকে বের করবে না।' তাঁর দারসের পদ্ধতিও ছিল বিভিন্ন ধরনের। যথারীতি হালকায়ে দারস ছাড়াও কখনও কখনও লোকজন জড়ো করে তাদের সামনে ভাষন দিতেন। পথে-ঘাটে কোথাও এক স্থানে কিছু লোকের দেখা পেলে তাদের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) দু' একটি বাণী পৌঁছে দিতেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি খুব কোমল আচরণ করতেন। কেউ অজ্ঞতা বশতঃ বোকার মত যদি কোন প্রশ্ন করে বসতো, তিনি উত্তেজিত হতেন না। অত্যন্ত নরম সুরে তাকে বুঝিয়ে দিতেন।

পবিত্র কুরআনের সাথে আবু মূসার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। রাত-দিনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে ব্যয় করতেন। ইয়ামনের ওয়ালী থাকাকালে একবার মুয়াজ বিন জাবাল জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? বললেনঃ রাত্র দিনে যখনই সুযোগ পাই একটু করে তিলাওয়াত করে নিই। তিনি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রাসূল (সা) বলতেনঃ 'আবু মূসা দাউদের (আ) লাহানের কিছু অংশ লাভ করেছে।'

তাঁর তিলাওয়াত রাসূলের (সা) খুবই পছন্দ ছিল।

তার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলেই রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার হযরত আশিয়াকে (রা) সংগে করে রাসূল (সা) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আবু মূসার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে যান। কিছুক্ষণ শোনার পর আবার সামনে অগ্রসর হন। একবার মসজিদে নববীতে আবু মূসা জোর আওয়াযে ইশার নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। সুমধুর আওয়ায শুনে উম্মুহাতুল মুমিনীন হুজরার পর্দার কাছে এসে কান লাগিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকেন। সকালে যখন এ কথা জানতে পারলেন, বললেন, আমি যদি তখন একথা জানতে পারতাম তাহলে আরো চিত্তাকর্ষক আওয়াযে তিলাওয়াত করে তাঁদেরকে কুরআনের আশেক বানিয়ে দিতাম। তাঁর এই অসাধারণ খোশ লাহানের কারণেই রাসূল (সা) মুয়াজ বিন জাবালের সাথে তাঁকেও নওমুসলিমদের কুরআনের তালীম দানের জন্য ইয়ামনে পাঠান।

পবিত্র কুরআনের সাথে সাথে হাদীসের খিদমতেও তাঁর অবদান কোন অংশে কম ছিলনা। কুফায় তার স্বতন্ত্র হালকায়ে দারসে হাদীস ছিল। এই দরসের মাধ্যমে বড় বড় মুহাদ্দিসীন সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৬০। তন্মধ্যে ৫০ টি মুত্তফাক আলাইহি, ৪৫টি বুখারী এবং ২৫টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

কুরআন ও হাদীসে তাঁর প্রভূত দখল থাকা সত্বেও নিজের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তেমনিভাবে অন্যের জ্ঞানের কদরও করতেন। একবার তিনি মীরাস সংক্রান্ত একটি মাসয়ালায় ফাতওয়া দিলেন। ফাতওয়া জিজ্ঞেসকারী আবদুল্লাহ ইবন মাস্‌উদের কাছেও বিষয়টি জিজ্ঞেস করে। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ অন্য রকম ফাতওয়া দিলেন। আবু মূসা নিজের ভুল স্বীকার করে মন্তব্য করেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ জীবিত থাকা পর্যন্ত তোমাদের আমার কাছে আসা উচিত নয়।

হযরত আবু মূসার জীবনটি ছিল রাসূলে পাকের জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সর্বদা তিনি চেষ্টা করতেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি কথা, কাজ, চলন, বলন ইত্যাদি হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করতে। একবার তিনি মক্কা থেকে মদীনা যাচ্ছিলেন। পথে ইশার নামায দুই রাকায়াত আদায় করলেন। তারপর আবার দাঁড়িয়ে সূরা আন নিসার ১০০টি আয়াত পাঠের মাধ্যমে এক রাকায়াত আদায়

করলেন। লোকেরা প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, আমি সব সময় চেষ্টা করি, যেখানে যেখানে রাসূল (সা) কদম রেখেছেন সেখানে সেখানে কদম রাখার এবং তিনি যে কাজ করেছেন, হুবহু তাই করার।

রামাদানের রোযা ছাড়াও নফল রোযা এ জন্য রাখতেন যে, রাসূল (সা) তা রেখেছেন। আশূরার রোযা তিনি বরাবর রাখতেন এবং মানুষকে তা রাখার জন্য বলতেন। সুন্নাত ছাড়া মুস্তাহাবেরও তিনি ভীষণ পাবন্দ ছিলেন। কুরবানীর পশু নিজ হাতে জবেহ করা মুস্তাহাব। শুধু এ কারণে তিনি তাঁর নিজ কন্যাদেরকেও হুকুম দিতেন নিজ হাতে পশু জবেহ করার জন্য।

রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ ছিল কোন ব্যক্তি যখন কারো বাড়ীতে যাবে তখন ভিতরে প্রবেশ করার আগে যেন অনুমতি নেয়। যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরেও অনুমতি না পাওয়া যায় তাহলে সে যেন ফিরে আসে। একবার আবু মূসা গেলেন খলীফা উমারের সাথে দেখা করতে। এক এক করে তিনবার তিনি অনুমতি চাইলেন, কিন্তু খলীফা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় সাড়া দিতে পারলেন না। আবু মূসা ফিরে আসলেন। অন্য এক সময় খলীফা জিজ্ঞেস করলেন আবু মূসা ফিরে গেলে কেন ? বললেন, আমি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরেও সাড়া পাইনি তাই ফিরে গেছি। এই কথার পর তিনি এ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্র (সা) হাদীসটি বর্ণনা করে শুনালেন। 'উমার (রা) বললেন, হাদীসটি তুমি ছাড়া অন্যকেউ শুনেছে এমন একজন সাক্ষী নিয়ে এসো। আবু মূসা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আনসারীদের এক মজলিসে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত উবাই বিন কা'বও হাদীসটি শুনেছিলেন। তিনি উমারের (রা) কাছে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেন।

শা'বী বলেন ঃ ছয়জনের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করা হয় ঃ 'উমার, আলী, উবাই, ইবন মাসউদ, যায়িদ ও আবু মূসা।'

খলীফা উমার (রা) তাঁকে বসরার ওয়ালী নিযুক্ত করে পাঠালেন। বসরায় পৌঁছে তিনি সমবেত জনতার সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন 'আমীরুল মু'মিনীন আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে আপনাদের রবের কিতাব ও তার নবীর সুন্নাত শিক্ষা দেব এবং আপনাদের পথ ঘাট সমূহ আপনাদের কল্যাণের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবো।' ভাষণ শুনে জনতাতো অবাক ! জনগণকে সংস্কৃতিবান করে তোলা, তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষায় শিক্ষিত করাতো শাসকের দায়িত্বের আওতায় পড়তে পারে। কিন্তু তাদের পথ ঘাটসমূহ পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব তিনি কেমন করে পালন করতে পারেন ? ব্যাপারটি তাদের কাছে ভীষণ আশ্চর্যের মনে হলো। তাই হযরত হাসান (রা) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ 'তাঁর চেয়ে উত্তম আরোহী বসরাবাসীদের জন্য আর কেউ আসেনি।' (রিজালুন হালার রাসূল)। রাসূল (সা) তাঁর সম্পর্কে বলতেনঃ'আবু মূসা অশ্বারোহীদের নেতা।'

হযরত আবু মূসার সামনে উম্মাতের কল্যাণ চিন্তাটাই ছিল সবচেয়ে বড়। এজন্য সারাজীবন ব্যক্তিগত সব লাভ ও সুযোগের প্রতি পদাঘাত করেছেন। আলী ও মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছে, তখন একদিন মুয়াবিয়া আবু মূসাকে বলেছেন, যদি তিনি মুয়াবিয়াকে সমর্থন করেন, তাহলে তাঁর দু'ছেলেকে যথাক্রমে বসরা ও কুফার ওয়ালী নিয়োগ করবেন এবং তাঁর সুযোগ-সুবিধার প্রতিও যত্নবান হবেন। জবাবে আবু মূসা লিখলেন, 'আপনি উম্মাতে মুহাম্মাদীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে লিখেছেন। যে জিনিস আপনি আমার সামনে পেশ করেছেন, তার প্রয়োজন আমার নেই।'

লজ্জা-শরম ঈমানের অঙ্গ। আবু মূসার মধ্যে এই উপাদানটি পরিপূর্ণরূপে ছিল। রাতে ঘুমানোর সময়ও বিশেষ ধরনের পোশাক পরে নিতেন, যাতে সতর উন্মুক্ত হয়ে না যায়। একবার কিছু লোককে তিনি দেখলেন, তারা পানির মধ্যে উলঙ্গ হয়ে গোসল করছে। তিনি বললেন, বার বার মরে জীবিত হওয়া আমার মনঃপূত, তবুও একাজ আমার পছন্দ নয়।'

সুহাইব ইবন সিনান আর-রুমী (রা)

নাম 'সুহাইব, কুনিয়াত আবু ইয়াহইয়া। পিতা সিনান, মাতা সালমা বিনতু কাঈদ। পিতা আরবের বনী নুমাইর এবং মাতা বনী তামীম খান্দানের সন্তান। তাঁকে রুমী বা রোমবাসী বলা হয়। আসলে তিনি কিন্তু রোমবাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন আরব।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির আনুমানিক দু'দশক পূর্বে পারশ্য সাম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে তার পিতা সিনান ইবন মালিক বসরার এক প্রাচীন শহর 'উবুল্লার' শাসক ছিলেন। সূহাইব ছিলেন পিতার প্রিয়তম সন্তান। তাঁর মা সুহাইবকে সংগে করে আরো কিছু লোক লস্করসহ একবার ইরাকের 'সানিয়্যা' নামক পল্লীতে বেড়াতে যান। হঠাৎ এক রাতে রোমান বাহিনী অতর্কিতে পল্লীটির ওপর আক্রমন করে ব্যাপক হত্যা ও লুটতরাজ চালায়। নারী ও শিশুদের বন্দী করে দাস ও দাসীতে পরিনত করে। বন্দীদের মধ্যে শিশু সুহাইবও ছিলেন। তখন তাঁর রয়স পাঁচ বছরের বেশী হবে না।

সুহাইবকে রোমের এক দাস ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে বিক্রি করা হলো। তিনি এক মনিবের হাত থেকে অন্য মনিবের হাতে গেলেন ক্রমাগতভাবে। তৎকালীন রোম সমাজে দাসদের ভাগ্যে এমনিই ঘটতো। এভাবে ভেতর থেকেই রোমান সমাজের গভীরে প্রবেশ করার এবং সেই সমাজের অভ্যন্তরে সংঘটিত অশ্লীলতা ও পাপাচার নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তিনি লাভ করেন।

সুহাইব রোমের ভূমিতে লালিত পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পন করেন। তিনি আরবী ভাষা ভুলে যান অথবা ভুলে যাওয়ার কাছাকাছি পৌঁছেন। তবে তিনি যে মরু আরবের সন্তান, এ কথাটি এক দিনের জন্যও ভুলেননি। সর্বদা তিনি প্রহর গুনতেন, কবে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবেন এবং আরবে নিজ গোত্রের সাথে মিলিত হবেন। তাঁর এ আগ্রহ প্রবলতর হয়ে ওঠে যে দিন তিনি এক খৃষ্টান কাহিনের (ভবিষ্যদ্বক্তা) মুখে শুনতে পেলেন ঃ 'সে সময় সমাগত যখন জাযীরাতুল আরবের মক্কায় একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তিনি ঈসা ইবন মরিয়মের রিসালাতকে সত্যায়িত করবেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন।'

সুহাইব সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকলেন। সুযোগ এসেও গেল। একদিন মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে মক্কায় চলে এলেন। মক্কার লোকেরা তাঁর সোনালী চুল ও জিহ্বার জড়তার কারণে তাঁকে সুহাইব আর রুমী বলতে থাকে। মক্কায় তিনি বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাঁর সাথে যৌথভাবে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন। ব্যবসায়ে তারা দারুণ সাফল্য লাভ করেন। অবশ্য অন্য একটি বর্ণনা মতে আরবের বনী কালব তাঁকে খরীদ করে মক্কায় নিয়ে আসে। আবদুল্লাহ ইবন জুদআন তাদের নিকট থেকে তাঁকে খরীদ করে আযাদ করে দেন।

সুহাইব মক্কায় তাঁর কারবার ও ব্যবসা বাণিজ্যের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও এক মুহূর্তের জন্য সেই খৃষ্টান কাহিনের ভাবিষ্যদ্বানীর কথা ভুলেননি। সে কথা স্মরণ হলেই মনে মনে বলতেন ঃ তা কবে হবে ? এ ভাবে অবশ্য তাঁকে বেশী দিন কাটাতে হয়নি।

একদিন তিনি এক সফর থেকে ফিরে এসে শুনতে পেলেন, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ নবুওয়াত লাভ করেছেন। মানুষকে তিনি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য আহবান জানাচ্ছেন, তাদেরকে আদল ও ইহসানের প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। সুহাইব মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'যাঁকে আল আমীন বলা হয় ইনি কি সেই ব্যক্তি ?' লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বাসস্থান কোথায় ? বলা হলো, 'সাফা পাহাড়ের কাছে আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়ীতে তিনি থাকেন। তবে সতর্ক থেকো

কুরাইশদের কেউ যেন তোমাকে তাঁর কাছে দেখে না ফেলে। যদি তারা মুহাম্মাদের কাছে তোমাকে দেখতে পায়, তোমার সাথে তেমন আচরণই তারা করবে যেমনটি তারা আমাদের সাথে করে থাকে। তুমি একজন ভিনদেশী মানুষ, তোমাকে রক্ষা করার কেউ এখানে নেই। তোমার গোত্র গোষ্ঠীও এখানে নেই।'

সুহাইব চললেন দারুল আরকামের দিকে অত্যন্ত সন্তর্পনে। আরকামের বাড়ীর দরযায় পৌঁছে দেখতে পেলেন সেখানে আম্মার বিন ইয়াসির দাঁড়িয়ে। আগেই তাঁর সাথে পরিচয় ছিল। একটু ইতস্ততঃ করে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'আম্মার তুমি এখানে ?'

আম্মার পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, 'বরং তুমিই বল, কি জন্য এসেছ ?'

সুহাইব বললেন, 'আমি এই লোকটির কাছে যেতে চাই, তাঁর কিছু কথা শুনতে চাই।'

আম্মার বললেন, আমারও উদ্দেশ্য তাই। 'সুহাইব বললেন, 'তাহলে আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে ঢুকে পড়ি।'

দু'জনে এক সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছে তাঁর কথা শুনলেন। তাঁদের অন্তর ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দু'জনেই এক সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কলেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। সে দিনটি তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে থেকে তাঁর উপদেশপূর্ণ বাণী শ্রবণ করলেন। গভীর রাতে মানুষের শোরগোল থেমে গেলে তাঁরা চুপে চুপে অন্ধকারে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ আস্তানার দিকে বেরিয়ে পড়লেন। হযরত সুহাইবের পূর্বে তিরিশেরও বেশী সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ কুরাইশদের ভয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। সুহাইব যদিও বিদেশী ছিলেন, মক্কায় তাঁর কোন আত্মীয় বন্ধু ছিল না, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন না। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে দিলেন। বিলাল, আম্মার, সুমাইয়্যা, খাব্বাব প্রমুখের ন্যায় তিনিও কুরাইশদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকারে পরিণত হলেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সকল নির্যাতন সহ্য করতে থাকেন। তিনি জানতেন, জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজরাতের সংকল্প করলেন, সুহাইব তা অবগত হলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনিই হবেন 'সালেসু সালাসা— তিনজনের তৃতীয় জন। অর্থাৎ রাসূল (সা), আবু বকর ও সুহাইব। কিন্তু কুরাইশদের সচেতন পাহারার কারণে তা হয়নি। কুরাইশরা তাঁর পিছু লেগে ছিল, যাতে তিনি তাঁর বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে মক্কা থেকে সরে যেতে না পারেন।

রাসূলুল্লাহর হিজরাতের পর সুহাইব সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। কুরাইশরাও তাকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। অবশেষে তিনি এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন।

এক প্রচণ্ড শীতের রাতে বার বার তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাড়ীর বাইরে যেতে লাগলেন। একবার যেয়ে আসতে না আসতে আবার যেতে লাগলেন। কুরাইশ পাহারাদাররা বলা বলি করলো, লাত ও উযযা তার পেট খারাপ করেছে। তারা কিছুটা আত্মতৃপ্তি বোধ করলো এবং বাড়ীতে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। এই সুযোগে সুহাইব বাড়ী থেকে বের হয়ে মদীনার পথ ধরলেন।

সুহাইব মক্কা থেকে বেরিয়ে কিছু দূর যেতে না যেতেই পাহারাদাররা বিষয়টি জেনে ফেলে। তারা তাড়াতাড়ি দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করে। সুহাইব তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে একটি উঁচু টিলার ওপর উঠে তীর ও ধনুক বের করে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'কুরাইশ সম্প্রদায় ! তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তীরন্দায ও নিশানবায ব্যক্তি। আল্লাহর কসম, আমার কাছে যতগুলি তীর আছে, তার প্রত্যেকটি দিয়ে তোমাদের এক একজন করে খতম না করা পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। তারপর আমার তরবারি তো

আছেই।' কুরাইশদের একজন বললোঃ 'আল্লাহর কসম ! তুমি জীবনও বাঁচাবে এবং অর্থ-সম্পদও নিয়ে যাবে তা আমরা হতে দেব না। তুমি মক্কায় এসেছিলে শূন্য হাতে। এখানে এসেই এসব ধন-সম্পদের মালিক হয়েছো।'

সুহাইব বললেন, 'আমি যদি আমার ধন-সম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দিই, তোমরা আমার রাস্তা ছেড়ে দেবে ?'

তারা বললো, 'হাঁ'।

সুহাইব তাদেরকে সংগে করে মক্কায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং সকল ধন-সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিলেন। কুরাইশরাও তাঁর পথ ছেড়ে দিল। এভাবে সুহাইব দ্বীনের খাতিরে সবকিছু ত্যাগ করে মদীনায় চলে এলেন। পেছনে ফেলে আসা কষ্টোপার্জিত ধন-সম্পদের জন্য তিনি একটুও কাতর হননি। পথে যখনই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, রাসূলের (সা) সাথে সাক্ষাতের কথা স্মরণ হতেই সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে আবার যাত্রা শুরু করেন। এভাবে তিনি কুবায় পৌছেন। রাসূল (সা) তখন কুবায় কুলসূম ইবন হিদামের বাড়ীতে। রাসূল (সা) তাঁকে আসতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠেন, 'আবু ইয়াহইয়া, ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।' তিন বার তিনি একথাটি বলেন। সুহাইবের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বলে উঠেন, 'আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আগে তো আপনার কাছে আর কেউ আসেনি। নিশ্চয় জিবরীল এ খবর আপনাকে দিয়েছেন।' সত্যিই ব্যবসাটি লাভজনকই হয়েছিল। একথার সমর্থনে জিবরীল (সা) ওহী নিয়ে হাজির হলেন, 'ওয়া মিনান নাসে মান ইয়াশরী নাফসাহু ইবতিগা মারদাতিল্লাহ। ওয়াল্লাহু রাউফুম বিল ইবাদ' কিছু মানুষ এমনও আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবনও বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।

হযরত সুহাইব মদীনায় সা'দ ইবন খুসাইমার অতিথি হন এবং হারিস ইবনুস সাম্মা আল-আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম হয়।

হযরত সুহাইব ছিলেন দক্ষ তীরন্দায। বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সহযাত্রী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে জন সমাবেশে তিনি এসব যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য সম্পর্কে তিনি নিজেই বলতেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি ভূমিকায় আমি উপস্থিত থেকেছি। তিনি যখনই কোন বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, আমি উপস্থিত থেকেছি। তাঁর ছোট ছোট অভিযান গুলিতে আমি অংশগ্রহণ করেছি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যত যুদ্ধ তিনি করেছেন তার প্রত্যেকটিতে আমি তাঁর ডানে অথবা বামে অবস্থান করে যুদ্ধ করেছি। মুসলমানরা যতবার এবং যেখানেই পেছনের অথবা সামনের শত্রুর ভয়ে ভীত হয়েছে, আমি সব সময় তাদের সাথে থেকেছি। রাসূলুল্লাহকে (সা) কক্ষনো আমার নিজের ও শত্রুর মাঝখানে হতে দিইনি। এভাবে রাসূল (সা) তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেন।' (রিজালুন হাওলার রাসূল-১৩০)

হযরত সুহাইব সম্পর্কে হযরত 'উমারের (রা) অত্যন্ত সুধারণা ছিল। তিনি তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসীয়াত করে যান, সুহাইব তাঁর জানাযার ইমামতি করবেন। শূরার সদস্যবৃন্দ যতক্ষণ নতুন খলীফার নাম ঘোষণা না করবেন, তিনিই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন। হযরত উমারের (রা) মৃত্যুর পর তিন দিন পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন।

হিজরী ৩৮ সনে ৭২ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। মদীনার বাকী' গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত সুহাইব (রা) জীবনের বিরাট এক অংশ রাসূলে পাকের সাহচার্যে কাটানোর সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি বলতেনঃ ওহী নাযিলের পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।' একারণে সকল সৎগুনাবলীর সমাবেশ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। সচ্চরিত্রতা, আত্ম মর্যাদা বোধের সাথে সাথে উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, হাস্য কৌতুক ইত্যাদি গুণাবলী তাঁর চরিত্রকে আরও মাধুর্য্য দান করেছিল।

তিনি ছিলেন অতিথি পরায়ণ ও দানশীল। গরীব দুঃখীর প্রতি ছিলেন দরাযহস্ত। মাঝে মাঝে মানুষের ধারণা হতো, তিনি দারুণ অমিতব্যয়ী। একবার হযরত উমার (রা) তাঁকে বলেন, তোমার কথা আমার ভালো লাগে না। কারণ, প্রথমতঃ তোমার কুনিয়াত আবু ইয়াহইয়া। এই নামে একজন নবী ছিলেন। আর এ নামে তোমার কোন সন্তান নেই। দ্বিতীয়তঃ তুমি বড় অমিতব্যয়ী। তৃতীয়তঃ তুমি নিজেকে একজন আরব বলে দাবী কর।' জবাবে তিনি বলেন, 'এই কুনিয়াত আমি নিজে গ্রহণ করিনি। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্বাচিত। দ্বিতীয়তঃ অমিতব্যয়িতা। তা আমার একাজের ভিত্তি হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী— 'যারা মানুষকে অন্নদান করে এবং সালামের জবাব দেয় তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তৃতীয় অভিযোগটির জবাব হলো, প্রকৃতই আমি একজন আরব সন্তান। শৈশবে রোমবাসী আমাকে লুট করে নিয়ে যায়, আমাকে আমার গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাসে পরিণত করে, এ-কারণে আমি আমার গোত্র ও খান্দানকে ভুলে যাই।'

হযরত সুহাইবের দৈহিক গঠন ছিল মধ্যমাকৃতির। না লম্বা না খাটো। চেহারা উজ্জ্বল, মাথার চুল ঘন। বার্ধক্যে মেহেন্দীর খিযাব লাগাতেন। জিহবায় কিছুটা জড়তা ও তোৎলামী ছিল। একবার তাঁর চাকর ইয়াহনাসকে ডাকছিলেন। তা যেন শুনা যাচ্ছিল, নাস'। নাস অর্থ মানুষ। হযরত উমার সে ডাক শুনে বলে ওঠেন, 'লোকটি এভাবে 'নাস' 'অর্থাৎ মানুষকে ডাকছে কেন?' হযরত উম্মে সালামা (রা) বললেন, 'সে নাস' দ্বারা মানুষকে নয়, বরং তার চাকর ইয়াহনাসকে ডাকছে। জিহবার জড়তার দরুণ নামটি ভালো মত উচ্চারণ করতে পারে না।

'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)

নাম 'আম্মার, কুনিয়াত 'আবুল ইয়াকজান'। পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা। পিতা কাহতান বংশের সন্তান। আদি বাসস্থান ইয়ামন। তাঁর এক ভাই হারিয়ে যায়। হারানো ভায়ের খোঁজে অন্য দু ভাই হারিস ও মালিককে সংগে করে তিনি মক্কায় পৌছেন। অন্য দু' ভাই ইয়ামন ফিরে গেলেও ইয়াসির একা মক্কায় থেকে যান। মক্কার বনী মাখযুমের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আবু হুজাইফা মাখযুমীর 'সুমাইয়্যা' নাম্নী এক দাসীকে বিয়ে করেন। এই সুমাইয়্যার গর্ভেই হযরত আম্মার জন্মগ্রহণ করেন। আবু হুজাইফা শিশুকালেই আম্মারকে আযাদ করে দেন এবং আমরণ পিতা-পুত্রের মত দু'জনের সম্পর্ক বজায় রাখেন।

হযরত আম্মার ও হযরত সুহাইব ইবন সিনান দু'জন একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। আম্মার বলেন ঃ 'আমি সুহাইবকে আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়ীর দরযায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তোমার উদ্দেশ্য কি ? সে বললো ঃ প্রথমে তোমার উদ্দেশ্যটি কি তাই বল।' বললাম, মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কিছু কথা শুনতে চাই।' সে বললো, 'আমারও সেই একই উদ্দেশ্য।' তারপর দু'জন এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। আম্মারের সাথে অথবা কিছু আগে বা পরে তার পিতা ইয়াসিরও ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত 'আম্মার ইসলাম গ্রহণ করে দেখলেন, আবু বকর ছাড়া আর পাঁচজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা তার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তবে এর অর্থ এই যে, তখন মাত্র এ ক'জনই তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। অন্যথায় সহীহ বর্ণনা মতে আম্মারের পূর্বে তিরিশেরও বেশী সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ কাফিরদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন।

মক্কা হযরত 'আম্মারের জন্মভূমি নয়। আপন বলতে সেখানে তাঁর কেউ ছিল না। পার্থিব আভিজাত্য বা ক্ষমতার দাপটও তাঁর ছিল না। তাছাড়া তখন পর্যন্ত তাঁর মা 'সুমাইয়্যা' বনী মাখযুমের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এমনি এক অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ঈমানী জযবায় একদিনও বিষয়টি গোপন রাখতে পারলেন না। সবার কাছে প্রকাশ করে দিলেন। মক্কার মুশরিকরা দুর্বল পেয়ে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের লোকদের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন শুরু করে দিল। দুপুরের প্রচণ্ড গরমের সময় উত্তপ্ত পাথরের ওপর তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হতো, জ্বলন্ত লোহা দিয়ে শরীর ঝলসে দেওয়া হতো। কিন্তু আম্মারের ঈমানী শক্তির কাছে মুশরিকদের সকল অত্যাচার ও উৎপীড়ন পরাজিত হলো।

হযরত আম্মারের মা হযরত সুমাইয়্যাকে নরাধম আবু জাহল নিজের নিযা দিয়ে নির্মমভাবে শহীদ করে। ইসলামের ইতিহাসে হযরত সুমাইয়্যা প্রথম শহীদ। আম্মারের পিতা ইয়াসির এবং ভাই আবদুল্লাহও মুশরিকদের অত্যাচারের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। একদিন মুশরিকরা আম্মারকে আগুনের অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দিয়েছে। এমন সময় রাসূল (সা) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ব্যথিত চিত্তে আম্মারের মাথায় পবিত্র একটি হাত রেখে বললেন ঃ 'হে আগুন, ইব্রাহিমের মত তুই আম্মারের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যা।' রাসূল (সা) যখনই আম্মার পরিবারের বাড়ীর ধার দিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে নির্যাতিত অবস্থায় দেখতে পেতেন, সান্ত্বনা দিতেন। একদিন তিনি বলেন ঃ 'আম্মার পরিবারের লোকেরা, তোমাদের জন্য সুসংবাদ। জান্নাত তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।' একবার হযরত আম্মার রাসূলুল্লাহর নিকট এই অসহনীয় যুল্ম অত্যাচারের বিরুদ্ধে

শিকায়েত করলো। রাসূল (সা) বললেন, 'সবর কর, সবর কর।' তারপর দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ, ইয়াসির খান্দানের লোকদের ক্ষমা করে দাও।'

একদিন মুশরিকরা তাঁকে এত দীর্ঘক্ষণ পানিতে ডুবিয়ে রাখে যে, তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় শত্রুরা তাঁর মুখ দিয়ে তাদের ইচ্ছেমত স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে অনুশোচনায় জর্জরিত হতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'আম্মার, খবর কি?' আম্মার জবাব দিলেন ঃ 'আজ আপনার শানে কিছু খারাপ এবং তাদের উপাস্যদের সম্পর্কে কিছু ভালো কথা না বলা পর্যন্ত আমি মুক্তি পাইনি।' রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার অন্তর কি বলছে?' বললেন, 'আমার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ।' প্রিয় নবী (সা) অত্যন্ত দরদের সাথে তাঁর চোখের পানি মুছে দিয়ে বললেন, 'কোন ক্ষতি নেই। এমন অবস্থার মুখোমুখি হলে আবারও এমনটি করবে।' তারপর তিনি সূরা আন নাহলের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ 'যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করে, তবে যাদেরকে বাধ্য করা হয় এবং তাদের অন্তর ঈমানের ওপর দৃঢ় (তাদের কোন দোষ নেই)।' (আন নাহল/১৪)

একবার হযরত সাঈদ ইবন যুবাইর (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ কুরাইশরা কি মুসলমানদের ওপর এতই অত্যাচার চালাতো যে, তারা দ্বীন ত্যাগ করতে বাধ্য হতো? জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম, হাঁ। কুরাইশরা তাদেরকে মারতো, অনাহারে রাখতো। এমন কি তারা এতই দুর্বল হয়ে পড়তো যে, উঠতে বসতে অক্ষম হয়ে যেত। এ অবস্থায় তাদের অন্তরের বিরুদ্ধে কুরাইশরা বিভিন্ন বিষয়ে স্বীকৃতি আদায় করে নিত। এসব নির্যাতিত মুসলিমদের একজন আম্মার।"

হযরত আম্মার হাবশায় হিজরাত করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হাবশাগামী দ্বিতীয় কাফিলার সহগামী হয়েছিলেন। মদীনায় হিজরাতের হুকুম হলে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন এবং হযরত মুবাশশির ইবনুল মুনযিরের মেহমান হন। রাসূল (সা) হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান আল আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তাঁকে একখন্ড ভূমিও দান করেন।

হিজরাতের ছয়-সাত মাস পর মদীনার মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। রাসূল (সা) নিজেও মসজিদ তৈরীর কাজে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আম্মারও সক্রিয়ভাবে মসজিদ তৈরীতে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি মাথায় করে ইট বহন করেছিলেন আর মুখে এই চরণটি আওড়াচ্ছিলেন ঃ 'নাহনুল মুসলিমুন নাবতানিল মাসাজিদ— আমরা মুসলিম, আমরা বানাই মসজিদ।' হযরত আবু সাঈদ বলেন, আমরা একটি করে ইট উঠাচ্ছিলাম, আর আম্মার উঠাচ্ছিলেন দু'টি করে। একবার আম্মার যাচ্ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পাশ দিয়ে। রাসূল (সা) অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাঁর মাথার ধূলো- বালি ঝেড়ে দিয়ে বললেন, 'আফসুস আম্মার! একটি বিদ্রোহীদল তোমাকে হত্যা করবে। তুমি তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকবে, আর তারা তোমাকে ডাকবে জাহান্নামের দিকে।' একবার কেউ তাঁর মাথায় এত বোঝা চাপিয়ে দিল যে, লোকেরা চেঁচিয়ে উঠলো, 'আম্মার মারা যাবে, আম্মার মারা যাবে' রাসূল (সা) এগিয়ে গিয়ে আম্মারের মাথা থেকে ইট তুলে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলেন।

বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সবগুলিতে আম্মার অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকরের (রা) যুগে সংঘটিত অধিকাংশ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেও তিনি সাহসী যোদ্ধার পরিচয় দেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার বলেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধে আম্মারের একটি কান দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে লাফাতে থাকে। তা সত্ত্বেও তিনি বেপরোয়াভাবে হামলার পর হামলা চালাতে থাকেন। যে দিকে তিনি যাচ্ছিলেন, কাফিরদের ব্যূহ তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। একবার মুসলিম বাহিনী প্রায় ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম হলো। আম্মার এক বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে একটি পাথরের কাছে

দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন : 'ওহে মুসলিম মুজাহিদবৃন্দ ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালাচ্ছো আমি আম্মার ইবন ইয়াসির। এসো, আমার দিকে এসো।' এই আওয়ায মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যাদুর মত কাজ করে। তারা আবার রুখে দাঁড়ায়। বিজয় ছিনিয়ে আনে। ''

হিজরী ২০ সনে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা) তাঁকে কুফার ওয়ালী বা শাসক নিয়োগ করেন। এক বছর নয় মাস অতি দক্ষতার সাথে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় বসরাবাসীরা কিছু নতুন বিজিত এলাকা বসরার সাথে দেওয়ার জন্য খলীফার নিকট দাবী করে। কুফার কিছু নেতৃবৃন্দ তাদের আমীর আম্মারকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন উক্ত এলাকা সমূহ কুফার সাথে দেওয়ার ব্যাপারে খলীফাকে সম্মত করেন। কিন্তু হযরত আম্মার এ ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়তে রাজী হলেন না। কুফার নেতারা ক্ষেপে গেলেন। একজনতো তাকে 'কান কাটা' বলে গালিই দিয়ে বসেন। জবাবে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'আফসুস, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ও উত্তম কানটিকে গালি দিলে, যে কানটি আল্লাহর পথে কাটা গেছে।'

এই বিষয়টি নিয়ে কুফার কিছু নেতৃবৃন্দ তাঁর বিরুদ্ধে শাসন কার্যে অদক্ষ বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন। খলীফা তাঁকে বরখাস্ত করেন। বরখাস্তের পরের দিন খলীফা ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি আমার এ কাজে অসন্তুষ্ট ?' তিনি জবাব দেন, 'আপনি যখন জিজ্ঞেস করেছেন, সত্য কথাটি বলতে হবে। পূর্বে যেমন আমার নিয়োগের সময় খুশী ছিলাম না, তেমনি এখন বরখাস্তের সময় নাখোশও নই।' ''

তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালে চতুর্দিকে যখন বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে, তখন হিজরী ৩৫ সনে তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য খলীফা একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। হযরত আম্মারও ছিলেন এই কমিশনের অন্যতম সদস্য। বিক্ষোভের মূল কেন্দ্র মিসরের তদন্তভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। তিনি মিসর যান।

কমিশনের অন্য সদস্যরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসে নিজ নিজ এলাকার রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু হযরত আম্মার ফিরতে আশাতিরিক্ত দেরী করলেন। এদিকে দারুল খিলাফত মদীনায় তাঁর সম্পর্কে নানা রকম গুজব ও ধারণা ছাড়িয়ে পড়তে লাগলো। তিনি যখন মিসর থেকে ফিরে এলেন তখন বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা তাঁকে প্রভাবিত দেখা গেল। তিনি প্রকাশ্য মিটিং মজলিসে হযরত উসমানের শাসনপদ্ধতি ও প্রাদেশিক ওয়ালীদের নানাবিধ কাজের কঠোর সমালোচনা শুরু করলেন। ফলে খলীফার লোকদের সাথে বিবাদ শুরু হয়ে গেল। একবার উসমানের (রা) চাকর-বাকরেরা তাঁকে এমন মারাত্মক পিটুনি দেয় যে, তাঁর সমস্ত শরীর ফুলে গেল। তিনি পাঁজরের একটি হাড়ে ভীষণ চোট পেলেন। বনী মাখযুমের সাথে তাঁর জাহিলী যুগে চুক্তি ছিল। তাঁরা খলীফার দরবারে পৌঁছে হুমকি দেয়, যদি আম্মার এই আঘাত থেকে প্রাণে না বাঁচেন তাহলে আমরা অবশ্যই প্রতিশোধ নেব। (আল-ইসতিয়াব) এমনি ধরনের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা মদীনায় চড়াও হয়, হযরত 'উসমান (রা) হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসকে আম্মারের কাছে বলে পাঠান, তিনি যেন তার প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে ফেরত পাঠান। কিন্তু আম্মার অস্বীকার করেন। (তাবারী) ''

হযরত 'উসমান (রা) শহীদ হলেন। খিলাফতের দায়িত্ব হযরত আলীর (রা) ওপর ন্যস্ত হলো। হযরত আয়িশা, তালহা, যুবাইর প্রমুখ উসমানের রক্তের বদলা দাবী করে বসরার দিকে চললেন। হযরত আলী কুফাবাসীদেরকে স্বপক্ষে আনার জন্য ইমাম হাসানের সাথে আম্মারকে পাঠালেন কুফায়। হযরত আম্মার যখন কুফা পৌঁছেন, হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) তখন কুফার জামে মসজিদে এক জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁকে মিম্বর থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রথমে হযরত হাসান, পরে হযরত আম্মার ভাষণ দেন এবং আলীর (রা) প্রতি কুফাবাসীদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম

হন। পরদিন সকালে প্রায় সাড়ে নয় হাজার সৈনিকের একটি বাহিনী আলীর (রা) পক্ষে লড়বার জন্য আম্মারের পাশে সমবেত হয়।

হিজরী ৩৬ সনের জমাদিউল আখের মাসে বসরার অদূরে 'যিকার' নামক স্থানে হযরত আলী ও আয়িশার বাহিনী মুখোমুখি হলো। হযরত আম্মার কুফার বাহিনী সহ এ যুদ্ধে যোগ দিলেন। যুদ্ধের সূচনাপর্বেই হযরত যুবাইর যখন দেখলেন আম্মার আলীর পক্ষে, তখন তার স্মরণ হলো রাসূলুল্লাহর বাণী, 'সত্য আম্মারের সাথে, বিদ্রোহী দল তাঁকে হত্যা করবে।' তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। রণে ভঙ্গ দিয়ে কেটে পড়লেন। এ যুদ্ধে হযরত আম্মারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনি সত্যের ওপর আছেন। তাই অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন এবং বিজয়ী হন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'উটের যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

উটের যুদ্ধের পর হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ হয়। হযরত আম্মার এ যুদ্ধেও হযরত আলীর পক্ষে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স একানব্বই, মতান্তরে তিরানব্বই বছর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি জিহাদের অনুপ্রেরণায় ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সত্য আলীর (রা) পক্ষে। তাই এই বয়সেও তিনি সিংহের ন্যায় বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। তিনি যেদিকেই আক্রমণ চালাচ্ছিলেন বিপক্ষ শিবির ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল। একবার বিপক্ষ শিবিরের পতাকাবাহী হযরত আমর ইবনুল 'আসের ওপর তাঁর নজর পড়লো। তিনি বললেন, 'আমি এই পতাকাবাহীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর সাথে তিনবার যুদ্ধ করেছি। তার সাথে এ আমার চতুর্থ যুদ্ধ। আল্লাহর কসম, সে যদি আমাকে পরাজিত করে 'হাজার' নামক স্থানেও ঠেলে নিয়ে যায়, তবুও আমি বিশ্বাস করবো, আমরা সত্য এবং তারা মিথ্যার ওপর।' (তাবাকাত ১/১৮৫)

সিফফীনের যুদ্ধে আলীর (রা) পক্ষে যোগদানের জন্য তিনি মানুষকে আহবান জানিয়ে বলতেন, "ওহে জনমণ্ডলী, আমাদের সাথে এমন লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদে বের হও, যারা মনে করে তারা 'উসমানের রক্তের বদলা নিচ্ছে। আল্লাহর কসম, রক্তের বদলা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে তারা দুনিয়ার মজা লাভ করেছে। সে মজা আরো লাভ করতে চায়। . . . . ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাদের এমন কোন অবদান নেই যার ভিত্তিতে তারা মুসলিম উম্মার আনুগত্য দাবী করতে পারে। মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের কোন হক তাদের নেই। তাদের অন্তরে এমন কিছু আল্লাহর ভীতি নেই যাতে তারা হকের অনুসারী হতে পারে। তারা উসমানের রক্তের বদলার কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। স্বৈরাচারী রাজা হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই"। (রিজালুন হাওলার রাসূল/২১৬)

সিফফীনের যুদ্ধ তখন চলছে। একদিন সন্ধ্যায় হযরত আম্মার কয়েক ঢোক দুধ পান করে বললেন, 'রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন, দুধই হবে আমার শেষ খাবার। তারপর—'আজ আমি আমার বন্ধুদের সাথে মিলিত হব, আজ আমি মুহম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হব'—এ কথা বলতে বলতে সৈনিকদের সারিতে যোগ দিলেন। অতঃপর প্রচণ্ডবেগে শত্রু শিবিরের ওপর আক্রমণ চালালেন। উল্লেখ্য যে, বিরোধী শিবিরের লোকেরা হযরত আম্মারকে সব সময় এড়িয়ে চলতো। কারণ, আম্মার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর বিরাট ফজিলাত ও মর্যাদা তাদের জানা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক নও-মুসলিম ছিল যারা আম্মার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতো না। তাদেরই একজন ইবনুল গাবিয়া—তীর নিক্ষেপ করে আম্মারকে প্রথম মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর অন্য একজন শামী ব্যক্তি তরবারি দিয়ে দেহ থেকে তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

আম্মারকে শহীদ করার পর হত্যাকারী দু'জনই এককভাবে এ কৃতিত্ব দাবী করে ঝগড়া শুরু করে দেয়। ঝগড়া করতে করতে তারা হযরত মুয়াবিয়ার (রা) কাছে উপস্থিত হয়। ঘটনাক্রমে হযরত

আমর ইবনুল আসও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপার দেখে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, এরা দু'জন জাহান্নামের জন্য ঝগড়া করছে।' একথায় হযরত আমীর মুয়াবিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'আমর, তুমি এ কি বলছো ? যারা আমাদের জন্য জীবন দিচ্ছে, তাদের সম্পর্কে এমন কথা বলছো ?' আমর বললেন, 'আল্লাহর কসম, এটাই সত্য। আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে যদি আমার মরণ হতো, কতই না ভালো হতো।'

হযরত আম্মারের (রা) শাহাদাতের পর হযরত 'আমর ইবনুল 'আস দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি এ সংঘাত থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, আম্মারের হত্যাকারী আমরা নই, বরং যারা তাকে ঘর থেকে বের করে এই যুদ্ধের ময়দানে সংগে করে নিয়ে এসেছে প্রকৃতপক্ষে তারাই তাঁর হত্যাকারী। (তাবাকাত)

হযরত আম্মারের (রা) শাহাদাতের মাধ্যমে সত্য মিথ্যার ফায়সালা হয়ে যায়। হযরত খুযাইমা ইবন সাবিত (রা) উট ও সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোন পক্ষেই তরবারি কোষমুক্ত করেননি। হযরত আম্মারের শাহাদাতের পর তিনি বুঝলেন, আলীর পক্ষ অবলম্বন করাই উচিৎ। তিনি এবার তরবারি কোষমুক্ত করে হযরত মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাত বরণ করেন। এমনিভাবে যে সকল সাহাবী দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে দোল খাচ্ছিলেন, তাঁরাও সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে আলীর (রা) পক্ষ অবলম্বন করেন।

হযরত আলী (রা) তাঁর প্রিয় সংগী হযরত আম্মারের (রা) শাহাদাতের খবর শুনে দুঃখের সাথে বলে ওঠেন, "যেদিন আম্মার ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার ওপর আল্লাহ রহম করেছেন, যেদিন সে শাহাদাত বরণ করেছে, তার ওপর আল্লাহ রহম করেছেন এবং যেদিন সে জীবিত হয়ে উঠবে আল্লাহ তার ওপর রহম করবেন। আমি সেই সময় তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখেছি যখন মাত্র চার-পাঁচ জন সাহাবীর ঈমানের ঘোষণা দানের সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ের সাহাবীদের কেউই তাঁর মাগফিরাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না। আম্মার এবং সত্য একে অপরের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর হত্যাকারী নিশ্চিত জাহান্নামী।"

অতঃপর হযরত আলী (রা) হযরত আম্মারের কাফন দাফনের নির্দেশ দেন। হযরত আলী জানাযার নামায পড়ান এবং আম্মারের রক্ত-ভেজা কাপড়েই দাফনের নির্দেশ দেন। এ হিজরী ৮৭ সনের ঘটনা। হযরত আম্মার (রা) হলেন কুফার মাটিতে সমাহিত রাসূলুল্লাহর (সা) প্রথম সাহাবী।

হযরত আম্মার ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু। তাকওয়া ও খাওফে খোদার কারণে সব সময় চুপচাপ থাকতেন। খুব কম কথা বলতেন। ফিতনা-ফাসাদ থেকে সর্বদা আল্লাহর পানাহ্ চাইতেন। কিন্তু আল্লাহ সবচেয়ে বড় ফিত্না দ্বারা তাঁর পরীক্ষা নেন এবং সার্থকভাবে সত্যের সহায়তাকারী বানিয়ে দেন।

বিনয় ও নম্রতার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। মাটিই ছিল তাঁর আরামদায়ক বিছানা। ওয়ালী থাকাকালেও অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। হাট বাজারের কেনাকাটা নিজেই করতেন এবং নিজেই সবকিছু পিঠে করে বহন করতেন। সব কাজ নিজ হাতে করতেন। হযরত আম্মারের এক সমসাময়িক ব্যাক্তি ইবন আবিল হুজাইল বলেন, 'আমি কুফার আমীর আম্মারকে দেখলাম, তিনি কুফায় কিছু শশা খরীদ করলেন। তারপর সেগুলি রশি দিয়ে বেঁধে পিঠে উঠালেন এবং বাড়ীর দিকে যাত্রা করলেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২১১)

হযরত আম্মারের (রা) প্রতিটি কাজের মূল প্রেরণা ছিল আল্লাহর রিজামন্দী। সিফ্ফীনের যুদ্ধে যাওয়ার পথে বার বার তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ,আমি যদি জানতাম পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে অথবা পানিতে ডুব দিয়ে আমার জীবন বিলিয়ে দিলে তুমি খুশী হবে, আমি তোমাকে সেই ভাবে খুশী করতাম। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তোমার রিজামন্দী।

আমি আশা করি, তুমি আমার এ উদ্দেশ্য বিফল করবে না"। (তাবাকাত) তাঁর চারিত্রিক মহত্ব ও ঈমানী বলিষ্ঠতা সম্পর্কে খোদ রাসূল (সা) বলেছেন, 'আম্মারের শিরা উপশিরায় ঈমান মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। রাসূল (সা) অন্য সাহাবীদের নিকট আম্মারের ঈমান নিয়ে গর্ব করতেন। একবার প্রখ্যাত সেনা নায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আম্মারের মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয়। বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা) গোচরে এলে তিনি বলেন, 'যে আম্মারের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা করবেন। যে আম্মারকে হিংসা করবে আল্লাহও তাকে হিংসা করবেন। অন্য একটি হাদীসে আছে আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমারের অনুসরণ করবে। তোমরা আম্মারের পথ ও পন্থা থেকে হিদায়াত গ্রহণ করবে। 14

হযরত আম্মার আল্লাহর ইবাদাতে বিশেষ মজা পেতেন। সারা রাত আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করতেন। কোন অবস্থাতেই নামায কাযা করতেন না। একবার সফরে ছিলেন। গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। বহু চেষ্টার পরও পানি পেলেন না। তাঁর স্মরণ হলো, মাটিতো পানির বিকল্প। গোসলের পরিবর্তে তিনি সারা দেহে ধূলোবালি মেখে নামায আদায় করলেন। সফর থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, 'এমন অবস্থায় শুধু তায়াম্মুমই যথেষ্ট।'

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানকে (রা) বলা হয় 'সিররু রাসূলিল্লাহ'— রাসূলুল্লাহর (সা) যাবতীয় গোপন জ্ঞানের অধিকারী। তিনি যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, লোকেরা যখন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাবে তখন কার সাথে থাকতে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ? জবাবে বললেন, 'তোমরা ইবন সুমাইয়্যার সাথে থাকবে। তিনি আমরণ সত্য থেকে বিচ্যুৎ হবেন না। মহান সাহাবী হুজাইফার এটাই ছিল জীবনের শেষ কথা (রিজালুন হাওলার রাসূল-২১২)

রাসূল (সা) থেকে তিনি বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবু মূসা আশয়ারী, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন জাফর প্রমুখ সাহাবীসহ বহু তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করছেন।

'উসমান ইবন মাজউন (রা)

নাম 'উসমান, কুনিয়াত আবু সায়িব। পিতা মাজউন, মাতা সুখাইলা বিনতু 'উনাইস। জাহিলী যুগেও তিনি অত্যন্ত পূতঃ পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। সে যুগের বিপুল সংখ্যক লোক মদ পানে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তিনি তা একবারও স্পর্শ করেননি। যারা মদপান করতো, তাদেরকে তিনি বলতেন, এমন জিনিস পান করে কী লাভ যাতে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়, নীচ শ্রেণীর লোকের হাসির পাত্রে পরিণত হতে হয় এবং নেশা অবস্থায় মা-বোনের কোন বাছ-বিচার থাকেনা ?

তাঁর অন্তরটিও ছিল দারুণ স্বচ্ছ। রাসূলুল্লাহর (সা) দা'ওয়াত খুব দ্রুত তাঁকে প্রভাবিত করে। সীরাত লেখকদের মতে তাঁর পূর্বে মাত্র তের ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হলেন চৌদ্দতম মুসলমান। ইবন সা'দের একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) আরকামের গৃহে আশ্রয় নেওয়ার পূর্বেই 'উসমান ইবন মাজউন, উবাইদা ইবনুল হারিস, আবদুর রহমান ইবন আউফ, আবু সালামা আবদিল আসাদ এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মদীনায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী প্রথম মুহাজির এবং মদীনার বাকী' গোরস্তানে দাফনকৃত প্রথম মুসলমান।

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে সর্বপ্রথম মুসলমানদের একটি দল রাসূলুল্লাহর (সা) ইজাযত নিয়ে হাবশায় হিজরাত করেন। 'উসমান ইবন মাজউন ছিলেন এই মুহাজির দলটির আমীর বা নেতা। এই দলটির সাথে তাঁর পুত্র সায়িবও ছিলেন। বেশ কিছুকাল হাবশায় অবস্থানের পর সংবাদ পেলেন যে মক্কার গোটা কুরাইশ খান্দান ইসলাম কবুল করেছে। তিনি আনন্দ সহকারে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। মক্কার কাছাকাছি পৌছে যখন বুঝতে পারলেন খবরটি ভিত্তিহীন, তখন ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। কারণ, এত দূর দেশে আবার ফিরে যাওয়া যেমন কষ্টকর, তেমনি মক্কায় প্রবেশ করাও নিরাপদ নয়। এমন দোটানা অবস্থায় যেখানে পৌছেছিলেন সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে যখন তাঁর সকল সঙ্গী-সাথী নিজ নিজ মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় মক্কায় ফিরে গেলেন, তখন তিনিও ওয়ালিদ ইবন মুগীরার নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

ওয়ালিদ ইবন মুগীরার প্রভাবে হযরত উসমান ইবন মাজউন দৈহিক অত্যাচার উৎপীড়নের হাত থেকে তো রেহাই পেলেন, কিন্তু রাসূল (সা) ও অন্যান্য সাহাবীদের ওপর যে যুলুম-অত্যাচার চলছিল তা দেখে মোটেই সুখী হতে পারলেন না। একদিন তিনি নিজেকে তিরস্কার করে বললেন ঃ আফসুস ! আমার আত্মীয়-বন্ধু ও গোত্রের লোকেরা নানা রকম যুলুম-অত্যাচার সহ্য করছে আর আমি এক মুশরিকের সহায়তায় সুখে জীবন যাপন করছি। আল্লাহর কসম ! এটা আমার নিজের সত্তার দারুণ দুর্বলতা।'

এমনই একটা চিন্তায় তিনি ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। একটা অপরাধ বোধে তিনি জর্জরিত হতে লাগলেন। তিনি ওয়ালিদের কাছে গিয়ে বললেন ঃ 'ওহে আবু আবদি শামস, তোমার দায়িত্ব তুমি যথাযথভাবে পালন করছো। এতদিন আমি তোমার আশ্রয়ে কাটিয়েছি, কিন্তু এখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হিফাজতে থাকাই আমি শ্রেয় মনে করি। আমার জন্য আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবীদের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।' ওয়ালিদ বললো ঃ 'কেউ হয়তো তোমাকে কষ্ট দিয়েছে।' তিনি

বললেন, 'না। আসল কথা, আল্লাহ ছাড়া আর কারো সাহায্য এখন আমার প্রয়োজন নেই। তুমি এখনই আমার সাথে কা'বায় চলো এবং যেভাবে আমাকে আশ্রয় দানের কথা ঘোষণা করেছিলে তেমনিভাবে তা প্রত্যাহারের ঘোষণাটিও দিয়ে দাও।' তার পীড়াপীড়িতে ওয়ালিদ কা'বার চত্বরে সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা দান করলো এবং উসামানও দাঁড়িয়ে ওয়ালিদের কথা সত্যায়িত করে বললে ঃ বন্ধুগন, আমি ওয়ালিদকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও দয়াশীল পেঁয়েছি। যেহেতু এখন আমার আল্লাহর ও তাঁর রাসূল ছাড়া আর কারো সহায়তা পছন্দীয় নয়, তাই আমি নিজেই ওয়ালীদের ইহ্সান বা উপকারের বোঝা আমার ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলছি।'

এই ঘোষণার পর 'উসমান ইবন মাজউন গেলেন লাবীদ ইবন রাবীয়ার সাথে কুরাইশদের একটি মজলিসে। লাবীদ ছিলেন তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি। তিনি উপস্থিত হতেই কবিতার আসর শুরু হয়ে গেল। লাবীদ তাঁর কাসীদা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। যখন তিনি এ ছত্রে পৌছলেন-'আলা কুল্লু শাইয়িন মা খালাল্লাহা বাতিলুন'—'ওহে, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল—অসার' তখন 'উসমান হঠাৎ বলে উঠলেন 'তুমি সত্য কথাই বলেছো'। কিন্তু লাবীদ যখন দ্বিতীয় ছত্রটি পাঠ করলেন—'ওয়া কুল্লু নাঈমিন লামাহালাতা যায়িলুন'—এবং সকল সম্পদই নিশ্চিত ধ্বংস হবে—তখন তিনি প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে উঠেন 'তুমি মিথ্যা বলেছো।' মজলিসে উপস্থিত সকলেই ক্রোধভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো। তারা লাবীদকে শ্লোকটি পুনরায় আবৃত্তি করতে অনুরোধ করলো। লাবীদ আবার আবৃত্তি করলো এবং উসমানও প্রথম ছত্রটি সত্য ও দ্বিতীয়টি মিথ্যা বলে মত প্রকাশ করে বললেন ঃ 'তুমি মিথ্যা বলেছো। জান্নাতের নিয়ামত বা সুখ-সম্পদ কখনও ধ্বংস হবে না। একথা শুনে লাবীদ একটু রুষ্ট হয়ে বললো ঃ 'কুরাইশ গোত্রের লোকেরা, তোমাদের মজলিসের এ অবস্থা তো পূর্বে কখনও ছিলনা।' এই উস্কানিমূলক উক্তিতে সমগ্র মজলিস ক্রোধে ফেটে পড়লো। ইত্যবসরে এক হতভাগা 'উসমানের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর মুখে সজোরে এক ঘুষি মেরে দেয়। ঘুষি খেয়ে তাঁর একটি চোখ রক্ত জমে কালো হয়ে যায়। লোকেরা বললো, 'উসমান, তুমি তো ওয়ালিদের আশ্রয়ে বেশ ভালোই ছিলে এবং তোমার চোখও এ কষ্ট থেকে নিরাপদে ছিল'। জবাবে তিনি বললেন, 'আল্লাহর আশ্রয়ই সবচেয়ে বেশী নিরাপদ ও সম্মানজনক, আমার যে চোখটি এখনো ভালো আছে, সেটাও তার বন্ধুর কষ্টের ভাগী হওয়ার জন্য উদগ্রীব।' ওয়ালিদ জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি আবার আমার হিফাজতে আসতে চাও ?' তিনি বললেন, 'এখন আমার আল্লাহর হিফাজতই যথেষ্ট।' তাঁর এ সময়ের অনুভূতির চমৎকার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর স্বরচিত একটি কাসীদায়। হযরত আলীও তাঁর একটি কবিতায় 'উসমানের এ ঘটনা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। (দ্রষ্টব্যঃ হায়াতুস সাহাবা, ১ম খণ্ড)

এভাবে দীর্ঘদিন যাবত হযরত 'উসমান মক্কায় নানা রকম অত্যাচার ও উৎপীড়ন ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে থাকেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সকল সাহাবীকে মদীনায় হিজরাতের অনুমতি দিলেন। হযরত উসমান ইবন মাজউন তার দুই ভাই কুদামা ইবন মাজউন, আবদুল্লাহ ইবন মাজউন ও পুত্র সায়িব ইবন উসমানসহ পরিবারের অন্য সকলকে নিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। হযরত উসমান তাঁর খান্দানের একটি লোককেও মক্কায় রেখে যাননি। মদীনা পৌছে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালামা আজলানীর (রা) অতিথি হন।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা পৌছে হযরত উসমান ও তাঁর ভাইদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এক খণ্ড প্রশস্ত ভূমি দান করেন এবং হযরত আবুল হাইসাম ইবন তাইহানের সাথে ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করে দেন।

সত্য ও মিথ্যার প্রথম সংঘাত ঘটে বদর প্রান্তরে। তিনি শরিক ছিলেন এ যুদ্ধে। যুদ্ধ থেকে ফেরার পরই তিনি রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর আনসারী ভাই এবং স্ত্রী পরিজনরা যথেষ্ট সেবা করেও

'তোমার এ অবস্থা কেন ? তোমার স্বামী তো কুরাইশদের মধ্যে একজন ধনী ব্যাক্তি ।' জবাবে তিনি বললেনঃ তাঁর সাথে আমার কি সম্পর্ক । তিনি সারা রাত নামায পড়েন, দিনে রোযা রাখেন । 'উম্মুল মুমিনীনগণ বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা) গোচরে আনেন । রাসূল (সা) তখনই উসমান ইবন মাজউনের বাড়ীর দিকে ছুটে যান এবং তাকে ডেকে বলেন ঃ 'উসমান, আমার নিজের জীবন কি তোমার জন্য আদর্শ নয় ?' উসমান বললেন, আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক' । রাসূল (সা) বললেন 'তুমি সারা রাত ইবাদাত কর, অধিকাংশ দিন রোযা রাখ ।' বললেন হাঁ, এমনটিই করে থাকি । ইরশাদ হলো, 'এরূপ করবে না । তোমার ওপর তোমার চোখের, তোমার দেহের এবং তোমার পরিবার পরিজনের হক বা অধিকার আছে । নামায পড়, আরাম কর, রোযা ও রাখ এবং ইফতার কর ।' এই হিদায়াতের পর তাঁর স্ত্রী একদিন নবী গৃহে আসলেন । তখন কিন্তু তাঁকে নব বধুর সাজে সজ্জিত দেখাচ্ছিল । তাঁর শরীর থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছিল ।

হযরত খাদীজার (রা) ইনতিকালের পর হযরত 'উসমান ইবন মাজউনের স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতু হাকীম, হযরত আয়িশা ও হযরত সাওদার সাথে বিয়ের প্রস্তাবটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পেশ করেছিলেন । তাঁরই মধ্যস্থতায় মূলতঃ রাসূলুল্লাহর (সা) এ দু'টি বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল । (হায়াতুস সাহাবা—২/৬৫৩)

১৩

আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা)

আবদুল্লাহ নাম, কুনিয়াত আবু আবদির রহমান। পিতা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব, মাতা যয়নাব। সঠিক বর্ণনা মতে হিজরী তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। এই হিসাবে নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছরে তার জন্ম। নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে হযরত উমার যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন আবদুল্লাহর বয়স প্রায় পাঁচ।

বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই আবদুল্লাহ নিজের বাড়ীটি ইসলামের আলোকে আলোকিত দেখতে পান। ইসলামী পরিবেশেই তিনি বেড়ে ওঠেন। অবশ্য কোন কোন বর্ণনা মতে, পিতার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সঠিক মত এই যে, পিতার ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি অল্প বয়স্ক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান হিসাবে তিনিও পিতার ধর্মানুসারী হয়ে যান।

হযরত উমার (রা) কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পরিবার-পরিজনসহ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। পিতার সাথে আবদুল্লাহও মদীনায় চলে যান। হিজরাতের পর সত্য-মিথ্যার প্রথম সংঘর্ষ হয় বদর প্রান্তরে। ইবন উমার তখন তের বছরের কিশোর। জিহাদে যোগদানের আবেদন জানালেন। জিহাদের বয়স না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। এক বছর পর আবার সামনে এলো উহুদের যুদ্ধ। এবারও তিনি নাম লেখালেন। একই কারণে এবারও রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি লাভে ব্যর্থ হলেন। এর দুই বছর পর হিঃ পঞ্চম সনে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবদুল্লাহর বয়স তখন পনেরো। এই প্রথম তিনি জিহাদে গমনের জন্য রাসুলুল্লাহর অনুমতি লাভ করেন।

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন এবং বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ঘটনাক্রমে পিতা হযরত উমারের (রা) পূর্বেই তিনি এ গৌরব লাভ করেন। এদিন হযরত ‘উমার (রা) এক আনসারীর নিকট থেকে একটি ঘোড়া আনার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি পথে বের হতেই শুনতে পেলেন রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করছেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে প্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন। তারপর ঘোড়াসহ ফিরে এসে খবর দিলে হযরত উমার (রা) বাইয়াত করেন।

খাইবার অভিযানেও তিনি শরীক ছিলেন। এই সফরে রাসূল (সা) হালাল-হারামের যে বিধান ঘোষণা করেন, তিনি তার একজন বর্ণনাকারী। (বুখারী)

মক্কা বিজয়ের সময় ইবন উমার বিশ বছরের নওজোয়ান। এ অভিযানে তিনি অন্য মুজাহিদদের পাশাপাশি ছিলেন। তাঁর হাতিয়ার ছিল একটি দ্রুতগামী ঘোড়া ও একটি ভারি নিযা। গায়ে ছিল এক প্রস্থ চাদর। এ সময় একদিন তিনি নিজ হাতে ঘোড়ার ঘাস কাটছিলেন, এ অবস্থায় রাসূল (সা) তাঁকে দেখে বলে ওঠেন— ‘আবদুল্লাহ,আবদুল্লাহ।’ মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহর (সা) পেছনে পেছনে খানায়ে কাবায় প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সর্বপ্রথম উসামা বিন যায়িদ, উসমান বিন তালহা ও বিলাল ইবন রিবাহ প্রবেশ করেন। তারপর আমিই প্রথম কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন অভিযান এবং তায়িফ অবরোধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। অসংখ্য মুসলমানের সাথে ইবন উমারও রাসূল্লাহর (সা) বিদায় হজ্জে সংগী হয়ে এ হজ্জ আদায় করেন।

নবম হিজরীতে পরিচালিত হয় তাবুক অভিযান। তিরিশ হাজার মুজাহিদসহ রাসূল (সা) তাবুক যাত্রা করেন। ইবন উমারও ছিলেন এ বাহিনীর অন্যতম সদস্য। মোটকথা খন্দক থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ও ঘটনায় তিনি শরীক ছিলেন।

প্রথম খলীফার সময়কালে ইবন উমারকে উল্লেখযোগ্য কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত দেখা যায় না। অথবা জড়িত থাকলেও ইতিহাসে সে সম্পর্কে তেমন কিছু পাওয়া যায় না।

তবে দ্বিতীয় খলীফার যুগে কোন কোন অভিযানে সাধারণ সৈনিক হিসাবে তাঁর উপস্থিতি ইতিহাসে দেখা যায়। নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। সিরিয়া ও মিসর অভিযানে তাঁর অংশগ্রহণের কথা ইতিহাসে জানা যায়। তবে এসব অভিযানে তাঁর উল্লেখযোগ্য কোন অবদানের কথা জানা যায় না। এ সময় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডেও তাঁকে অনুপস্থিত দেখা যায়। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, খলীফা উমার (রা) তাঁর নিকট আত্মীয়দের খিলাফতের বিশেষ কোন কাজে জড়িত হওয়া পছন্দ করতেন না। এতদসত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর লাভ-ক্ষতির কোন প্রশ্ন দেখা দিলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পিতার সকল কঠোরতা মাথা পেতে নিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, খলীফা উমার (রা) যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ইবন উমার তাঁর বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার (রা) মুখে শুনতে পেলেন, উমার (রা) কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চান না। ইবন উমার পিতার অবর্তমানে উম্মাতের ভবিষ্যত সমস্যার কথা চিন্তা করলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পিতার সামনে উপস্থিত হয়ে সাহসের সাথে আরজ করলেন, "মানুষের নানা কথা আমার কানে আসছে, আপনাকে তা জানাতে এসেছি। তাদের ধারণা আপনি কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চান না। তিনি আরো বলেন, ধরে নিন কোন রাখাল আপনার উট-বকরী চরায়। সে যদি উট-বকরীর পাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে আপনার কাছে চলে আসে, তাহলে তার পরিণতি কেমন হয় ? মানুষের রাখালী তো আরো কঠিন কাজ।' এ যুক্তিপূর্ণ কথা খলীফা উমারের মনোঃপুত হল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, আল্লাহ নিজেই তার পশু পালের তত্বাবধায়ক। শেষ পর্যন্ত তিনি পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব একদল উঁচু পর্যায়ের সাহাবীদের ওপর ন্যস্ত করে যান।

পিতার ওফাতের পর সর্বপ্রথম ইবন উমারকে খলীফা নির্বাচনের মজলিসে দেখা যায়। হযরত উমার অসীয়াত করে যান যে, পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে আবদুল্লাহ শুধুমাত্র পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করবে। তাকে খলীফা বানানো চলবে না।

খলীফা উসমানের যুগে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। তবে অবৈধ কোন ফায়দা লাভের চেষ্টা কখনো করেননি। খলীফা উসমান (রা) তাঁকে কাজীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, আমি দুই ব্যক্তির মাঝে না ফয়সালা করে থাকি, না দুই ব্যক্তির ইমামতি করে থাকি। কারণ, রাসূল (সা) বলেছেন, 'কাজী তিন শ্রেণীর। এক, জাহিল। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। দুই, দুনিয়াদার আলিম। তারাও জাহান্নামী। তিন, যারা ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাদের জন্য নাশাস্তি না পুরস্কার।' খলীফা বললেন, 'তোমার পিতাও তো ফয়সালা করতেন।' বললেনঃ হাঁ, একথা সত্য। তবে কোন সমস্যায় পড়লে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যেতেন। রাসূলও (সা) যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারাগ হতেন তখন জিবরাঈলের শরণাপন্ন হতেন। কিন্তু আমি এখন কার কাছে যাব ? আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে অব্যাহতি দিন। খলীফা তাকে অব্যাহিত দিয়েছিলেন। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, একথা তিনি অন্য কারো নিকট প্রকাশ করবেন না। কারণ, খলীফা জানতেন, লোকেরা যদি জানতে পারে ইবন উমার কাজীর পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাহলে এ পদের জন্য আর কোন সত্যনিষ্ঠ মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সকলে ইবন উমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

খিলাফতের প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে দূরে থাকলেও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ থেকে কখনো দূরে থাকেননি। জিহাদের ডাক যখনই এসেছে, সাড়া দিয়েছেন। হিজরী ২৭ সনে আফ্রিকা (তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো) অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। হিজরী ৩০ সনে সাঈদ ইবন আসের সাথে খুরাসান ও তিবরিস্তান অভিযানে শরীক হন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা ও ফিতনা-ফাসাদ শুরু হওয়ার পর সম্পূর্ণ নির্জনতা অবলম্বন করেন। খিলাফতের কোন কর্মকাণ্ডে আর অংশগ্রহণ করেননি। হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাতের পর লোকেরা তাঁকে খলীফার পদটি গ্রহণের অনুরোধ জানায়। তিনি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। লোকেরা তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

আলী ও মুয়াবিয়া (রা)— এ দু'জনের মধ্যে কার খিলাফত তিনি মেনে নিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবন হাজার বলেন, 'ইবন উমার মনে করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত কোন লোকের ব্যাপারে জনগণের ইজমা বা ঐক্যমত না হয় ততক্ষণ তার হাতে বাইয়াত করা উচিত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি আলীর (রা) হাতে বাইয়াত করেননি। কিন্তু মুসতাদরিকের একটি বর্ণনামতে এই শর্তে আলীর (রা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন যে, তিনি আলীর সাথে গৃহযুদ্ধে জড়িত হবেন না। আলী তাঁর এই শর্ত অনুমোদনও করেছিলেন। তবে একথা সত্য যে, তিনি উট ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে কোনপক্ষেই যোগদান করেননি। তাঁর হাতে কোন মুসলমানের এক বিন্দু রক্তও ঝরেনি। তবে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আলীর (রা) পক্ষে যোগদান না করায় একটা তীব্র অপরাধ বোধ করেছেন।

সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের পর আবু মুসা আশয়ারী ও 'আমর ইবনুল আস উভয়পক্ষের বিচারক নিযুক্ত হন। আবু মুসা তাঁর প্রতিপক্ষের নিকট খলীফা হিসাবে আবদুল্লাহ ইবন উমারের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আমর ইবনুল আস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বিচারকদ্বয়ের সিদ্ধান্ত শোনার জন্য অন্যান্য মুসলমানের সাথে ইবন উমারও দু'মাতুল জান্দালে উপস্থিত হয়েছিলেন।

হযরত আলীর শাহাদাতের পর তিনি আমীর মুয়াবিয়ার খিলাফত মেনে নেন। তাঁর যুগের বিভিন্ন অভিযানে তিনি শরীক হন। কমস্টান্টিনোপল অভিযানে তিনি যোগদান করেছিলেন।

আমীর মুয়াবিয়ার (রা) পর ইয়াযিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক বিভেদজনিত ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ 'যদি তা ভালো হয়, আমরা খুশী থাকবো, আর যদি তা মন্দ হয়, আমরা ধৈর্য ধারণ করবো।' কিছুদিন পর মদীনাবাসীরা ইয়াযিদের প্রতি কৃত তাদের বাইয়াত প্রত্যাহার করলে তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের ডেকে বলেন, আমি ইয়াযিদের হাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের বাইয়াত করেছি।....তোমাদের কেউ যেন এ বাইয়াত ভঙ্গ না করে। যদি কেউ ভঙ্গ করে তাহলে তরবারিই আমার ও তার মধ্যে ফায়সালা করবে।' তার মতে এ বাইয়াত ফাসখ বা প্রত্যাহারের অর্থ হল এক ধরনের ধোঁকাবাজী। আর শরীয়াতে ধোঁকাবাজীর কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে। কোন লোভের বশবর্তী হয়ে তিনি ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত করেননি।

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া খলীফা হলেন। মাত্র তিন মাসের জন্য তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর একদিকে মক্কায় আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা করেন। ইরাক, হিজায ও ইয়ামনের জনগণ তাঁর হাতে বাইয়াত করে। অন্যদিকে মারওয়ান নিজেকে খলীফা দাবী করে সিরিয়াবাসীর বাইয়াত আদায় করেন। তৎকালীন ইসলামী খিলাফতের অধিকাংশ অঞ্চল যদিও আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের সমর্থক ছিল, তবুও আবদুল্লাহ ইবন উমার তার দাবীর প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি। খিলাফতের দাবী নিয়ে যখন দুই বিবদমান গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে, তখন এক ব্যক্তি ইবন উমারকে বললো, আল্লাহ ফিতনা

প্রতিরোধের জন্য জিহাদ করতে বলেছেন। জবাবে তিনি বলেন, যখন ফিতনা ছিল, আমরা জিহাদ করেছি। কাফিররা মুসলমানদের আল্লাহর ইবাদাতের অনুমতি দিত না এই ছিল সে দিনের ফিতনা। আজকের এ গৃহযুদ্ধ জিহাদ নয়, বরং বাদশাহীর জন্য আত্মঘাতী লড়াই। তবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন মক্কায় আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের ওপর আক্রমণ চালায় এবং কা'বার একাংশ ধ্বংস করে ফেলে তখন তিনি ভীষণ বিরক্তি ও নিন্দা প্রকাশ করেন।

আবদুল মালিকের হাতে যখন খিলাফতের বাইয়াত হলো, ইবন উমারও একটা লিখিত বাইয়াত পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর বাইয়াতের বিষয়বস্তু ছিল এমনঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের ওপর আমি ও আমার পুত্র আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালিকের যথাসাধ্য আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি।' আবদুল মালিক ইবন উমারকে খুবই সম্মান করতেন এবং শরীয়াতের নির্দেশ পালনে তাঁকেই অনুসরণ করতেন। হজ্জের সময় আরকানে হজ্জ পালনের ব্যাপারে ইবন উমারকে অনুসরণের নির্দেশ জারি করতেন।

হিজরী ৭৪ সনে ৮৩ অথবা ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। হজ্জের সময় এক ব্যক্তির বিষাক্ত বর্শার ফলা তাঁর পায়ে বিঁধে যায়। এই বিষেই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, শুধুমাত্র ঘটনাক্রমে এমনটি হয়নি, বরং এর পেছনে হাজ্জাজের ইঙ্গিত ছিল। কারণ, কা'বায় আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য ইবন উমার হাজ্জাজের ভীষণ তিরস্কার করেন। এতে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হন। অতঃপর তাঁরই ইঙ্গিতে একজন শামী সৈনিক তাঁকে এভাবে আহত করে। অবশ্য ইবন হাজার বলেছেন, আবদুল মালিক হাজ্জাজকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইবন উমারের সাথে সংঘাতে না যাওয়ার জন্য। হাজ্জাজের কাছে এ নির্দেশ ছিল অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই তিনি এই বিকল্প পথে ইবন উমারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেন।

ইবন সা'দ বর্ণনা করেন, একবার হাজ্জাজ খুতবার মধ্যে ইবন যুবাইরের প্রতি দোষারোপ করেন যে, তিনি কালামুল্লাহর বিকৃতি সাধন করেছেন। ইবন উমার সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছো। ইবন যুবাইরের এমন ক্ষমতা নেই এবং এমন অভিযোগ উত্থাপনের তোমারও কোন সুযোগ নেই।' সাধারণ সমাবেশে এমন কঠোর প্রতিবাদ হাজ্জাজ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু প্রকাশ্যে ইবন উমারের সাথে কোন রকম অসৌজন্যমূলক আচরণের সাহসও তাঁর ছিল না। তাই তিনি এমন গোপন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, একদিন হাজ্জাজ এত দীর্ঘ খুতবা দিলেন যে, আসর নামাযের সময় সংকীর্ণ হয়ে পড়লো। ইবন উমার বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন—'সূর্য তোমার প্রতীক্ষা করতে পারে না।' যাইহোক, বিভিন্ন কারণে স্বৈরাচারী হাজ্জাজ সত্যের সৈনিক ইবন উমারকে সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই এভাবে তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

বিষের ক্রিয়ায় ইবন উমার যখন শয্যাশায়ী, তখন হাজ্জাজ তাঁকে দেখতে গেলেন। কুশল বিনিময়ের পর হাজ্জাজ বললেন, অ পরাধীকে আমি চিনতে পেলে তার গর্দান নিতাম। ইবন উমার বললেন, সবকিছু তো তুমি করেছো। তারপর বলছো, অপরাধীকে পেলে হত্যা করতে। মুখের ওপর এমন অপ্রিয় সত্য কথা শোনার পর হাজ্জাজ চুপ হয়ে যান।

মদীনা মুনাওয়ারায় জীবনের শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করার একান্ত ইচ্ছা ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমারের। তাঁর অবস্থা যখন অবনতির দিকে যেতে লাগলো, তিনি দুআ করতে লাগলেন; 'হে আল্লাহ, আমাকে মক্কায় মৃত্যুদান করো না।' পুত্র সালেমকে অসীয়াত করেন, 'মক্কায় আমার মৃত্যু হলে মক্কার হারামের বাইরে কোন এক স্থানে আমাকে দাফন করবে। যে যমীন থেকে আমি হিজরত করেছি, সেখানে সমাহিত হওয়া ভালো মনে হচ্ছে না।' অসীয়াতের অল্প কিছু দিন পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁর অসীয়াত অনুযায়ী হারামের বাইরে লাশ দাফন করতে চায়। কিন্তু হাজ্জাজ তাতে বাধা দেন। তিনি নিজেই জানাযার নামায পড়ান এবং 'ফাখ' নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করেন।

সফর ও ইকামাত বা বাড়ী এবং বাড়ীর বাইরে ভ্রমণে থাকা—সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য, হযরত ফারুকে আজমের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সর্বোপরি তাঁর নিজের অনুসন্দিৎসা তাঁকে ইসলামী জ্ঞানের সমুদ্রে পরিণত করেছিল। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। সেকালে মদীনার যে সকল মনিষীকে বলা হতো ইলম ও আমলের 'মাজমাউল বাহরাইন' বা দুই সমুদ্রের সঙ্গম স্থল, ইবন উমার ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর দারুণ আকর্ষণ ছিল। কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের ওপর গবেষণা করে জীবনের বিরাট এক অংশ ব্যয় করেন। কেবল সূরা বাকারার ওপর গবেষণায় চৌদ্দটি বছর অতিবাহিত হয়। এতে অনুমান করা যায় কুরআন বুঝার জন্য তিনি কী পরিমাণ শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন। কুরআনের প্রতি এই ব্যতিক্রমধর্মী আকর্ষণই তাঁর মধ্যে কুরআনের তাফসীর ও তাবীলের এক অনন্য যোগ্যতা সৃষ্টি করে। কুরআন বুঝার ক্ষমতা যৌবনের সূচনা লগ্নেই তাঁর মধ্যে জন্ম নেয়। এ কারণে বড় বড় সাহাবীদের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিসে তাঁকে শরীক দেখা যায়।

কুরআনের পর হাদীসের স্থান। ইবন উমার ছিলেন প্রথম কাতারের হাফেজে হাদীস। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০ (এক হাজার ছ'শ' তিরিশ)। এর মধ্যে ১৭০টি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। ৮১টি বুখারী ও ৩১টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি কথাও কাজ জানার প্রবল আকাংখা তাঁর মধ্যে ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) সান্নিধ্য থেকে যে সময়টুকু তিনি দূরে থাকতেন তখন যাঁরা তাঁর খিদমতে উপস্থিত থাকতেন তাঁদের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সেই সময়ের কথা ও কাজ জেনে নিতেন এবং তা স্মৃতিতে ধরে রাখতেন। তাঁর অজানা নতুন কোন কথা জানতে পেলে সংগে সংগে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অথবা প্রথম রাবীর কাছে উপস্থিত হয়ে তার সত্যতা যাচাই করে নিতেন। এই অনুসন্ধিৎসু মন ইবন উমারকে হাদীস শাস্ত্রের এক বিশাল সমুদ্রে পরিণত করে। রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ নিঃসৃত বাণীর প্রতিটি অক্ষর স্মরণ না থাকলে তিনি তা বর্ণনা করতেন না। তাঁর সমসাময়িক লোকেরা বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কমবেশী হওয়া সম্পর্কে ইবন উমার অপেক্ষা অধিক সতর্ক ব্যক্তি সাহাবীদের মধ্যে আর কেউ নেই।'

হযরত ইবন উমারের মাধ্যমে ইলমে হাদীসের বিস্তর অংশ প্রচারিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর ষাট (৬০) বছরের বেশী সময় জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি একাগ্রচিত্তে ইলমে দ্বীনের চর্চা করেছেন। ইবন শিহাব যুহরী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের কোন বিষয় ইবন উমারের অজানা ছিল না।' জ্ঞানের ঐ চর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে কোন সরকারী দায়িত্ব তিনি তখনও গ্রহণ করেননি। তাঁর স্থায়ী 'হালকায়ে দরস' ছিল মদীনায়। হজ্জের মওসুমে তিনি ফাতওয়া দিতেন। মানুষের বাড়ীতে গিয়েও তিনি হাদীস শুনাতেন। বর্ণিত আছে, একদিন তিনি আবদুল্লাহ ইবন মুতী'র বাড়ীতে যান। আবদুল্লাহ তাঁকে বসতে দিলেন। বসার পর ইবন 'উমার বললেন, তোমাকে একটি হাদীস শোনানোর জন্য আমি এ সময় তোমার এখানে এসেছি। রাসূল (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে দূরে থাকবে কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে তাঁর কাছে কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে পৃথক হয়ে মৃত্যুবরণ করলো সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো।'

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কমবেশী হওয়াকে ভীষণ ভয় পেতেন। এ কারণে খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম শা'বী বলেন, আমি এক বছর যাবত আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের

কাছে বসেছি। এর মধ্যে কোন হাদীসই তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেননি। হাদীস বর্ণনা তিনি খারাপ মনে করতেন বা কম বর্ণনা করতেন এমন নয়, বরং বিনা প্রয়োজনে বর্ণনা করতেন না। রাসূলুল্লাহর (সা) উচ্চারিত শব্দেই হাদীস বর্ণনা জরুরী বলে তিনি মনে করতেন। শব্দের হেরফের পছন্দ করতেন না।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের কারণে মুহাদ্দিসদের নিকট তাঁর বর্ণিত হাদীস সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য হয়। ইবন শিহাব যুহরী তো কোন বি ষয়ে ইবন উমারের হাদীস পেলে আর কারো হাদীসের প্রয়োজন মনে করতেন না। হাদীস বর্ণনার সনদের ক্ষেত্রে 'মালিক 'আন নাফে' 'আন ইবন 'উমার'—এই সনদটিকে মুহাদ্দিসরা 'সিলসিলাতুজ জাহাব' বা সোনালী চেইন নামে অভিহিত করে থাকেন। কারণ, ইবন 'উমার প্রায় পনেরটি বছর রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবতে কাটিয়েছেন। আবু বকর ও উমারের পুরো সময়টা প্রত্যক্ষ করেছেন। উমারের সাহচর্যে প্রায় তিরিশটি বছর অতিবাহিত করেছেন। এই সনদের দ্বিতীয় ব্যক্তি 'নাফে' ইবন উমারের গোলাম। প্রায় তিরিশটি বছর তিনি মনিবের খিদমতে কাটিয়েছেন। সনদের তৃতীয় ব্যক্তি ইমাম মালিক। তিনি তাঁর উস্তাদ নাফে'র হালকায়ে দরসে দশ বারো বছর বসার সুযোগ লাভ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়াও ইবন উমার, আবু বকর, 'উমার', উসমান, আলী, যায়িদ বিন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, বিলাল, সুহাইব, রাফে, আয়িশা ও হাফসার (রা) মত শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের নিকট থেকেও জ্ঞান অর্জন করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের জীবনটি ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। হযরত আবু হুজায়ফা বলতেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর প্রতিটি মানুষের কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়, কিন্তু 'উমার ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ইবন উমারের একান্ত খাদেম নাফে' তাঁর তাবেঈ ছাত্রদের বলতেন, এ যুগে যদি ইবন উমার বেঁচে থাকতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর কঠোরতা দেখে তোমরা বলতে, লোকটি পাগল' তিনি প্রায় পঁচাশি বছর জীবিত ছিলেন এবং শৈশবেই রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি বলেছেনঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াতের পর থেকে আমার আজকের এ দিনটি পর্যন্ত তা ভঙ্গ করিনি বা তাতে কোন পরিবর্তন করিনি।' শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়, রাসূলুল্লাহর (সা) মানবসুলভ কাজ ও অভ্যাসসহ প্রতিটি আচরণের তিনি অনুসরণ করতেন। যেমন, হজ্জের সফরে রাসূল (সা) যেখানে যেখানে রাত্রি যাপন করতেন, পরবর্তীকালে তিনিও একই স্থানে রাত্রি যাপন করতেন। রাসূল (সা) যে সকল স্থানে নামায আদায় করতেন, তিনি সেখানে নামায আদায় করতেন। যে রাস্তা দিয়ে রাসূল (সা) চলতেন তিনিও সেই রাস্তা দিয়ে চলতেন। এমন কি যে সকল স্থানে রাসূল (সা) অজু-গোসল করেছেন তিনিও সেখানে একই কর্ম সম্পাদন করতেন। মোটকথা, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি হুবহু অনুসরণ করতেন। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজকে লোকেরা মনে করতো প্রকৃতপক্ষে তা রাসলুল্লাহর (সা) কথা ও কাজ। যেহেতু লোকে তাঁকে অনুসরণ করতো, তাই ব্যক্তিগত কারণে কোন ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করতে না পারলে স্পষ্ট করে বলে দিতেন, এটা রাসূলুল্লাহর (সা) কাজ বা আমল নয়। বিশেষ ওজর বশতঃ আমি এমন করেছি। তাতে মানুষের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যেত। হযরত আয়িশা (রা) তাঁর ইন্তেবায়ে সুন্নাত সম্পর্কে বলেছেনঃ 'ইবন 'উমারের মত আর কেউ রাসূলুল্লাহর (সা) পদাংক অনুসরণ করেন না।'

তাফাক্কুহ্ ফিদ-দ্বীন বা দ্বীন সম্পর্কিত চিন্তা-গবেষণা তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সারাটি জীবন তাঁর জ্ঞানচর্চা ও ফাতওয়া দিয়েই কাটে। মদীনার প্রখ্যাত মুফতী সাহাবীদের মধ্যে তিনিও একজন। তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশেষজ্ঞরাও তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান চাইতেন। সাঈদ ইবন জুবাইরের মত শ্রেষ্ঠ তাবেঈও তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান

নিতেন। পরবর্তীকালে মালেকী মাজহাব মূলতঃ ইবন উমারের এসব ফাতওয়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ইমাম মালিক বলতেন, ইবন উমার দ্বীনের অন্যতম ইমাম। তাঁর ফাতওয়া সংগৃহীত হলে তা বৃহদাকার গ্রন্থে পরিণত হত। ফাতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হাফেজ ইবন আবদিল বার বলেনঃ 'ইবন 'উমার তাঁর ফাতওয়া ও 'আমল— উভয় ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। খুব ভাবনা-চিন্তা করে যেমন কথা বলতেন তেমনি কাজও করতেন ভেবে-চিন্তে।

দ্বীনী ইলম ছাড়া তৎকালীন আরবের প্রচলিত জ্ঞান যেমনঃ কবিতা, কুষ্ঠিবিদ্যা, বাগ্মীতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইবন উমারের বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। এর সম্ভাব্য কারণ এই যে দ্বীনী ইলম ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের চর্চায় সময় ব্যয় সমীচীন মনে করতেন না।

একথা সত্য যে, সকল সাহাবীর ওপর সার্বিকভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছিল, তবে ইবন উমারের ওপর পড়েছিল একটু গভীরভাবে। তাঁর প্রতিটি কথা ও আচরণে রাসূলুল্লাহর (সা) স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠতো।

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে সাহাবীদের প্রশংসায় বলেছেন, 'ইজা জুকেরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম—তাদের কাছে যখন আল্লাহর কথা বলা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়ে কেঁপে ওঠে। ইবন উমারের মধ্যে এ অবস্থার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। একবার তাঁর সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হলো—ফাকায়ফা ইজা জি'না মিন কুল্লি উম্মাতিন শাহীদা—তখন কেমন হবে যখন আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে সাক্ষী উপস্থিত করবো। ইবন উমার এ আয়াতটি শুনে এত কাঁদলেন যে চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল এবং তাঁর আশেপাশে লোকেরাও তাতে প্রভাবিত হলো।

ইবন উমার ছিলেন একজন বড় ধরনের আবেদ ও শবগুজার ব্যক্তি। রাতের সিংহভাগ ইবাদাতে অতিবাহিত করতেন। তাঁর খাদেম নাফে' বলেন, তিনি সারা রাত নামায আদায় করতেন। সুবহে সাদিকের সময় আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, সকাল কি হলো? আমি যদি হাঁ বলতাম, তাহলে আর একটু ফর্সা হওয়া পর্যন্ত ইসতিগফারে কাটাতেন। আর 'না' বললে আবার নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। কুরআন তিলাওয়াতে তিনি এক অপার্থিব স্বাদ অনুভব করতেন। এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। প্রতি বছর হজ্জ আদায় করতেন। ছোট ছোট ইবাদাতও তিনি ছাড়তেন না। প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন ভাবে অজু করতেন। মসজিদে যাওয়ার সময় ধীরে ধীরে পা ফেলতেন যাতে কদম সংখ্যা বেড়ে যায় এবং সওয়াবও বেশী অর্জিত হয়।

ইবন উমার ছিলেন যুহদ ও তাকওয়ার বাস্তব নমুনা। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অতুলনীয় যাহিদ ও মুত্তাকী। হযরত জাবির (রা) বলতেন, আমাদের মধ্যে ইবন উমার ছাড়া এমন আর কেউ ছিল না যাকে দুনিয়ার চাকচিক্য আকৃষ্ট করেনি। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে তাকওয়ার ভাবটি গালিব ছিল। রাসূল (সা) তাঁর এই তাকওয়া স্বভাব দেখে বলেছিলেন, 'রাজুলুস সালেহ—নেককার বান্দা।'

তিনি ছিলেন খুবই দানশীল। সবসময় প্রিয়তম জিনিসটি আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন। যে দাস বা দাসীটি তাঁর কাছে ভালো বলে মনে হতো, তাকে আযাদ করে দিতেন। এক বৈঠকে তিনি হাজার হাজার দিরহাম বিলিয়ে দিতেন। তিনি এত বেশী দাস-দাসী আযাদ করতেন যে, তাঁর আযাদকৃত দাস-দাসীর সংখ্যা এক হাজারের উর্ধ্বে। একবার খুব সুন্দর একটি উট খরীদ করে তার ওপর সোয়ার হয়ে হজ্জে রওয়ানা হলেন। উটটির চলন তাঁর খুবই ভালো লাগলো। হঠাৎ তিনি নেমে পড়লেন এবং তার পিঠ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে ফেলে তাকে কুরবানীব পশুর সাথে মিলিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আইউব ইবন ওয়ায়িল আর-রাসিবী বলেন, একদিন ইবন উমারের হাতে চার হাজার দিরহাম ও একটি মখমলের চাদর এলো। পরদিন তিনি ইবন উমারকে দেখলেন বাজার থেকে তাঁর সোয়ারী পশুর জন্য বাকীতে খাদ্য কিনছেন, ইবন ওয়ায়িল তখনই ইবন উমারের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর

পরিবারের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, গতকালই কি ইবন উমারের হাতে চারহাজার দিরহাম ও একটি মখমলের চাদর আসেনি? তারা বললো, 'হাঁ'। ইবন ওয়ায়িল বললেন, আজ আমি তাঁকে বাজার থেকে বাকীতে পশু খাদ্য কিনতে দেখলাম। তারা বললো, সেগুলিতো তিনি রাত পোহানোর আগেই বিলিয়ে দিয়েছেন। তারপর সেই চাদরটি কাঁধে করে বাইরে গেলেন, যখন বাড়ী ফিরলেন, দেখলাম সেটিও নেই। জিজ্ঞেস করলে বললেন, ফকীরকে দান করেছি। একথা শুনে ইবন ওয়ায়িল হাতে তালি দিতে দিতে বাজারের দিকে ছুটলেন এবং একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সম্বোধন করলেনঃ ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তোমরা দুনিয়া দিয়ে কী করবে? এই যে ইবন 'উমার, তাঁর হাতে চার হাজার দিরহাম আসলো, আর তিনি সেগুলি বিলিয়ে দিলেন। তারপর সকাল বেলায় ধারে পশু খাদ্য কিনলেন।'

এভাবে তিনি ছিলেন—'লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বূন'—তোমরা কখনও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিস ব্যয় করবে—এ আয়াতের বাস্তব তাফসীর। 'প্রতিবেলা দু'একজন গরীব-মিসকীন সংগে না নিয়ে তিনি আহার করতেন না। প্রায়ই তিনি তাঁর ছেলেদের তিরস্কার করতেন যখন তারা খাবারের জন্য ধনীদের আমন্ত্রণ জানাতো এবং তাদের সাথে ফকীর-মিসকীনকে ডাকতো না। তিনি বলতেন, 'তোমরা ভরাপেট লোকদের ডেকে আন এবং ক্ষুধার্তদের ছেড়ে আস।'

তিনি ছিলেন সফল ব্যবসায়ী। কৃষিযোগ্য ভূমিও ছিল। বাইতুল মাল থেকে ভাতাও পেতেন। তবে নিজে খুব অল্পই ভোগ করতেন। সব বিলিয়ে দিতেন। একবার তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একটি ভরা পাত্র উপহার দিল। জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? বন্ধুটি বললেন, একটা ওষুধ। ইরাক থেকে আমি আপনার জন্য এনেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এর গুণাগুণ কি? বন্ধুটি বললেন, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে। ইবন উমার হেসে ওঠে বলেন, 'হজম শক্তি বৃদ্ধি করে! অথচ আজ চল্লিশ বছর যাবত আমি পেট ভরে আহারই করিনে।' তিনি কি কৃপণ বা অভাবী ছিলেন? না, ইতিহাস তা বলে না। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পিতা উমার ইবনুল খাত্তারের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশের জন্যই এমনটি করেছেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা। প্রিয় নবীব ইনতিকালে তাঁর অন্তরটি ভেঙ্গে খানখান হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর তিনি কোন বাড়ী বা উদ্যান তৈরী করেননি। রাসূলুল্লাহর (সা) কথা স্মরণ হলেই ডুকরে কেঁদে উঠতেন। সফর থেকে যখনই মদীনায় ফিরতেন 'রওজা পাকে' গিয়ে সালাম পেশ করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁর পরিবার-পরিজনদেরও গভীর ভাবে ভালো বাসতেন। একবার এক ইরাকী বেদুঈন তাঁর কাছে মশা হত্যার কাফ্ফারা জিজ্ঞেস করে। তিনি সাথীদের বললেন, এই লোকটিকে দেখে নাও। সে মশার রক্তের কাফ্ফারা জিজ্ঞেস করছে, অথচ তারাই প্রিয় নবীর কলিজার টুকরো হুসাইনকে শহীদ করেছে। রাসূলের (সা) প্রতি ভালোবাসার কারণে মদীনা শহরকেও তিনি দারুণ ভালোবাসতেন। শত দুঃখ-কষ্টেও মদীনা ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা কখনও করেননি।

হযরত ইবন উমার (রা) মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে এমন সব কাজ থেকে সব সময় বিরত থাকতেন। তিনি ছিলেন সত্য ভাষী। তবে মাঝে মাঝে মুসলিম উম্মাহর ক্ষতির সম্ভাবনা দেখলে চুপ থাকতেন। একবার হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) দাবী করলেন খিলাফত লাভের অধিকার আমার থেকে বেশী আর কার আছে? ইবন উমার একথার জবাব দিতে গিয়েও ফিতনা-ফাসাদের ভয়ে দেননি। তিনি চুপ থাকেন। এমনি ভাবে মিনায় খলীফা উসমানের পেছনে চার রাকায়াত নামায আদায় করেন। অথচ তিনি মনে করতেন রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর ও উমারের সুন্নাত অনুযায়ী সেখানে কসর হওয়া উচিত। আবার একাকী পড়লে দু'রাকায়াতই পড়লেন।

বিভেদ সৃষ্টির আশংকায় উসমানের পেছনে চার রাকায়াত পড়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'বিভেদ সৃষ্টি করা খারাপ কাজ।' তিনি আরো বলতেন, সমগ্র উম্মাতে মুহাম্মদী যদি আমাকে খলীফা বলে মেনে নেয় এবং মাত্র দু'ব্যক্তি মানতে অস্বীকার করে তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না।

বিভেদ সৃষ্টির ভয়েই তিনি সকল খলীফার হাতে বাইয়াত করেছিলেন। সেই ফিতনা-ফাসাদের যুগে তিনি সব আমীরের পেছনে নামায আদায় করতেন এবং তাদের হাতে যাকাত তুলে দিতেন। তবে এ আনুগত্য দ্বীনের সীমার মধ্যে সীমিত থাকতো। এ কারণে প্রথমে হাজ্জাজের পেছনে নামায আদায় করলেও পরে হাজ্জাজ নামাযে বিলম্ব করতে শুরু করলে তিনি তার পেছনে নামায আদায় ছেড়ে দেন। এমন কি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যান।

সত্য কথা বলতে ইবন 'উমার কখনও ভয় পেতেন না। উমাইয়্যা বংশীয় শাসকদের সামনাসামনি সমালোচনা করতেন। একবার হাজ্জাজ খুতবা দিচ্ছিলেন। ইবন উমার তাঁকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'এই লোকটি আল্লাহর দুশমন। সে মক্কার হারামের অবমাননা করেছে, বাইতুল্লাহ ধ্বংস করেছে এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হত্যা করেছে।'

আরেকবার হাজ্জাজ খুতবা এত দীর্ঘ করলেন যে, আসর নামাযে দেরী হয়ে গেল। ইবন উমার চেঁচিয়ে বললেন, নামাযের সময় চলে যাচ্ছে, কথা শেষ কর। এভাবে তিনবার 'উমার উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি উঠে গেলে, তোমরা কি আমার সাথে যাবে ? লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ'। ইবন 'উমার উঠে গেলেন। হাজ্জাজ তড়িঘড়ি মিম্বর থেকে নেমে নামায পড়ালেন। পরে হাজ্জাজ ইবন উমারকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এমনটি করলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমরা মসজিদে আসি নামাযের জন্য। নামাযের সময় হয়ে গেলে সাথে সাথে পড়িয়ে দেওয়া উচিত। তারপর যতক্ষণ ইচ্ছা তুমি বকবক করতে পার। তাঁর এই স্পষ্টবাদিতার কারণেই বনী উমাইয়্যার স্বৈরাচারী শাসকরা তাঁকে ভীষণ ভয় পেত।

কোন মানুষের অসম্মান এবং অহেতুক সম্মান হয়, ইসলাম এমন সব কাজ ও বৈশিষ্ট্যকে খতম করে দিয়েছে। ইবন 'উমার ছিলেন এই ইসলামী সাম্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত। এই সাম্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে এমন সব আচরণ তিনি মোটেই পসন্দ করতেন না। এ কারণে যেখানে লোকেরা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াতো সেখানে তিনি বসতেন না। তিনি তাঁর চাকর-বাকর ও দাস-দাসীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এই সাম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তিনি তাদের আত্মসম্মান বোধ শিক্ষা-দিতেন। নিজের সাথে বসিয়ে তাদের আহার করাতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দাস-দাসীদের আহার ও পোষাকের প্রতি যত্ন না নেওয়া বড় ধরনের পাপ। সালেম বলেন, ইবন উমার জীবনে একবার ছাড়া আর কখনও কোন দাস-দাসীকে বকাঝকা করেননি। একবার তিনি একটি দাসকে কোন কারণে মেরে বসেন। মারার পর এত অনুতপ্ত হন যে, তাকে আযাদ করে দেন।

বিনয় ও নম্রতা তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজের প্রশংসা শুনতে তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। এক ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করছিল। তিনি তাঁর মুখে মাটি ছুঁড়ে মারলেন। অতঃপর তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীস—প্রশংসাকারীর মুখে মাটি ছুঁড়ে মারো—' শুনিয়ে দিলেন। কোন বাছ-বিচার না করে ছোট বড় সকলকে সালাম করতেন। পথ চলতে কোন ব্যক্তিকে সালাম করতে ভুলে গেলে ফিরে এসে তাকে সালাম করে যেতেন। অত্যন্ত কটু কথা শুনেও হজম করে যেতেন, কোন জবাব দিতেন না। এক ব্যক্তি কটু ভাষায় তাকে গালি দিল। জবাবে তিনি শুধু বললেন, আমি ও আমার ভাই অত্যন্ত উঁচু বংশের। এতটুকু বলে চুপ থাকলেন।

ইবন উমারের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই, তাঁর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল ছিল। হাজার হাজার দিরহাম একই বৈঠকে ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু তার নিজের ঘরের আসবাবপত্রের মোট মূল্য এক শো দিরহামের বেশী ছিল না। মায়মূন ইবন মাহরান বলছেন, 'আমি

ইবন উমারের ঘরে প্রবেশ করে লেপ, তোষক, বিছানাপত্র ইত্যাদির দাম হিসাব করলাম। সব মিলিয়ে একশো দিরহামের বেশী হলো না।' তিনি এমনই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। নিজেরকাজ তিনি নিজ হাতে করতেন। নিজের কাজে অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ তাঁর মনোপুতঃ ছিল না।

হযরত উমারের যুগে যখন সকল সাহাবীর ভাতা নির্ধারিত হয়, তখন ইবন উমারের ভাতা নির্ধারিত হয় আড়াই হাজার দিরহাম। পক্ষান্তরে উসামা ইবন যায়িদের ভাতা নির্ধারিত হয় তিন হাজার দিরহাম। ইবন উমার পিতা উমারের (রা) নিকট এ বৈষম্যের প্রতিবাদ করে বলেন, কোন ক্ষেত্রেই যখন আমি তাঁর থেকে এবং আপনি তাঁর পিতা থেকে পেছনে নেই, তখন এই বৈষম্যের কারণ কি ? উমার (রা) বলেন, সত্যই বলেছো। তবে রাসূল (সা) তাঁর পিতাকে তোমার পিতা থেকে এবং তাঁকে তোমার থেকে বেশী ভালোবাসতেন। জবাব শুনে ইবন উমার (রা) চুপ হয়ে যান।

তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে লিখে প্রকাশ করা যাবে না। জনৈক তাবেঈ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "আমি যদি কোন ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দিতাম যে সে জান্নাতের অধিবাসী, তাহলে অবশ্যই ইবন উমারের জন্য দিতাম।'

আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)

নাম আবদুল্লাহ, আবু মুহাম্মাদ কুনিয়াত। পিতা জাহাশ, মাতা উমায়মা। বিভিন্ন দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক। মা উমায়মা বিনতু আবদিল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু। বোন উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনতু জাহাশ রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী। তাই একাধারে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই ও শ্যালক।

তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে ইতিহাসে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে হিজরী তৃতীয় সনে উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছরের কিছু বেশি। এ তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় রাসূলুল্লাহর (সা) নবুয়াত লাভের চব্বিশ/পঁচিশ বছর পূর্বে তিনি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে তিনি হারব ইবন উমাইয়্যার হালীফ (মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ) ছিলেন। তবে কেউ কেউ বনু আবদি শামসকে তাঁর হালীফ বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ দু'টি বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, হারব ইবন উমাইয়্যা ছিল বনু আবদি শামসেরই একজন সদস্য।

হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন 'সাবেকীন ইলাল ইসলাম' বা প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সা) দারুল আরকামে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের যুলুম-অত্যাচারের হাত থেকে তিনি ও তাঁর গোত্র রেহাই পাননি। এই কারণে দুইবার হাবশায় হিজরাত করেন। শেষের হিজরাতে তাঁর পরিবারের সকল সদস্য অর্থাৎ দুই ভাই আবু আহমদ ও উবায়দুল্লাহ, তিন বোন যয়নাব, উম্মু হাবীবা, হামনা এবং উবায়দুল্লাহর স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফইয়ান তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর ভাই উবায়দুল্লাহ হাবশায় পৌঁছে ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) অবস্থায় সেখানে মারা যায়।

ইসলাম ত্যাগ করায় তার স্ত্রী উম্মু হাবীবা তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যান এবং পরবর্তীকালে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। (আল ইসাবা ২/২৭২) হাবশায় কিছুকাল অবস্থানের পর হযরত আবদুল্লাহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় ফিরে এসে দেখেন তাঁর গোত্র বনু গানাম-এর সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁদের সকলকে সঙ্গে করে মদীনায় হিজরাত করেন। তাঁদের পূর্বে কেবল হযরত আবু সালামা মদীনায় হিজরাত করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তাঁর গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি গোত্রের অবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সঙ্গে করে মদীনায় পৌঁছেন। বনু গানামের একটি লোককেও তিনি মক্কায় ছেড়ে যাননি।

তাঁরা মক্কা থেকে যাত্রা করার কিছুক্ষণ পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যথাঃ উতবা, আবু জাহল প্রমুখ ঘর থেকে বের হয়ে বনু গানামের মহল্লার দিকে যায়। তাদের উদ্দেশ্য, গানাম গোত্রের কে কে গেল, আর কে কে থাকলো এটাই দেখা। তারা দেখলো, গোটা মহল্লা জন-মানবহীন। কোন বাড়ীর দরজা খোলা, আবার কোনটা তালাবদ্ধ। এ অবস্থা দেখে উতবা মন্তব্য করলো 'বনু জাহাশের বাড়ীগুলি তো খা খা করছে, তাদের অধিবাসীদের জন্য মাতম করছে।' একথা শুনে আবু জাহল বলে উঠলোঃ 'কেন, তারা কে যে, তাদের জন্য বাড়ীগুলি মাতম করবে?' তারপর আবু জাহল আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের ঘরে হাত লাগালো। জিনিসপত্র ইচ্ছে মত লুটপাট করলো। গোটা মহল্লার মধ্যে আবদুল্লাহর ঘরটিই ছিল সবচেয়ে সুন্দর ও প্রাচুর্যময়। আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর নিকট তাঁর বাড়ীতে আবু জাহলের লুটপাটের কথা উল্লেখ করলে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আবদুল্লাহ, তুমি কি খুশী নও

যে, এর বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতে তোমাকে একটি বাড়ী দান করবেন।' জবাবে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি তাই লাভ করবে।' আবদুল্লাহ খুশী হলেন।

মদীনা পৌঁছার পর আবদুল্লাহর গোটা খান্দানকে হযরত আসিম ইবন সাবিত আল-আনসারী আশ্রয় দান করেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের দু'জনের মধ্যে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় সনের রজব মাসে রাসূল (সা) আটজন সাহাবীর একটি দলকে নির্বাচন করলেন। এই আট জনের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ও সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাসও ছিলেন। রাসূল (সা) সকলকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যে সর্বাধিক সহনশীল তাঁকেই তোমাদের আমীর বানাবো। অতঃপর আবদুল্লাহকে তিনি আমীর মনোনীত করলেন। এভাবে তিনি মুমিনদের একটি দলের প্রথম আমীর হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রাসূল (সা) তাঁকে যাত্রাপথ নির্দেশ করে তাঁর হাতে একটি সীল মোহর অঙ্কিত চিঠি দিয়ে বললেন, 'দুই দিনের আগে এই চিঠিটি খুলবে না। দুইদিন পথ চলার পর খুলে পড়বে এবং এই চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে।'

হযরত আবদুল্লাহ তাঁর সাথীদের নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। দুইদিন পথ চলার পর নির্দেশ মত চিঠিটি খুলে পড়লেন। চিঠিতে নির্দেশ ছিল, মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে নাখলা নামক স্থানে পৌঁছে কুরাইশদের গতিবিধি ও অন্যান্য অবস্থা অবগত হবে। তিনি অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে এ হুকুম মাথা পেতে নিলেন। সঙ্গীদের সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'বন্ধুগণ, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) এ আদেশ কার্যকরী করে ছাড়বো। তোমাদের মধ্যে যে শাহাদাতের অভিলাষী সে আমার সাথে যেতে পার, এবং যে তা পছন্দ না কর ফিরে যেতে পার। আমি কাউকে বাধ্য করবো না।' এ ভাষণ শুনে সকলে তাঁর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নাখলা পৌঁছে তাঁরা কুরাইশদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলেন। একদিন কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফিলা এই পথ দিয়ে অতিক্রম করছিল। এই কাফিলায় ছিল চার ব্যক্তি। 'আমর ইবনুল হাদরামী, হাকাম ইবন কায়সান, উসমান ইবন আবদিল্লাহ এবং উসমানের ভাই মুগীরা। তাদের সাথে ছিল চামড়া, কিসমিস ইত্যাদি পণ্য সামগ্রী।

কাফিলাটি আক্রমণ করা না করা বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করলেন। সেই দিনটি ছিল হারাম মাসসমূহের সর্বশেষ দিন। উল্লেখ্য যে, জুল কা'দা, জুল হিজ্জা, মুহাররম ও রজব —এ চারটি মাস হচ্ছে হারাম মাস। প্রাচীন কাল থেকে আরবরা এ মাসগুলিতে যুদ্ধবিগ্রহ ও খুন-খারাবী নিষিদ্ধ বলে মনে করতো। তাঁরা ভেবে দেখলেন, একদিকে আজ কাফিলাটি আক্রমণ করলে হারাম মাসে তা করা হবে। অন্যদিকে আজ আক্রমণ না করে আগামীকাল করলে কাফিলাটি মক্কার হারামের আওতায় পৌঁছে যাবে। মক্কার হারাম সকলের জন্য নিরাপদ স্থান। সেখানে তাদের আক্রমণ করলে হারাম কাজ করা হবে। পরামর্শের পর তারা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁরা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে কাফিলার নেতা 'আমর ইবনুল হাদরামীকে হত্যা, উসমান ইবন আবদিল্লাহ ও হাকাম ইবন কায়সানকে বন্দী করেন এবং অন্যজন পালিয়ে যায়। তাঁরা প্রচুর পণ্যসামগ্রী গনীমাত হিসাবে লাভ করেন। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ অর্জিত গনীমাতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য রেখে দিয়ে অবশিষ্ট চার ভাগ তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেন। তখনও গনীমাত বন্টনের কোন নিয়ম-নীতি নির্ধারণ হয়নি। তবে আবদুল্লাহর এই ইজতিহাদ সঠিক হয়েছিল। পরে তাঁর এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কুরআনে 'খুমুস' (পঞ্চমাংশ)-এর আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ গনীমাতের এক পঞ্চমাংশ নিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। রাসূল (সা) তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে 'হারাম' বা নিষিদ্ধ মাসে রক্তপাতের নির্দেশ দিইনি।

আবদুল্লাহর এই দুঃসাহস ও বাড়াবাড়ির জন্য অন্য মুসলিমরাও তাঁর নিন্দা করলেন। কুরাইশরাও এই ঘটনাকে খুব ফলাও করে প্রচার করতে লাগলো। তারা বলে বেড়াতে লাগলো, মুহাম্মাদের (সা) সাহাবীরা হারাম মাসগুলিকে হালাল বানিয়ে নিয়েছে। হত্যা ও রক্ত ঝরিয়ে তারা এই মাসগুলির অবমাননা করেছে। হযরত আবদুল্লাহ ও তাঁর সাথীরা ভীষণ বিপদে পড়লেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অবাধ্যতা হয়েছে এই ভয়ে তাঁরা ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁরা অনুশোচনায় জর্জরিত হতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ

'হারাম (নিষিদ্ধ) মাস সম্পর্কে তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, সে মাসে যুদ্ধ করা কি জায়েয ? আপনি বলে দিন, এই মাসে যুদ্ধ করা বড় ধরনের অপরাধ। আর আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেওয়া, তাঁকে অস্বীকার করা, মসজিদে হারাম (কা'বা) থেকে বিরত রাখা এবং তার অধিবাসীদের সেখান থেকে বিতাড়িত করা আল্লাহর কাছে তার থেকেও বড় অপরাধ। আর ফিতনা বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও খারাপ কাজ।' (আল বাকারাহ-২১৭)

কুরআনের এ আয়াত নাযিলের পর তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মুসলমানরা দলে দলে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন এবং তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাসূল (সা) তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের নিকট থেকে গনীমাতের অংশ গ্রহণ করলেন এবং মুক্তিপণ গ্রহণ করে বন্দী দু'জনকে মুক্তি দিলেন।

প্রকৃতপক্ষে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ও তাঁর সঙ্গীদের এ ঘটনাটি ছিল মুসলমানদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁদের এ গনীমাত ইসলামের প্রথম গনীমাত, তাঁদের হাতে নিহত ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে নিহত প্রথম মুশরিক বা অংশীবাদী, তাঁদের হাতে বন্দীদ্বয় মুসলমানদের হাতে প্রথম বন্দী—তাঁদেরকে দেওয়া পতাকা রাসূলুল্লাহর (সা) তুলে দেওয়া প্রথম পতাকা এবং এই দলটির আমীর আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ প্রথম আমীর যাঁকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশই প্রথম ব্যক্তি যিনি গনীমাতের ব্যাপারে সর্বপ্রথম খুমুসের প্রবর্তন করেন এবং আল্লাহ তা'আলা অহী নাযিল করে তা সমর্থন করেন। (আল-ইসতিয়াব)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াককাস বর্ণনা করছেন, উহুদ যুদ্ধের একদিন আগে আমি ও আবদুল্লাহ দুআ করলাম। আমার ভাষা ছিল, 'হে আল্লাহ, আগামীকাল যে দুশমন আমার সাথে লড়বে সে যেন অত্যন্ত সাহসী ও রাগী হয়। যাতে তোমার রাস্তায় আমি তাঁকে হত্যা করে তার অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিতে পারি।' আমার এ দুআ শুনে আবদুল্লাহ 'আমীন' বলে উঠে। তারপর সে হাত উঠিয়ে দুআ করেঃ হে আল্লাহ, আমাকে এমন প্রতিদ্বন্দ্বী দান কর যে হবে ভীষণ সাহসী ও দ্রুত উত্তেজিত। আমি তোমার রাস্তায় তার সাথে যুদ্ধ করবো। সে আমাকে হত্যা করে আমার নাক কান কেটে ফেলবে। যখন আমি তোমার সাথে মিলিত হব এবং তুমি জিজ্ঞেস করবে, 'আবদুল্লাহ, তোমার নাক-কান কিভাবে কাটা গেল ?' তখন, আমি বলবো, তোমার ও তোমার রাসূলের জন্য।' তিনি যেন দৈব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন, তাঁর এ বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। তাই বার বার কসম খেয়ে বলছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমি তোমার নামে কসম খেয়ে বলছি, আমি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবো এবং সে আমাকে হত্যা করে আমার নাক-কান কেটে আমাকে বিকৃত করবে।' (উসুদুল গাবা)।

হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে উহুদ প্রান্তরে তুমুল লড়াই শুরু হল। হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ এমন তীব্র আক্রমণ চালালেন যে তাঁর তরবারিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে খেজুর শাখার একটি ছড়ি দান করলেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি তা দিয়ে লড়তে থাকেন। এ অবস্থায় আবুল হাকাম ইবন আখনাস সাকাফীর একটি প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর শাহাদাতের বাসনা পূর্ণ

হয়ে যায়। মুশরিকরা তাঁর দেহের বিকৃতি সাধন করে। নাক-কান কেটে সুতায় মালা গাঁথে। হযরত সা'দ এ দৃশ্য দেখে বলে ওঠেনঃ 'আল্লাহর কসম, আবদুল্লাহর দুআ আমার দুআ অপেক্ষা উত্তম ছিল।'

চল্লিশ বছরের কিছু বেশী সময় তিনি জীবন লাভ করেছিলেন। তাঁর মামা সাইয়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযার সাথে একই কবরে তাঁকে দাফন করা হয়।

নাখলা অভিযানে আবদুল্লাহকে আমীর নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় রাসূল (সা) তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেনঃ 'যদিও আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নয় তবে সে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট সবচেয়ে বেশী সহ্য করতে পারে।' আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভালোবাসা তাঁকে দুনিয়ার সব কিছু থেকে উদাসীন করে তোলে। প্রিয় জীবনটি আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র বাসনা। তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। 'আল-মুজাদ্দা' ফিল্লাহ' (আল্লাহর রাস্তায় কানকাটা) এ সম্মানজনক উপাধি তিনি লাভ করেছিলেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকর, 'উমার ও আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের সাথে পরামর্শ করেছিলেন।

(আল-ইসাবা-২/২৮৭)

আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনিল 'আস (রা)

নাম আবদুল্লাহ, কুনিয়াত আবু মুহাম্মাদ, আবু আবদির রহমান ও আবু নুসাইর। তবে প্রথমোক্ত কুনিয়াত দু'টি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পিতা প্রখ্যাত সেনানায়ক ও কূটনীতিবিদ হযরত 'আমর ইবনুল' 'আস (রা) ও মাতা রীতা বিনতু মুনাব্বিহ। বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহর ইসলাম-পূর্ব নাম 'আল-আস' (পাপী, অবাধ্য)। আবু যারয়া তাঁর তারীখে উল্লেখ করেছেন, একটি জানাযার অনুষ্ঠানে রাসূল (সা), তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার নাম কি?' তিনি যখন বললেন, 'আল-আস', রাসূল (সা) তখন বললেন, না, আজ থেকে তোমার নাম হবে 'আবদুল্লাহ।' সেই দিন থেকে 'আল-আস' হলেন আবদুল্লাহ।

ইবন সা'দ বলেন, আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আমর ইবনুল আসের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, পুত্র আবদুল্লাহ অপেক্ষা পিতা আমরের বয়স মাত্র দশ থেকে বারো বছর বেশী ছিল। তবে ওয়াকিদীর মতে পুত্র অপেক্ষা পিতা বিশ বছরের বড় ছিলেন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ, আল-ইসাবা, আল-ইসতিয়াব) পিতা-পুত্র উভয়ে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই মদীনায় হিজরাত করেন। ইসলাম গ্রহণের পর অধিকাংশ সময় আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত বা সাহচর্যে ব্যয় করতেন। ক্রোধ বা শান্ত উভয় অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে যা কিছু বের হতো, তিনি সব কিছু লিখে রাখতেন। কোন কোন সাহাবী এমনটি না করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, উত্তেজিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে যা কিছু বের হয় তা না লেখা উচিত। বিষয়টি তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উত্থাপন করলেন। রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি আমার সব কথা লিখতে পার। সত্য ছাড়া অন্য কিছুই আমি বলতে পারিনে'। (মুসনাদে আহমাদ, আল-ইসতিয়াব) তাঁর পিতা আমর অপেক্ষা রাসূল (সা) তাঁকেই বেশী ভালোবাসতেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাঁর গুরুত্ব ছিল বেশী।

রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত বা সাহচর্যে কাটানোর পর যে অতিরিক্ত সময়টুকু আবদুল্লাহ পেতেন, তার সবটুকু প্রায় দিনে রোযা রেখে এবং রাতে ইবাদাতে কেটে যেত। ধীরে ধীরে এ কাজে তিনি এত গভীরভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন যে, স্ত্রী-পরিজন ও দুনিয়ার সবকিছুর প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর এই অস্বাভাবিক বৈরাগী জীবনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রাসূল (সা) আবদুল্লাহকে ডেকে পিতার আনুগত্যের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ, রোযা রাখ, ইফতার কর, নামায পড়, বিশ্রাম নেও এবং স্ত্রী-পরিজনের হকও আদায় কর। এই আমার তরীকা বা পন্থা। যে আমার তরীকা প্রত্যাখ্যান করবে সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হবে না।'

রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে সংঘটিত সব যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় সাধারণত সোয়ারী পশুর ব্যবস্থা ও জিনিসপত্র পরিবহনের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হতো। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু মুহাম্মাদ, আমরা যেখানে বসবাস করি সেখানে দিরহাম ও দীনারের প্রচলন নেই। গৃহপালিত পশু ও জীব-জন্তু আমাদের প্রধান সম্পদ। আমরা ছাগলের বিনিময়ে উট, গরুর বিনিময়ে ঘোড়া এবং ঘোড়ার বিনিময়ে উট ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি। এতে কোন আপত্তি নেই তো?' তিনি বললেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন একটি উষ্ট্রারোহী বাহিনী গড়ার। আমার কাছে যতগুলি উট ছিল, এক এক করে সবগুলি বিলি করলাম। তবুও সোয়ারী বিহীন কিছু লোক রয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে যতগুলি উট ছিল, সবগুলি বন্টন করার পরও সোয়ারী রিহীন অবস্থায় একদল লোক রয়ে গেছে।' রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন, 'একটি উটের বিনিময়ে সদকার দু'টি, তিনটি করে উট দানের অঙ্গীকার করে কিছু উট খরীদ করে নাও।' আমি সেই মত প্রয়োজনীয় উট সংগ্রহ করে নিলাম। (দারু কুতনী)

ইয়ারমুকের যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি লড়াই করেন। এই যুদ্ধে হযরত 'আমর ইবনুল 'আস তাঁর নেতৃত্বের ঝাণ্ডা আবদুল্লাহর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

সিফ্ফীনে হযরত 'আমর ইবনুল 'আস ছিলেন হযরত মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষে। পুত্র আবদুল্লাহকে তিনি মুয়াবিয়ার বাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে এই গৃহযুদ্ধের প্রতি তিনি ছিলেন ভীষণ বিতৃষ্ণ। এ কারণে মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষে যোগ দিলেও বাস্তবে তিনি যুদ্ধে কোন প্রকার অংশগ্রহণ করেননি। বারবার তিনি পিতাকে এই আত্মঘাতী যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ)

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা) সিফ্ফীনে হযরত আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করে শহীদ হন। আম্মারের শাহাদাত রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণীর কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি পিতা 'আমর ইবনুল 'আসকে (রা) জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহকে (সা) একথা বলতে শুনেননি, 'আফসুস, ইবন সুমাইয়্যা (আম্মার)-কে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে।' একথা শুনে 'আমর ইবনুল 'আস হযরত মুয়াবিয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আবদুল্লাহ যা বলছে, তা-কি আপনি শুনছেন না?' আবদুল্লাহর কথার ব্যাখ্যা করে মুয়াবিয়া (রা) বলেন, 'সে সবসময় নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে আসে। 'আম্মারকে কি আমরা হত্যা করেছি? প্রকৃতপক্ষে তাঁর হত্যার দায়-দায়িত্ব তাদের যারা তাকে ঘর থেকে বের করে এখানে সংগে নিয়ে এসেছে।' (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আম্মারকে (রা) দুই ব্যক্তি একই সাথে আক্রমণ করে হত্যা করে। তারা এককভাবে এ কৃতিত্ব দাবী করে ঝগড়া করতে করতে হযরত মুয়াবিয়ার নিকট হাজির হয়। ঘটনাক্রমে সেখানে হযরত আবদুল্লাহ (রা) উপস্থিত ছিলেন। তাদের ঝগড়া শুনে তিনি বলেন, 'তোমাদের দু'জনের কোন একজনের উচিত সন্তুষ্ট চিত্তে তার প্রতিপক্ষের দাবী মেনে নেওয়া। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, আম্মারকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি হযরত মুয়াবিয়াকে বলেন, 'আম্মারের হত্যাকারীকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিন।' একথা শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রা) বিরক্তি সহকারে তাঁর পিতাকে বলেন, 'আমর, তোমার এই পাগল ছেলেটিকে কি আমার সামনে থেকে দূরে সরিয়ে নেবে না?' তারপর তিনি নিজেই আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, 'যদি এমনই হয়, তাহলে তুমি আমার সাথে কেন?' হযরত আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, 'এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যতদিন বাঁচবে তোমার পিতার অনুগত থাকবে।'

সিফ্ফীনের এই আত্মঘাতী যুদ্ধে যদিও তাঁর হাত কলুষিত হয়নি, তবুও এতে শরীক হওয়ার জন্য আজীবন তিনি অনুশোচনায় জর্জরিত হয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'হায়, আমি যদি এর দশ বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করতাম!' হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করায় এবং তাঁর হাতে ঝাণ্ডা থাকায় সারা জীবন তিনি তাওবাহ ও ইসতিগফার করেছেন। (আল-ইসতিয়াব)

হযরত রাজা' (রা) বলেন ঃ একবার আমি একদল লোকের সাথে মসজিদে নববীতে বসেছিলাম। আবদুল্লাহ ইবন আমর ও আবু সাঈদ খুদরীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ইমাম হুসাইনকে (রা) আসতে দেখে আবদুল্লাহ বলে উঠলেন, 'এই ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কি আপনাদের একটি কথা জানাবো?' লোকেরা বললো, 'কেন জানাবে না?' তিনি বললেন, 'সিফফীনের যুদ্ধের পর থেকে তাঁর সাথে আমার কোন কথা হয়নি। অথচ তাঁর সন্তুষ্টি আমার নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়।' আবু সাঈদ খুদরী বললেন, 'আপনি কি তাঁর কাছে গিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চান?' তিনি

বললেন, 'হাঁ!' পরদিন আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁকে সংগে করে হযরত হুসাইনের (রা) বাড়ী গেলেন। হযরত হুসাইন (রা) সাক্ষাৎ দান করতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করেন। পরে আবদুল্লাহর (রা) পীড়াপীড়িতে সম্মত হন। সিফফীনে তাঁর অংশগ্রহণের পটভূমি ব্যাখা করে তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ অনুযায়ী আমি আমার পিতার আনুগত্য করতে বাধ্য ছিলাম। তবে আল্লাহর কসম! এ যুদ্ধে আমি আমার তরবারি উন্মুক্ত করিনি, নিযা দ্বারা যেমন কাউকে আহত করিনি তেমনি কোন তীরও চালাইনি।' (উসুদুল গাবা)

জ্ঞান ও মান-মর্যাদার দিক দিয়ে সমগ্র সাহাবা সমাজের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহর (রা) বিশেষ স্থান ছিল। মাতৃভাষা আরবী ছাড়াও হিব্রু ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তাওরাত ও ইনজিল তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার একহাতে মধু, অন্য হাতে চর্বি এবং আমি তা চেটে চেটে খাচ্ছি। স্বপ্নের এ কথা আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বললাম। তিনি বললেন, 'তুমি দু'খানা গ্রন্থ তাওরাত ও আল-কুরআন পাঠ করবে'। (আল-ইসাবা)

হাদীসে নববীর যে বিশাল ভাণ্ডার তাঁর কাছে জমা ছিল তার অনুমান করা যায় হযরত আবু হুরাইরার (রা) একটি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। তিনি বলেন, 'আমার থেকেও আবদুল্লাহ ইবন আমরের বেশী হাদীস মুখস্থ ছিল। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে তিনি যা কিছু শুনতেন, লিখে রাখতেন; আর আমি লিখতাম না। (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ, আল-ইসাবা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ নিঃসৃত বাণীর বিরাট একটি অংশ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তাঁর সংগ্রহটির নাম রেখেছিলেন 'সাদেকা'। তাঁর কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে এবং সে সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিতে কিছু না থাকলে উক্ত 'সাদেকা' দেখে উত্তর দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ) এই সংগ্রহটি ছিল তাঁর ভীষণ প্রিয়। মুজাহিদ বলেনঃ একবার আমি তাঁর বিছানার নীচ থেকে একখানা বই বের করে দেখতে লাগলাম। তিনি নিষেধ করলেন। বললাম, 'আপনি তো আমাকে কোন ব্যাপারে নিষেধ করেন না। আজ এমন করছেন কেন?' বললেন, 'এ সত্যের সেই গ্রন্থ যা আমি একাই রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনে সংগ্রহ করেছি'। তিনি আরও বলেন, 'এই গ্রন্থখানি এবং পবিত্র কুরআন ও ওয়াহাজের ঐ জায়গীরটি যদি আমাকে দেওয়া হয় তাহলে দুনিয়ায় আমার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আমর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সাত শত। তারমধ্যে সতেরটি মুত্তাফাক আলাইহি, আটটি বুখারী এবং কুড়িটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। (তাহজীব)

হযরত আবদুল্লাহর (রা) হালকায়ে দারসে-হাদীসের সীমা ছিল সুপ্রশস্ত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ হাদীস শোনার জন্য তাঁর দারসে হাজির হতো। তাছাড়া তিনি যেখানেই যেতেন, জ্ঞান পিপাসুদের বিশাল সমাবেশ ঘটতো তাঁর পাশে। একজন নাখয়ী শায়খ বর্ণনা করেন, 'একবার আমি ইলিয়ার মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করছিলাম। এক ব্যক্তি আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। নামায শেষে চারদিক থেকে মানুষ তাঁর নিকট গুটিয়ে বসলো। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলাম, ইনি আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস।

হযরত আবদুল্লাহ তাঁর ছাত্রদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর সমকালীন জ্ঞানীদের প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। একবার তাঁর সামনে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের (রা) প্রসঙ্গ উঠলো। তিনি বললেন, 'তোমরা এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠিয়েছো যাঁকে আমি সেই দিন থেকে ভালোবাসি যেদিন রাসূল (সা) বলেছিলেন, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন কর এবং সর্বপ্রথম তিনি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের নামটি উচ্চারণ করেছিলেন।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) বহু সংখ্যক সাহাবীর নিকট থেকে, যেমনঃ উমার, আবু দারদা, মুয়াজ, আবদুর রহমান বিন আউফ, তাঁর পিতা 'আমর প্রমুখ— হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু

নুয়াঈম বলেন, 'সাহাবীদের মধ্যে ইবন উমার, আবু উমামা, মিসওয়ার, সায়িব ইবন ইয়াযিদ ও আবুত তুফাইল এবং বহু সংখ্যক বিশিষ্ট তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবা)

তাকওয়া, পরহিযগারী ও অতিরিক্ত ইবাদাতকারী হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমরের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। ইতিহাসে তাঁকে প্রার্থনাকারী, তাওবাকারী, ইবাদাত গুজার, ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর পিতা 'আমর ছিলেন যেমন বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য ও কৌশলীদের গুরু, তেমনি তিনি ছিলেন আবেদ, যাহেদ ও স্পষ্টবাদীদের মধ্যমণি। তাঁর জীবনের সবটুকু সময় ইবাদাতে ব্যয় হয়েছে। যখন যতটুকু কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মুখস্থ করে ফেলেছেন। কুরআনের অবতরণ শেষ হলে তিনিও হলেন সমগ্র কুরআনের হাফেজ। জিহাদের ময়দানে সব সময় তাঁকে প্রথম সারিতে দেখা যেত। আবার সশস্ত্র জিহাদ শেষ হলে তাঁকে দেখা যেত মসজিদে—দিনে রোযাদার এবং রাতে ইবাদাত গুজার। কুরআন ও তাসবীহ তিলাওয়াত অথবা তাওবাহ ইসতিগফারে তিনি নিমগ্ন থাকতেন। মোটকথা, যখন জিহাদের ডাক না থাকতো, চব্বিশ ঘন্টা তিনি সাওম, সালাত ও তিলাওয়াতে ডুবে থাকতেন।

প্রকৃতিগতভাবেই রুহবানিয়্যাত বা বৈরাগ্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক প্রবণতা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) একবার তাঁকে ডেকে বললেন 'আবদুল্লাহ, আমি জানতে পেরেছি, তুমি সারাটি জীবন দিনে রোযা রেখে ও রাতে ইবাদাত করে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য সংকল্প করেছো'। তিনি বললেন, 'হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' রাসূল (সা) বললেন , 'সে শক্তি তোমার নেই। রোযা রাখ, আবার ইফতারও কর এবং নামায পড়, আবার বিশ্রামও কর। মাসে শুধু তিন দিন রোযা রাখ। কারণ, প্রতিটি নেকীর দশগুণ বদলা দেওয়া হয়।' তিনি আরজ করলেন, 'আমি এর থেকেও বেশী শক্তি রাখি'। রাসূল (সা) বললেন, 'একদিন রোযা রাখবে এবং দুইদিন ইফতার করবে'। তিনি আবার আরজ করলেন, 'আমি এর থেকেও বেশী শক্তি রাখি। 'রাসূল (সা) বললেন', একদিন রোযা রাখবে এবং একদিন ইফতার করবে। এটাই হযরত দাউদের (আ) তরীকা এবং এটাই রোযার সর্বোত্তম তরীকা বা পদ্ধতি'। তিনি আবারও আরজ করলেন, 'আমি এর থেকেও উত্তম রোযা রাখতে পারি'। রাসূল (সা) বললেন, 'এর থেকে উত্তম রোযা আর নেই'। অন্য একবার রাসূল (সা) তাঁর বাড়ীতে যেয়ে বলেন, 'তোমার দেহের, তোমার চোখের, তোমার পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের তোমার ওপর হক বা অধিকার আছে'।

সারাটি জীবন তিনি রোযার ক্ষেত্রে দাউদের (আ) অনুসরণ করেন এবং রাতের বেশীর ভাগ সময় ইবাদাতে অতিবাহিত করেন। কুরআন তিলাওয়াতের এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, প্রতি তিন দিনে একবার খতম করতেন। তবে শেষ জীবনে এত অধিক ইবাদাত তাঁর জন্য কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে আফসুস করে বলতেন, 'হায়, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদত্ত 'রুখসত' বা কম করার অনুমতি গ্রহণ করতাম। (আল-ইসাবা)

দুনিয়ার প্রতি আবদুল্লাহর এই উদাসীনতা দেখে তাঁর পিতা 'আমর ইবনুল 'আস প্রায়ই রাসূলুল্লাহর কাছে অভিযোগ করতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহর হাতটি ধরে তাঁর পিতার হাতের মধ্যে দিয়ে বলেন, 'তোমাকে আমি যা বলি তাই কর, এবং তোমার পিতার ইতায়াত বা আনুগত্য কর'। [রিজালুন হাওলার রাসূল (সা)] আবদুল্লাহ আজীবন তাঁর পিতার আনুগত্য করেছেন। পিতার নির্দেশেই তাই তিনি মুয়াবিয়ার পক্ষে সিফফীনে গিয়েছেন।

হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা) পৈত্রিক মীরাস থেকে বিশাল সম্পত্তি ও বহু দাস-দাসী লাভ করেন। তায়েফে 'ওয়াহাজ' নামক যে জায়গীরটি তিনি লাভ করেন তার মূল্য ছিল প্রায় দশ লাখ দিরহাম। (উসুদুল গাবা) তাঁর পক্ষ থেকে সেখানে চাষাবাদ করা হতো। এই জায়গীর নিয়ে একবার আম্বাসা ইবন আবী সুফইয়ানের সাথে বিবাদ দেখা দেয়। উভয় পক্ষে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাওয়ার

উপক্রম হয়। আবদুল্লাহর ভাই হযরত খালিদ ইবনুল 'আস আসলেন তাঁকে বুঝানোর জন্য। তিনি খালিদকে বললেন, 'যে ব্যক্তি তার সম্পদের হিফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে যেয়ে নিহত হবে সে শহীদ—তোমার কি রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী স্মরণ নেই?' (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আব্দুল্লাহর (রা) মৃত্যুর সন ও স্থান সম্পর্কে সীরাত লেখকদের মতভেদ রয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত হয়েছিল সে সম্পর্কেও ঐতিহাসিকরা একমত হতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে যেমন শাম, মক্কা, তায়েফ ও মিসরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি সন হিসাবে ৬৫, ৬৮ ও ৬৯ হিজরীর কথা বলা হয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে তিনি হিজরী ৬৫ সনে 'ফুসতাত' (মিসর) নগরে ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তখন মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই চলছিল, এ কারণে তাঁর লাশ সাধারণ গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁকে তাঁর আবাস স্থলেই দাফন করা হয়। (আল-ইসাবা, তাজকিরাতুল হুফফাজ)

মিকদাদ ইবন 'আমর (রা)

নাম মিকদাদ, কুনিয়াত আবুল আসওয়াদ, আবু 'আমর ও আবু সাঈদ। পিতা 'আমর ইবন সা'লাবা। তাঁর পিতৃ পুরুষের আদি বাসস্থান 'বাহরা'। ইবনুল কালবী বর্ণনা করেন, মিকদাদের পিতা 'আমর তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে 'কিসাস' বা প্রতিশোধের ভয়ে 'হাদরামাউত' পালিয়ে যান এবং কিন্দার সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন। এ কারণে তাঁকে 'কিন্দী' বলা হয়। তিনি হাদরামাউতের এক নারীকে বিয়ে করেন এবং তার গর্ভেই 'মিকদাদ' জন্মগ্রহণ করেন। এই হাদরামাউতেই মিকদাদ বেড়ে ওঠেন। এখানে আবু শাম্মার ইবন হাজার আল কিন্দী নামক এক ব্যক্তির সাথে তাঁর ঝগড়া হয় এবং তরবারির এক আঘাতে তার একটি পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। অতঃপর পালিয়ে মক্কায় চলে যান। মক্কায় তিনি আল-আসওয়াদ ইবন 'আবদ ইয়াগূসের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকেন। আল আসওয়াদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এত মধুর ও ঘনিষ্ঠ হয় যে, মিকদাদকে তিনি পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (আসওয়াদের পুত্র মিকদাদ) নামে পরিচিতি লাভ করেন। অতঃপর পবিত্র কুরআনের 'ওয়াদয়ূহুম লি আবায়িহিম' (তাদেরকে তাদের পিতার নামেই ডাক)— এ আয়াতটি নাযিল হলে তিনি আল-আসওয়াদের পরিবর্তে 'মিকদাদ ইবন আমর' (আমরের পুত্র মিকদাদ)-এ পরিচিতি গ্রহণ করেন। আর এ কারণে ইতিহাসে কোথাও তাঁকে মিকদাদ ইবন আমর আবার কোথাও মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (আল-ইসাবা, উসুদুল গাবা)।

মিকদাদ মক্কায় আশ্রয় নেয়ার পর কিছুদিন যেতে না যেতে তাওহীদের আওয়ায তাঁর কানে প্রবেশ করে। হযরত রাসূলে কারীমের দাওয়াত ও তাবলীগ তাঁকে ইসলামের সাথে প্রথম পরিচয় করে দেয়। এ সেই সময়ের কথা যখন ইসলামের কট্টর দুশমনরা মুসলমানদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছিল। তাদের ভয়ে অনেকেই তখন ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিল। কিন্তু মিকদাদ ইসলাম গ্রহণ করার পর সত্যকে গোপন করে রাখা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি প্রথম পর্যায়ের সাত ব্যক্তির অন্যতম, যারা সেই চরম সন্ত্রাসের মুহূর্তে প্রকাশ্যে নিজেদের ঈমান আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এই সাত জনের অন্য ছয়জন হলেন রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর, 'আম্মার, তাঁর মা সুমাইয়্যা, সুহাইব ও বিলাল (রা)। (হায়াতুস সাহাবা—১/২১৮)।

রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো বোন 'দুবায়া বিনতু যুবাইর ইবন আবদিল মুত্তালিবের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বর্ণিত আছে, একদিন আবদুর রহমান ইবন আউফের সাথে তিনি বসে আছেন। হঠাৎ আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করেন, মিকদাদ তুমি বিয়ে করছো না কেন? মিকদাদ সরলভাবে সাথে সাথে জবাব দেন, তোমার মেয়েকেই আমার সাথে বিয়ে দাও না। এ কথায় আবদুর রহমান অপমান বোধ করেন। তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন এবং মিকদাদকে যথেষ্ট গালমন্দ করেন। মিকদাদ রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। রাসূল (সা) বললেন, আমিই তোমার বিয়ে দেব। অতঃপর তিনি চাচাতো বোন 'দুবায়া'-র সাথে মিকদাদের বিয়ে দেন। (আল-ইসাবা)

প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেয়ার পর মিকদাদের ওপর মুসীবত নেমে আসে। রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে তিনি হাবশায় হিজরাত করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর আবার মক্কায় ফিরে আসেন। তখন মদীনায় হিজরাতের হিড়িক পড়ে গেছে। বিশেষ কিছু অসুবিধার কারণে তিনি

মদীনায় হিজরাত করতে পারলেন না। এমন কি রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পরও তিনি মক্কায় থেকে গেলেন। মক্কা ও মদীনার মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ শুরু হলে তিনি এবং উতবা ইবন গাযওয়ান কুরাইশদের একটি অগ্রবর্তী অনুসন্ধানী দলের সদস্য হিসাবে মদীনার দিকে রওয়ানা হন। এই বাহিনীর নেতা ছিলেন ইকরিমা ইবন আবী-জাহল। পথিমধ্যে মদীনার মুসলিম মুজাহিদদের একটি দলের সাথে তাদের ছোট খাট একটা সংঘর্ষ হয়। এই মুসলিম মুজাহিদ দলের নেতা বা আমীর ছিলেন হযরত উবাইদা ইবনুল হারিস (রা)। সুযোগ বুঝে এ সময় মিকদাদ ও উতবা ইবন গাযওয়ান মুসলিম মুজাহিদ দলে ভিড়ে যান এবং তাদের সাথে মদীনায় পৌঁছেন। মদীনায় তাঁরা হযরত কুলসুম ইবন হিদামের অতিথি হন। (উসুদুল গাবা) মদীনায় তিনি হযরত উবাই ইবন কা'বের (রা) অনুরোধে বনী আদীলা (মতান্তরে জাদীলা)-তে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূল (সা) তাঁকে সেই এলাকায় একখণ্ড জমি দান করেন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে শিরক ও তাওহীদের মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষ সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়। এ বছরই কুরাইশ বাহিনী বদর প্রান্তরে উপনীত হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের জন্য এ ছিল প্রথম পরীক্ষা। রাসূল (সা) এ ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ চেয়ে তাঁদের ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে 'আজম প্রমুখ সাহাবা ভাষণ দিয়ে তাঁদের কুরবানী ও আত্মত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হযরত মিকদাদও এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক আবেগময় ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি রাসূলকে (সা) আশ্বাস দান করে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এগিয়ে চলুন। আপনার সাথে আছি। আল্লাহর কসম, বনী-ইসরাইলরা তাদের নবী মুসাকে বলেছিল ঃ তুমি ও তোমার রব দু'জন যাও এবং যুদ্ধ কর, আর আমরা এখানে বসে থাকি— আমরা আপনাকে তেমন কথা বলবো না। বরং আমরা আপনাকে বলবো ঃ আপনি ও আপনার রব দু'জন যান ও তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরাও আপনাদের সাথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যিনি সত্যসহ আপনাকে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার কসম, আপনি যদি আমাদের 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্ত নিয়ে যান, আমরা আপনার সাথে যাব এবং আপনার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে সর্বদিক থেকে যুদ্ধ করবো— যতক্ষণ না আল্লাহ্ আপনাকে বিজয় দান করেন।" (রিজালুন হাওলার রাসূল) তাঁর এই আবেগময় ভাষণ শুনে খুশীতে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বদর যুদ্ধ শুরু হলো। এ যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে মাত্র তিনজন ছিলেন অশ্বারোহী। মিকদাদ ইবন আমর, মুরছেদ ইবন আবী মুরছেদ ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম। এ তিনজন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন পদাতিক ও উষ্ট্রারোহী। তবে একাধিক বর্ণনা মতে এ যুদ্ধে মিকদাদই ছিলেন একমাত্র অশ্বারোহী মুজাহিদ। এ কারণে বলা হয়েছে, 'মিকদাদই সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় তাঁর ঘোড়া দৌড়িয়েছেন।'

বদর ছাড়াও উহুদ, খন্দকসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। হিজরী ২০ সনে হযরত 'আমর ইবনুল আস মিসর অভিযান পরিচালনা করেন। রাজধানী মদীনায় তিনি অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠান। খলীফা উমার (রা) দশ হাজার সিপাহী ও চারজন অফিসার পাঠান। এই চারজনের একজন মিকদাদ ইবন আমর। খলীফা একটি চিঠিতে আমর ইবনুল আসকে লিখে জানান, 'এই চার জনের প্রত্যেকেই শত্রু পক্ষের দশ হাজার সিপাহীর সমান'। এই সিপাহীদের যোগদানের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র মিসরে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়।

হযরত খুবাইবকে (রা) মক্কার মুশরিকরা শূলে চড়িয়ে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) খুবাইবের লাশ রাতের আঁধারে শূল থেকে নামিয়ে আনার জন্য যুবাইর ও মিকদাদকে পাঠান। তাঁরা খুবাইবের লাশ

শূল থেকে নামিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে যখন রওয়ানা দেন তখন কুরাইশরা টের পেয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। (হায়াতুস সাহাবা)

হযরত মিকদাদের পেটটি ছিল খুবই মোটা। এ কারণে বার্ধক্যে তিনি ভীষণ কষ্ট পেতে থাকেন। এ কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে তাঁর এক রোমান দাস তার পেটে অস্ত্রোপচার করে ; কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় তিনি মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে 'জুরুফ' নামক স্থানে হিজরী ৩৩ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত 'উসমান (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। লাশ মদীনার বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর।

হযরত মিকদাদের মধ্যে সর্বোত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছিল। বদর যুদ্ধের সময় তিনি যে নিষ্ঠা ও সততাপূর্ণ আবেগ প্রকাশ করেন তাতে সমগ্র সাহাবা সমাজ তাঁকে ঈর্ষা করতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলতেন ঃ 'আফসূস! আমি যদি তখন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের উপযুক্ত হতাম এবং মিকদাদের কথাগুলি আমার মুখ থেকে বের হতো'। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, 'বদর যুদ্ধে আমি মিকদাদের সাথে ছিলাম। এ যুদ্ধে তাঁর সাথে থাকার বিষয়টি আমার কাছে এত প্রিয় যে, তার তুলনায় দুনিয়ার সব কিছু একেবারেই মূল্যহীন'। ইসলামের সূচনালগ্নের চরম দারিদ্র ও অভাব তাঁকে অনেকখানি সহনশীল ও বাস্তববাদী করে তুলেছিল। তিনি বলেন, "হিজরাত করে আমি যখন মদীনায় আসলাম, আমার থাকা-খাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। ক্ষুধায় আমার মরণ-দশা হয়েছিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার দু'জন সংগীসহ আমাকে তাঁর আশ্রয়দাতা কুলসুম ইবন হিদামের বাড়ীতে স্থান দেন। তখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মাত্র চারটি ছাগী। আমরা এতগুলি মানুষ এই ছাগীগুলির দুধপান করেই জীবন ধারণ করতাম। একদিন রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বাইরে কোথাও বেরিয়ে গেলেন। ফিরতে দেরী হল। আমি মনে করলাম, হয়তো কোন আনসারী তাঁকে দাওয়াত দিয়েছেন, তিনি খেয়েই ফিরবেন। এই ধারণা আমার মনে উদয় হতেই আমি উঠে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য রাখা দুধটুকু এক চুমুকে পান করে ফেললাম। কিন্তু পরক্ষণেই চেতনা হলো, আমার ধারণা যদি ভুল হয় তাহলে তো ভীষণ লজ্জায় পড়তে হবে। আমার এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে রাসূল (সা) ফিরে আসলেন এবং সোজা দুধ যেখানে থাকে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, পেয়ালা শূন্য। আমি আমার ভুলের জন্য লজ্জা ও অনুশোচনায় জর্জরিত হতে লাগলাম। বিশেষ করে তিনি যখন কিছু বলার জন্য হাত উঠালেন তখন আমার ভয়ের কোন সীমা থাকলো না। আমার ধারণা হল, রাসূলুল্লাহর (সা) বদ দুআয় এখনই আমার ইহ-পরকাল সব বরবাদ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁকে আমি বলতে শুনলাম, 'আল্লাহুম্মা আতয়িমহু মান আতয়ামানী ওয়া আসকি মান সাকানী'— হে আল্লাহ, যে আমাকে আহার করালো তাকে তুমি আহার করাও, যে আমাকে পান করালো তাঁকে তুমি পান করাও। এই দুআ শুনে আমার মধ্যে সাহস সঞ্চার হলো। আমি উঠে ছাগীগুলির কাছে গেলাম, কোন ছাগীর ওলানে কিছু দুধ পাওয়া যায় কিনা এই আশায়। কিন্তু আল্লাহর সীমাহীন কুদরতে যে ছাগীর উলানেই হাত দিই না কেন প্রত্যেকটি দুধে পরিপূর্ণ পেলাম। প্রচুর পরিমাণে দুধ দুইয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে পেশ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সবাই পান করেছ কি? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি প্রথমে পান করুন, তারপর সমস্ত ঘটনা খুলে বলছি। রাসূল (সা) পেট ভরে পান করলেন। আমার পূর্বের ভুল ও অনুশোচনার কথা মনে হওয়ায় হঠাৎ হেসে উঠলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আবুল আসওয়াদ, হাসছো কেন?' আমি সব কথা খুলে বললাম। সব কিছু শুনে তিনি বললেন, "এ ছিল আল্লাহর রহমত। তুমি তোমার সাথী দু'জনকে ঘুম থেকে জাগালে না কেন, তারাও অনুগৃহীত হতো?"

হযরত মিকদাদ ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাঁর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বহু ক্ষেত্রে ও ঘটনায়। তাঁর এক সাথী বর্ণনা করছেন, একদিন আমরা মিকদাদের কাছে বসে

ছিলাম। এমন সময় একজন তাবেয়ী তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, রাসূলুল্লাহর (সা) দর্শন লাভে ধন্য আপনার চোখ দু'টি কতই না সৌভাগ্যের অধিকারী। আল্লাহর কসম, আপনি যা কিছু দেখেছেন, তা দেখার এবং যেসব দৃশ্য ও ঘটনায় আপনি উপস্থিত হয়েছেন তাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি খুবই লালায়িত। একথা শুনে মিকদাদ লোকটির উপর খুবই ক্ষেপে গেলেন। লোকেরা বললো, তা এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে? তিনি বললেন, বর্তমানকে ছেড়ে অতীতকে কামনা করা বৃথা কাজ। কারণ, একথা তার জানা নেই, তখন সে থাকলে তার ভূমিকা কী হতো। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহর (সা) সমসাময়িক বহুলোক ঈমান না আনার কারণে তাদের ঠিকানা হয়েছে জাহান্নাম। সে কি জানে সে কোন দলভুক্ত হতো? এমন বিপদ থেকে আল্লাহ যে তাকে রক্ষা করেছেন এবং তিনি তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি ঈমানদান বানিয়েছেন এজন্য কি সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে না?

রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁকে একটি দলের আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি ফিরে আসলে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন, 'ইমারাত বা নেতৃত্ব কেমন লাগলো?' জবাবে তিনি বড় একটি সত্য কথা বলে ফেলেন। বলেন, 'নিজেকে আমার সবার ওপরে এবং অন্যদের আমার নীচে মনে হয়েছে। যিনি সত্যসহ আপনাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ, আজকের পর আর কক্ষণো আমি দু'ব্যক্তির ওপর আমীর হবো না'। তিনি নিজের দুর্বলতা ঢাকার বা সত্য গোপন করার চেষ্টা করেননি। তিনি সব সময় রাসূলুল্লাহর এ হাদীসটি আওড়াতেনঃ 'ফিতনা থেকে যে ব্যক্তি পরিত্রাণ পেয়েছে, সে প্রকৃত সৌভাগ্যবান।'

রাসূলুল্লাহকে (সা) তিনি নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। তাঁর মধ্যে ছিল আল্লাহর রাসূলের (সা) হিফাজত বা নিরাপত্তার চরম দায়িত্বানুভূতি। মদীনায় কোন প্রকার হৈ চৈ দেখা গেলেই রাসূলুল্লাহর (সা) বাসগৃহের দরজায় তাঁকে সশস্ত্র ও অশ্বারোহী অবস্থায় দেখা যেত। ইসলামের বিধি-বিধান যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। ইসলামের প্রকাশ্য দুশমনদের বিরুদ্ধে যেমন ছিলেন সজাগ, তেমনি ছিলেন নিজের বন্ধুদের ইসলাম সম্পর্কে সামান্য উদাসীনতা ও ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে দারুণ সচেতন। একবার তিনি একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর সাথে অভিযানে বের হলেন। শত্রু বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে। বাহিনীর আমীর নির্দেশ দিলেন, বাহিনীর কোন সদস্যই আজ তাঁর সোয়ারী— পশু চড়ানোর জন্য ছাড়বে না। কিন্তু একজন মুজাহিদ বিষয়টি অবহিত ছিলেন না। তিনি আমীরের আদেশের বিপরীত কাজ করেন। এ জন্য তিনি আমীরের নিকট থেকে তাঁর প্রাপ্য শাস্তি থেকেও অধিক শাস্তি লাভ করেন। মুজাহিদটি কাঁদছিল, এমন সময় মিকদাদ তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করে বিষয়টি অবগত হলেন। অতঃপর তাঁর ডান হাতটি ধরে তাঁকে আমীরের কাছে টেনে নিয়ে গেলেন এবং আমীরের সাথে তর্ক করে তাঁর ভুল স্বীকার করতে বাধ্য করেন। আমীরকে তিনি বলেন, লোকটিকে কিসাস গ্রহণের সুযোগ দিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করুন। মিকদাদের কথা আমীর মাথা পেতে নিলেন। অবশ্য লোকটি আমীরকে ক্ষমা করে দেন। এভাবে তিনি দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় সর্বদা অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতেন। তিনি প্রায় সব সময় বলতেন, 'ইসলামকে বিজয়ী দেখেই আমি মরতে চাই।' রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে ভালোবাসতে এবং আমাকে এ খবরও দিয়েছেন যে, তিনি তোমাকে ভালোবাসেন।' এভাবে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা লাভে ধন্য হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীকে সাতজন বিশ্বস্ত সাথী ও উযীর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাকে দেওয়া হয়েছে চৌদ্দ জন। তারা হলেনঃ হামযা, জাফর, আবু বকর, উমার, আলী, হাসান, হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, সালমান, আম্মার, হুজাইফা, আবু জাফর, মিকদাদ ও বিলাল।

তোষামোদ বা প্রশংসা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার হযরত উসমানের (রা) দরবারে কিছু লোক মিকদাদের সামনেই তাঁর প্রশংসা শুরু করে দিল। তিনি এত রুষ্ট হলেন যে, তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারলেন। হযরত উসমান (রা) বলে উঠলেন, মিকদাদ, এ কী হচ্ছে? বললেন, রাসূলুল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা প্রশংসাকারীর মুখে মাটি ছুঁড়ে মার।'

ব্যবসা ছিল তাঁর আসল পেশা। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে খাইবার অঞ্চলে কিছু ভূমি দান করেন। পরবর্তীকালে মিকদাদের ওয়ারিসদের নিকট থেকে এক লাখ দিরহামের বিনিময়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা) তা খরীদ করে নেন।

হযরত মিকদাদের স্ত্রী দুবায়া বর্ণনা করেন, একবার মিকদাদ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বাকী'র একটি নির্জন স্থানে যান। তিনি কর্ম সমাধা করছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন একটি ইঁদুর তার গর্ত থেকে একটি দীনার বের করে আনছে। এভাবে ইঁদুরটি মোট সতেরটি দীনার বের করে আনে। তিনি সেগুলি কুড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে এসে ঘটনা খুলে বলেন। তিনি গর্তে হাত ঢুকিয়েছেন কিনা রাসূল (সা) তা জানতে চান। তিনি যখন বললেন, না, তিনি হাত ঢুকাননি, তখন রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ তোমার এ সম্পদে বরকত দিন। তোমার এ সম্পদের উপর কোন যাকাত নেই। (হায়াতুস সাহবা—৩/৬৪৫)

হযরত মিকদাদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আলী, আনাস, উবাইদুল্লাহ ইবন আদী, হাম্মাম ইবনুল হারস, আবদুর রহমান ইবন আবী লাইলা প্রমুখ সাহাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

'আমর ইবনুল 'আস (রা)

'আমর নাম, আবু আবদিল্লাহ ও আবু মহাম্মাদ কুনিয়াত। পিতা 'আস ও মাতা নাবিগা। তাঁর বংশের উর্ধপুরুষ কা'ব ইবন লুই-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে।

জাহিলী যুগেই 'আমর ইবনুল 'আসের খান্দান—'বনু সাহম' সম্ভ্রান্ত খান্দান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। কুরাইশদের ঝগড়া-বিবাদের সালিশ-মিমাংসার দায়িত্ব এই খান্দানের ওপর অর্পিত হত। তাঁর জন্ম ও শৈশবকাল সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন কট্টর ইসলাম-দুশমন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে একাত্ম হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতায় তাঁর ছিল দারুণ উৎসাহ।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহর (সা) চরম শত্রু কুরাইশদের তিন প্রধান পুরুষের একজন ছিলেন তিনি। যাদের বিরুদ্ধে শেকায়েত করে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন এবং আল্লাহ তার জবাবে এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "লাইসা লাকা মিনাল আমরে শাইয়্যুন, আও ইয়াতুবা আলাইহিম আও ইউ 'আজ্জিবাহুম, ফাইন্নাহুম যালিমুন।" (আলে 'ইমরান-১২৮)—"কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অধিকার তোমার নেই। আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হয়ে ক্ষমা করে দিতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। কারণ, তারা যালিম—অত্যাচারী।" রাসূলুল্লাহ (সা) বুঝতে পারলেন তাদের ওপর বদদু'আ করতে নিষেধ করা হচ্ছে। তিনি বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেন। এই তিন জনের একজন হলেন পরবর্তীকালে ইসলামের মহা সেনা নায়ক, আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধূর্ত কূটনীতিক, মিসরবাসীর মুক্তি দাতা হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা)। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৬১৪)

মুসলমানদের যে প্রথম দলটি হাবশায় হিজরাত করেছিল, তাদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার জন্য কুরাইশদের যে প্রতিনিধি দলটি হাবশায় যায়, তার সবচেয়ে উৎসাহী সদস্য ছিলেন এই আমর ইবনুল আস। তিনি হাবশায় রাজা ও রাজদরবারের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে কথা বলেন এবং মুসলমানদের হাবশা থেকে বহিষ্কারের ব্যাপারে তাদেরকে স্বমতে আনার সব রকম চেষ্টা চালান। বাদশার দরবারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগের অভিযোগ উত্থাপন করে জ্বালাময়ী ভাষণও দেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

খন্দকের যুদ্ধে আরব উপদ্বীপের প্রায় সকল গ্রোত্র কুরাইশদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে মুসলমানদের সমূলে বিনাশ করার জন্য মদীনার উপকণ্ঠে হাজির হয়। এখানেও 'আমর ছিলেন কুরাইশ পক্ষের এক প্রধান পুরুষ। খন্দকের পর কোথা থেকে কি যেন ঘটে গেল। এমন যে গোঁড়া ইসলাম-দুশমন তার মধ্যেও ভাবান্তর সৃষ্টি হল। ইসলামের দাওয়াত ও বাণী সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি নিজেই বলছেন, "এই চিন্তা-ভাবনার ফলে ইসলামের মূলকথা ধীরে ধীরে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আস্তে আস্তে আমি মুসলমানদের বিরোধিতা থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। কুরাইশ নেতারা তা বুঝতে পেরে আমার কাছে একজন লোক পাঠালো। সে আমার সাথে তর্ক শুরু করলো। আমি তাকে বললাম, 'বলতো, সত্যের ওপর আমরা, না পারসিক ও রোমানরা?' সে বললো, 'আমরা', জিজ্ঞেস করলাম, 'সুখ-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী তারা, না আমরা?' সে বললো, তারা। আমি বললাম, 'এ জীবনের পরে যদি আর কোন জীবন না থাকে তাহলে আমাদের এ সত্যাশ্রয়ী জীবন কী কাজে আসবে? এ দুনিয়াতেই আমরা মিথ্যাশ্রয়ীদের তুলনায় দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আছি,

আর পরলোকেও আমাদের পুরস্কার লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। এ কারণে মুহাম্মাদের (সা) এ শিক্ষা— মরনের পর আর একটি জগত হবে, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের ফল লাভ করবে— অত্যন্ত সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।" খন্দকের পর তার মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সাফল্য সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, বিজয়ী হওয়ার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে। এ বিশ্বাসই তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে।

তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ থেকে মক্কায় ফিরে আমি আমার নিকটতম আত্মীয় বন্ধুদের ডেকে বললাম, তোমরা জেনে রাখ মুহাম্মাদের কথা সকল কথার ওপর বিজয়ী হবে—এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমার একটি সুচিন্তিত মতামত আছে, বিষয়টি তোমরা কিভাবে নেবে তা আমি জানতে চাই। তিনি বললেন, চলো আমরা নাজাশীর কাছে গিয়ে অবস্থান করতে থাকি। মুহাম্মাদ যদি আমাদের ওপর বিজয়ী হয় আমরা নাজাশীর কাছেই থেকে যাব। আর যদি আমাদের কাওম বিজয়ী হয় তাহলে তো আমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। সে ক্ষেত্রে আমাদের সাথে নাজাশীর আচরণ উত্তমই হবে। আমার এ মতামত সকলে মেনে নিল। অতঃপর আমরা নাজাশীর জন্য কি উপহার নিয়ে যাওয়া যায় তা আলোচনা করলাম। উপহার দেওয়ার মত সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু ছিল আমাদের এখানকার চামড়া। আমরা বেশ কিছু চামড়া নিয়ে হাবশায় পৌছলাম।

আমরা নাজাশীর দরবারে যাচ্ছি, এমন সময় 'আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামারীও সেখানে পৌছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষ কোন প্রয়োজনে তাঁকে মদীনা থেকে হযরত জাফর ইবন আবী তালিবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। জাফর ইবন আবী তালিব তখনও হাবশায় অবস্থান করছিলেন। কিছুক্ষণ পর আমর নাজাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা নাজাশীকে অনুরোধ করবো আমরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য। আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে যদি তিনি আমরকে আমাদের হাতে তুলে দেন, আমরা তাকে হত্যা করবো। এতে কুরাইশরা বুঝবে আমরা মুহাম্মাদের দূতকে হত্যা করে বদলা নিয়েছি। এ সিদ্ধান্তের পর আমি নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হলাম। নিয়ম মাফিক তাঁকে কুর্নিশ করে আমাদের উপহার সামগ্রী তাঁর সামনে পেশ করলাম। উপহারগুলি তাঁর খুবই মনোপূত হল।

অতঃপর আমি আরজ করলাম, এখনই যে ব্যক্তি আপনার দরবার থেকে বেরিয়ে গেল সে আমাদের ঘোরতর শত্রুর দূত। আপনি যদি তাকে আমাদের হাতে তুলে দেন, আমরা তাকে হত্যা করবো। আমার এ আবেদনে নাজাশী ক্রোধে ফেটে পড়লেন। অবস্থা বেগতিক দেখে বিনীতভাবে বললাম, আমার এ আবেদন আপনাকে এতখানি উত্তেজিত করবে জানতে পেলে আমি এ আবেদন জানাতাম না। নাজাশী বললেন, তুমি কি চাও, যে ব্যক্তির কাছে আসেন 'নামুসে আকবর' যিনি মূসার (আ) কাছেও এসেছেন, তাঁর দূতকে আমি হত্যার জন্য তোমাদের হাতে তুলে দিই? আমি বললাম, সত্যিই কি তিনি এমন ব্যক্তি? তিনি বললেন, 'আমর, তোমাদের অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক। আমার কথা শোন, তোমরা তাঁর আনুগত্য কর। আল্লাহর কসম, তিনিই সত্যপন্থী। তিনি তাঁর বিরোধীদের ওপর বিজয়ী হবেন, যেমন হয়েছিলেন মূসা ফিরআউন ও তার লোক লস্করদের ওপর। আমি বললাম, আপনি তাহলে তার পক্ষে আমার বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ নিন। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি প্রথম তাঁর হাতে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করলাম। আমার সাথীদের কাছে আমি ফিরে গেলাম; কিন্তু তখন আমার চিন্তাধারায় একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। আমি তাদের কাছে কিছুই প্রকাশ করলাম না।

আমি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াতের উদ্দেশ্যে হাবশা থেকে রওয়ানা হলাম। পথে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সাথে দেখা। তিনিও মক্কা থেকে মদীনার দিকে যাচ্ছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু সুলাইমান, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, মারাত্মক পরীক্ষার

সম্মুখীন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এ ব্যক্তি নবী। এখন খুব তাড়াতাড়ি ইসলাম কবুল করা উচিত। এই দ্বিধা-সংশয় আর কত দিন! বললাম, আমিওতো এই উদ্দেশ্যে চলেছি। অতঃপর আমরা দু'জন এক সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলাম। আমাদের দু'জনকে দেখেই রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'লাকাদ রামাতকুম মাক্কাহ্ বিফালাজাতি আকবাদিহা—মক্কা তার ক লিজার সুতীক্ষ্ণ বা মূল্যবান অংশসমূহ তোমাদের প্রতি ছুড়ে মেরেছে।' (রিজালুন হাওলার রাসূল)

প্রথমে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত হন। তারপর আমি একটু নিকটে এসে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও বাইয়াত হবো। তবে আমার পূর্বের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিতে হবে। তিনি বললেন, 'আমর, বাইয়াত কর। ইসলাম পূর্বের সকল পাপ মুছে দেয়, হিজরাতও পূর্বের সকল অপরাধ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আমি রাসূলুল্লাহর হাতে বাইয়াত করে ফিরে গেলাম। এটা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে খাইবার বিজয়ের বছর, মতান্তরে অষ্টম হিজরীর সফর মাসে মক্কা বিজয়ের ছয় মাস পূর্বের ঘটনা। (সীরাতু ইবন হিশাম, ২য়, ২৭৬-২৭৮, আল-ফাতহুর রাব্বানী খণ্ড-২২, মুসনাদে ইমাম আহমাদ, হায়াতুস সাহাবা-১/১৫৭-৬০)

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মক্কায় ফিরে যান। কিছুদিন মক্কায় অবস্থানের পর আবার মদীনায় হিজরাত করেন। আমর ইবনুল আস ছিলেন ইসলাম ও কুফর উভয় অবস্থায় চরমপন্থী। পূর্বে যেমন ইসলামের মূলোৎপাটনে ছিলেন বদ্ধপরিকর তেমনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পর কুফর ও শিরকের ব্যাপারেও। তিনি বলেন, "আমার কাফির অবস্থায় আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে বড় দুশমন। তখন মারা গেলে জাহান্নামই হত আমার ঠিকানা। আর মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও আমার চোখের আড়াল হতে পারতেন না।" তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরও একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু তাঁর অংশ গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায় না। তবে একাধিক ক্ষুদ্র অভিযান যে তার নেতৃত্বে পরিচালিত হয় সেকথা ইতিহাসে জানা যায়।

ইবন সাদ বলেন, মক্কা বিজয়ের পর বনু কাদা'আর কিছু লোক সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করে। রাসূল (সা) তিন শ' মুজাহিদের একটি বাহিনী আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে পাঠান। ইবন আসীর বলেন, 'আমর রাসূলুল্লাহর নিকট আরো সৈন্য চেয়ে পাঠান। রাসূল (সা) মদীনা থেকে তাঁর সাহায্যের জন্য দুশ' মুজাহিদের একটি বাহিনী আবু উবাইদার নেতৃত্বে পাঠান। এই দলে আবু বকর, উমার প্রমুখের মত বিশিষ্ট সাহাবীও ছিলেন। তাঁরা সকলে 'আমর ইবনুল 'আসের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে শত্রুদের পরাজিত করেন। ইতিহাসে এ অভিযান 'গাযওয়া জাতুস সালাসিল' নামে পরিচিত।

আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ গোত্র মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করে। কোন কোন গোত্র ইসলাম কবুল করলেও যুগ যুগ ধরে লালিত কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। মূর্তি ও মূর্তি উপাসনার কেন্দ্র ভেংগে ফেলতে ভয় পাচ্ছিল। তাই রাসূল (সা) এসব মূর্তি ভাংগার জন্য কয়েকটি বাহিনী বিভিন্ন দিকে পাঠান। যাতে নও মুসলিমদের অন্তর থেকে মূর্তির প্রতি তাদের অমূলক ভয় ও ভক্তি দূর হয়ে যায়। বনু হুজাইলের এমনি একটি মূর্তিপূজার কেন্দ্রের নাম ছিল 'সু'আ'। এই কেন্দ্রটির কাছে পৌঁছলে স্থানীয় লোকেরা তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরে বললো, আপনি এই কেন্দ্র ধ্বংস করতে পারবেন না। তার আত্মরক্ষা সে নিজেই করবে। আমর বললেন, তোমরা এখনও এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারে হাবুডুবু খাচ্ছ? যার দেখা ও শোনার ক্ষমতা নেই সে কিভাবে আত্মরক্ষা করবে? তারপর তিনি কেন্দ্রটি নিশ্চিহ্ন করে দেন। এ দৃশ্য দেখে স্থানীয় জনসাধারণের ঈমান মজবুত হয়ে যায়।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) আরব উপদ্বীপের আশে-পাশের রাজা-বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করে চিঠি লেখেন। 'আমর ইবনুল 'আস 'উমানের শাসকের নিকট লিখিত রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠিটি নিয়ে যান। 'উমানের শাসক চিঠি পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) 'আমরকে 'উমানের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহর ওফাত পর্যন্ত 'আমর উমানেই অবস্থান করেন। (ফুতুহুল বুলদান)

হযরত আবু বকরের (রা) খলীফা হওয়ার পর আরব উপদ্বীপে ভণ্ড নবী ও যাকাত অস্বীকারকারীদের ফিতনা ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। 'আমর ইবনুল 'আস তখন 'উমানেই। খলীফার নির্দেশে তিনি 'উমান থেকে বাহরাইনের পথে অগ্রসর হন। পথে বনি আমেরের নেতা 'কুররাহ বিন হুবায়রার অতিথি হন। কুররাহ তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করেন। বিদায়ের সময় তিনি 'আমরকে বলেন, যদি যাকাত আদায় করা হয় তাহলে আরববাসী কারও ইমারাত বা নেতৃত্ব মেনে নেবে না। যাকাত আদায় স্থগিত হলে তারা অনুগত ও বাধ্য থাকবে। এ কারণে যাকাত রহিত করা উচিত।

আমর বললেন, কুররাহ, তুমি কি ইসলাম ত্যাগ করেছ? আমাকে আরববাসীর ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম, এমন লোকদের আমি ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলবো। পরবর্তীকালে কুররাহ অন্য বিদ্রোহীদের সাথে বন্দী হয়ে মদীনায় আসেন এবং 'আমর তাঁকে মুক্ত করেন। উমান থেকে আমর মদীনায় পৌঁছলে খালীফা আবুবকর (রা) তাঁকে বনু কাদা'আর বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠান। তাঁর চেষ্টায় বনু কাদা'আহ আবার ইসলামে ফিরে আসে। বিদ্রোহ দমিত হলে তিনি আবার উমানে ফিরে যান।

খলীফা হযরত আবু বকর (রা) হিজরী ১৩ সনে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী পাঠান। তিনি 'আমরকে লিখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে উমানের ওয়ালী নিয়োগ করেছিলেন, তাই তোমাকে আমি দ্বিতীয়বার সেখানে পাঠিয়েছিলাম। এখন তোমার ওপর আমি এমন দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই যা তোমার ইহ-পরকালের জন্য কল্যাণকর হবে। জবাবে আমর লিখলেন, আমি তো আল্লাহর একটি তীর। আর আপনি একজন দক্ষ তীরন্দায। যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে এ তীর নিক্ষেপ করার অধিকার আপনার আছে। খলীফা তাঁকে উমান থেকে সরিয়ে ফিলিস্তীন সেক্টারে নিয়োগ করেন।

মুসলিম বাহিনী চতুর্দিক থেকে সিরিয়ায় অভিযান চালালো। রোমান সম্রাট মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী পাঠালো। ভিন্ন ভিন্ন রোমান বাহিনী অবেশেষে আজনাদাইনে সমবেত হয়। আমর ইবনুল আস ফিলিস্তীন থেকে আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হলেন। এদিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আবু উবায়দা বসরা অভিযান শেষ করে আমরের সাহায্যের জন্য আজনাদাইনে পৌঁছলেন। হিজরী ১৩ সনে মুসলিম ও রোমান বাহিনীর মধ্যে এই আজনাদাইনে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। রোমান সেনাপতি নিহত হয় এবং তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। আজনাদাইনে রোমান সেনাপতি একজন আরব গুপ্তচরকে মুসলিম বাহিনীর খবর সংগ্রহের জন্য পাঠায়। সে মুসলিম সেনা ছাউনী ঘুরে ফিরে দেখে যাওয়ার পর রোমান সেনাপতি তাকে জিজ্ঞেস করে, কি খবর নিয়ে এলে? সে সত্য কথাটিই প্রকাশ করে দেয়। সে বলেঃ এই লোকগুলি ইবাদাতের মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করে এবং দিনে রণক্ষেত্রে ঘোড় সওয়ার। তাদের শাহজাদাও যদি কোন অপরাধ করে, তারও ওপর শরীয়াতের বিধান কার্যকর করা হয়। এ কথা শুনে সেনাপতি মন্তব্য করে, সত্যিই যদি তারা এমন গুণাবলীর অধিকারীহয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে মাটিতে পুঁতে যাওয়া অধিক শ্রেয়।

দিমাশ্‌ক অভিযানেও আমর তাঁর দুই সংগী খালিদ ও আবু উবাইদার সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং দিমাশকের 'তুমা' ফটক অবরোধের দায়িত্ব পালন করেন। দিমাশকের পর 'ফাহল' অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানেও তিনি মুসলিম বাহিনীর একটি অংশের সফল নেতৃত্ব দান করেন।

মুসলিম বাহিনীর ধারাবাহিক আক্রমণে রোমান বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে থাকে। অবশেষে রোমান সম্রাটের নির্দেশে বিপর্যস্ত রোমান বাহিনী নতুন ভাবে সংগঠিত হয়ে দু'লাখ সদস্যের এক বিশাল বাহিনীতে পরিণত হয় এবং মুসলিম বাহিনীকে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিরোধের জন্য 'ইয়ারমুক' নামক স্থানে সমবেত হয়। খালিদ, 'আমর ও শুরাহবীল ইবন হাসানার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীও ইয়ারমুকে উপস্থিত হয়। তবে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী অপেক্ষা রোমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা চারগুণ বেশী ছিল। ইয়ারমুকের এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে 'আমর ইবনুল 'আস অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করেন। রোমান বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। সমগ্র সিরিয়ায় ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত হয়।

ইয়ারমুকের পূর্বেই 'আমর ইবনুল 'আস ফিলিস্তীনের কিছু অঞ্চলের বিজয় অভিযান শেষ করেছিলেন। এখন ইয়ারমুকের পর তিনি ফিলিস্তীনের সবচেয়ে বড় শহর 'ঈলিয়া' বা বাইতুল মাকদাস অভিযানে মনোযোগী হন। তিনি বাইতুল মাকদাস অবরোধ করেন। আবু উবাইদাও তাঁকে সাহায্য করেন। কোন রকম রক্তক্ষয় ছাড়াই তিনি বাইতুল মাকদাস জয় করেন। ঈলিয়াবাসীদের দাবী অনুযায়ী খালীফা উমার(রা) মদীনা থেকে বাইতুল মাকদাস উপস্থিত হন এবং তাদের সাথে এক ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন। এভাবে এই প্রথমবারের মত এই গৌরবময় শহরটি মুসলমানদের অধিকারে আসে।

বাইতুল মাকদাস বিজয়ের বছরই সমগ্র সিরিয়া,ইরাক ও মিসরে মহামারি আকারে তাউন বা প্লেগ দেখা দেয়। হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়। আমর ইবনুল আস সেনাপতি আবু উবাইদাকে সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে কোন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাকদীরে গভীর বিশ্বাসী আবু উবাইদা সে পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর জীবনও শেষ পর্যন্ত প্লেগ কেড়ে নেয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'আমরকে সেনাপতি নিয়োগ করে যান। 'আমর ইবনুল 'আস প্লেগ আক্রান্ত স্থান থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেন।

সিরিয়া বিজয় সমাপ্তির পর 'আমর মিসরে অভিযান পরিচালনার জন্য খলীফা উমারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। জাহিলী যুগে ব্যবসা উপলক্ষে আমর মিসরে আসা যাওয়া করতেন। এ কারণে মিসর সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ছিল। খলীফা প্রথমতঃ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করতে ইতস্ততঃ করলেও শেষ পর্যন্ত অনুমতি দান করেন। আমর তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মিসর রওয়ানা হলে খালীফা উমার তাঁকে সাহায্যের জন্য যুবাইর ইবনুল আওয়ামের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠান।

হযরত 'আমর ইবনুল আস বাবুল ইউন, 'আরীশ, 'আইনু শামস বা ফুসতাত প্রভৃতি যুদ্ধে একের পর এক জয়লাভ করেন। অতঃপর তিনি ইসকান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য খলীফা 'উমারের অনুমতি চেয়ে পাঠান। অনুমতি লাভ করে বিজিত অঞ্চলের দায়িত্ব হযরত খারিজা ইবন হুজাফার ওপর ন্যস্ত করে তিনি ইসকান্দারিয়া অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। তিনি ইস্কান্দারিয়া অবরোধ করলেন। মাকুকাসের বাহিনী এবং শহরবাসী সুরক্ষিত কিল্লায় আশ্রয় নিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলো। তারা মাঝে মাঝে কিল্লার বাইরে এসে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে আবার কিল্লায় ফিরে যেত। এ অবস্থায় প্রায় দু'বছর কেটে গেল। খলীফা উমার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি 'আমরকে লিখলেন, তোমরা দু'বছর ধরে অবরোধ করে বসে আছ। এখনও কোন ফলাফল প্রকাশ পেল না। মনে হচ্ছে, রোমানদের মত তোরাও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে বসেছো। আমার এ চিঠি তোমার হাতে যখন পৌঁছবে তখনই লোকদের ডেকে তাদের সামনে জিহাদ সম্পর্কে ভাষণ

দেবে এবং আমার এ চিঠি তাদের পাঠ করে শুনাবে। তারপর জুম'আর দিনে শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাবে।

খলীফার নির্দেশমত তিনি শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালান এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইস্কান্দারিয়া মুসলিম বাহিনীর অধিকারে আসে। খলীফাকে এ বিজয়ের খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুয়াবিয়া ইবন খাদীজকে মদীনায় পাঠান। মুয়াবিয়া যখন মদীনায় পৌঁছেন তখন অপরাহ্ন। তিনি সোজা মসজিদে নববীতে চলে যান। খলীফা খবর পেয়ে সাথে সাথে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি আমার বাড়ীতে না এসে সোজা মসজিদে গেলে কেন? মুয়াবিয়া বললেন, আমি ধারণা করেছিলাম, এখন আপনার বিশ্রামের সময়। খলীফা বললেন, আমি দিনে ঘুমিয়ে প্রজাদের ধ্বংস করতে পারি?

ইসকান্দারিয়া বিজয়ের পর তিনি বারকা, যুওয়াইলা, তারাবিলস আল-মাগরিব, সাবরা প্রভৃতি অঞ্চল একের পর এক জয় করেন। তারাবিলস বিজয়ের পর তিনি দূত মারফত খলীফাকে সুসংবাদ পাঠান। তিউনিসিয়া, মরক্কো, আলজিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল সেখান থেকে মাত্র নয় দিনের দূরত্বে। তিনি খলীফার নিকট এ সকল অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার অনুমতি চাইলেন। বিজিত অঞ্চলের শান্তি-শৃংখলার কথা চিন্তা করে খলীফা পশ্চিম আফ্রিকার অভিযান স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন। 'আমর ইবনুল 'আসের আফ্রিকা অভিযান এখানেই থেমে গেল।

মিসর বিজয় শেষ হওয়ার পর খলীফা 'উমার (রা) তাঁকে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেন। এর অল্প কিছু দিন পর হযরত উমার শহীদ হন। খলীফা 'উসমানও আমরকে তাঁর পূর্ব পদে বহাল রাখেন। এই সময় রোমের উস্কানীতে ইসকান্দারিয়াবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আমর ইবনুল আস অত্যন্ত কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করেন এবং ভবিষ্যতে বিদ্রোহের আশংকায় ইসকান্দারিয়া শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেন।

হিজরী ২৬ সনে হযরত উসমান (রা) তাঁকে মিসরের ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করেন। তাবারী বলেন, কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া খলীফা উসমান কাকেও অপসারণ করতেন না। তাঁর অপসারণের কারণ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, মিসর অত্যন্ত উর্বর দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরের সময়ে আশানুরূপ রাজস্ব আদায় হতো না। হযরত উমারের যুগ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিল। এ বিষয়ে খলীফা উমার (রা) তাঁকে একটি পত্রও লিখেছিলেন। হযরত উসমানের সময়ও তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিল। হযরত উসমান (রা) এ ব্যাপারে তাঁকে একটি পত্র লিখেন। আমর জবাব দেনঃ 'গাভী এর থেকে বেশী দুধ দিতে সক্ষম নয়।' এই জবাবের পর হযরত উসমান (রা) রাজস্বের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে তা 'আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের হাতে ন্যস্ত করেন। এই ঘটনার পর থেকে আমর ও আবদুল্লাহর মধ্যে মত বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং মিসরের শাসন ব্যবস্থা অনেকটা অচল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা) আমরকে অপসারণ করে আবদুল্লাহকে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেন। (তাবারী, ইবনুল আসীর) অন্য একটি বর্ণনা মতে ইসকান্দারিয়ার বিদ্রোহের পূর্বেই আমরকে অপসারণ করা হয়। বিদ্রোহ দেখা দিলে খলীফা উসমান তাঁকে বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করেন। বিদ্রোহ নির্মূলের পর খলীফা তাঁকে কেবল প্রতিরক্ষা বিষয়ক দায়িত্বে নিয়োগ করতে চান। তিনি খলীফার এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেন, "আমি শিং ধরবো, আর সে দুধ দুইবে" এমন হতে পারে না। এই বর্ণনা মতে হিজরী ২৫ সনে তাঁকে অপসারণ করা হয়।

হযরত আমর ইবনুল আস মিসর থেকে অপসারিত হয়ে মদীনায় চলে আসেন। হযরত উসমানের ওপর কিছুটা অসন্তুষ্ট হন। মদীনায় আসার পর খলীফার সাথে তাঁর কথোপকথন হয় এবং তাতে এ অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে ওঠে।খলীফার সাথে যখন তাঁর কথা হয়, তখন মিসর থেকে প্রেরিত রাজস্ব খলীফার নিকট পৌঁছে গেছে। সে রাজস্ব আমর ইবনুল আস প্রেরিত রাজস্ব থেকে বেশী ছিল।

খলীফা বললেন, 'দেখ, গাভী বেশী দুধ দিয়েছে।' আমর সাথে সাথে জবাব দেন, 'হ্যাঁ তবে বাচ্চা অভুক্ত থাকবে।' এ ঘটনার পরও হযরত আমর ইবনুল আস (রা) পূর্বের মতই খলীফা উসমানের হিতাকাঙ্খী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। মিসর থেকে বিদ্রোহীরা যখন মদীনায় পৌঁছে তখন হযরত ওসমান (রা) তাদেরকে বুঝানোর জন্য আমরকে পাঠান। তিনি তাঁর পূর্বের প্রভাব কাজে লাগিয়ে বিদ্রোহীদের ফেরত পাঠান। তাছাড়া যখনই হযরত উসমানের (রা) সামনে কোন সমস্যা দেখা দিত, আমর ইবনুল আসের সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি অত্যন্ত সততার সাথে পরামর্শ দিতেন। খলীফা হতযরত উসমানের (রা) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যখন চরম আকার ধারণ করে তিনি তখন মজলিসে শূরার বৈঠক আহবান করেন। হযরত আমর ইবনুল আস ছিলেন এ বৈঠকের অন্যতম সদস্য। শূরার সাথে পরামর্শের পর খলীফা আমরের কাছে বিশেষভাবে তাঁর মতামত জিজ্ঞেস করেন। তিনি খলীফাকে তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলীফা—আবু বকর ও উমারের (রা) পদাঙ্ক অনুসরণের পরামর্শ দেন। অর্থাৎ প্রয়োজনে কোমল ও প্রয়োজনে কঠোর হতে বলেন।

মিসরের ওয়ালীর পদ থেকে অপসারিত হয়ে মূলতঃ তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান এবং ফিলিস্তীনে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তবে মাঝে মাঝে মদীনায় আসা-যাওয়া করতেন। বিদ্রোহীদের দ্বারা খলীফা উসমান যখন অবরুদ্ধ হন, আমর ইবনুল আস তখন মদীনায়। তিনি যখন দেখলেন বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন এ কথা বলে মদীনা ত্যাগ করেন যে, উসমানের হত্যায় যার হাত থাকবে আল্লাহ্ তাকে অপমান করবেন এবং যে তাকে সাহায্য করতে পারবে না তার মদীনা ত্যাগ করা উচিত। তিনি মদীনা ছেড়ে সিরিয়া চলে গেলেন। তবে সব সময় লোক মারফত মদীনার খোঁজ-খবর রাখতেন। অতঃপর হযরত উসমানের শাহাদাত এবং উটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু তিনি সিরিয়ার নির্জনবাস থেকে বের হলেন না। কোন কিছুতেই জড়িত হলেন না।

হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যে বিরোধ শুরু হল। হযরত আলী হযরত মুয়াবিয়ার কাছে আনুগত্যের দাবী করলেন। মুয়াবিয়া আমর ইবনুল আসের সাথে পরামর্শ করলেন। বর্ণিত আছে, প্রথমত আমর মুয়াবিয়াকে বলেছিলেন, কোন অবস্থাতেই মুসলিম উম্মাহ আপনাকে আলীর পদমর্যাদা দেবে না। কিন্তু পরে দেখা গেল এই ঝগড়ায় আমর ইবনুল আস সম্পূর্ণভাবে মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করলেন। সিফফীনে উভয় পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে আমর ছিলেন মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর সিপাহসালার। আমরের পরামর্শেই এ যুদ্ধে আসন্ন পরাজয়ের মুহূর্তে বর্শার মাথায় কুরআন ঝুলিয়ে মুয়াবিয়া আলীর (রা) কাছে আপোষ-মিমাংসার প্রস্তাব দেন এবং আলীকে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণায় বাধ্য করেন। অতঃপর বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দু'সদস্য বিশিষ্ট যে সালিশী বোর্ড গঠন করা হয়, সে বোর্ডে আমর ইবনুল আস ছিলেন মুয়াবিয়ার মনোনীত, আর আবু মূসা আশয়ারী (রা) ছিলেন আলীর (রা) মনোনীত সদস্য।

আমর ও আবু মূসা আশয়ারী বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর দু'মাতুল জান্দালে উপস্থিত হলেন তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য। কিন্তু ঘোষণার মুহূর্তে আমর পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে কূটনৈতিক প্যাঁচের মাধ্যমে মুয়াবিয়াকে খলীফা বলে ঘোষণা দান করেন এবং সাথে সাথে প্রতিপক্ষ আবু মূসার (রা) মুখ দিয়েও আলীকে (রা) বরখাস্তের কথাটি ঘোষণা করিয়ে নেন।

মুসলিম উম্মার আত্মঘাতী বিরোধ নিষ্পত্তির যে সম্ভাবনা সালিশী বোর্ড গঠনের মাধ্যমে দেখা দিয়েছিল, ঐতিহাসিকদের মতে তা হযরত আমরের (রা) কূটকৌশলের কারণে ব্যর্থ হয়। উভয় পক্ষে আবার বিরোধ ও যুদ্ধ শুরু হয়। আমর মিসর আক্রমণ করে হযরত আলী কর্তৃক নিযুক্ত মিসরের গভর্ণর মুহাম্মাদ বিন আবী বকরকে পরাজিত ও হত্যা করে মিসর দখল করেন।

অতঃপর চরমপন্থী খারেজী সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেহেতু মুসলিম উম্মার বিভেদের কারণ প্রধানতঃ তিন ব্যক্তিঃ আলী, মুয়াবিয়া ও আমর। সুতরাং তাদেরকে দুনিয়া থেকে

সরিয়ে দিতে হবে। ইবন মুলজিম, বারক বিন আবদিল্লাহ ও আমর ইবন বকর আত-তামীমীর ওপর এ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। সিদ্ধান্ত মুতাবিক নির্ধারিত দিন ও সময়ে তারা তিন জনের ওপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালায়। হযরত আলী শহীদ হলেন, মুয়াবিয়া সামান্য আহত হয়ে বেঁচে গেলেন। আর আমর অসুস্থ থাকায় তাঁর পরিবর্তে খারেজা ইবন হুজাফা নামায পড়াতে বেরিয়েছিলেন, আততায়ী তাঁকেই আমর ইবনুল আস মনে করে আঘাত হানে এবং তাকে হত্যা করে। এভাবে আমরও বেঁচে গেলেন।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) আমরকে মিসরের ওয়ালী নিযুক্ত করলেন। মিসরের ওয়ালী থাকাকালে তাঁর ও আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলেও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তিনি মিসরের ওয়ালীর পদে বহাল থাকেন। মিসরের ওয়ালী থাকাকালীন হিজরী ৪৩ মতান্তরে ৪৭ অথবা ৫১ সনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জীবনের আশা ছেড়ে দেন। জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি অতীত ভুলের জন্য অনুশোচনায় ভীষণ দগ্ধিভূত হন।

তিনি যখন মৃত্যু শয্যায়, ইবন 'আব্বাস তাঁকে দেখতে আসেন। সালাম বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, আবু আবদিল্লাহ, কেমন অবস্থা? 'আমর জবাব দিলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞেস করছেন? আমার দুনিয়া তৈরী হয়েছে, কিন্তু দ্বীন বিনষ্ট হয়েছে। যদি এমন না হয়ে এর বিপরীত হতো, তাহলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমি সফলকাম হতাম। যদি শেষ জীবনের চাওয়া ফলপ্রসূ হতো তাহলে অবশ্যই চাইতাম। যদি পালিয়ে বাঁচার পথ থাকতো, পালাতাম। কিন্তু মিনজিনিকের মত আমি এখন আসমান ও যমীনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় আছি। হাতের সাহায্যে না উপরে উঠতে পারছি, না পায়ের সাহায্যে নীচে নামতে পারছি। ভাতিজা, আমার উপকারে আসে এমন কিছু নসীহত আমাকে কর। ইবন আব্বাস বললেন, আফসুস! সে সময় আর কোথায়! এখন তো ভাতিজা বৃদ্ধ হয়ে আপনার ভাই হয়ে গেছে। এখন যদি আপনি আমাকে কাঁদতে বলেন, কাঁদতে পারি। আমর বললেন, এখন আমার বয়স আশি বছরেরও কিছু বেশী। এখন তুমি আমাকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করছো। হে আল্লাহ, এই ইবন আব্বাস আমাকে তোমার রহমত থেকে নিরাশ করছে। তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও এমন শাস্তি তুমি এখনই আমাকে দাও। ইবন আব্বাস বললেন, আবু আবদিল্লাহ, যে জিনিস আপনি নিয়েছিলেন তাতো নতুন আর যা দিচ্ছেন তাতো পুরাতন। আমর বললেন, ইবন আব্বাস, তোমার কী হয়েছে, আমি যা বলছি, তুমি তার উল্টা বলছো? (আল-ইসতিয়াব)

আবদুর রহমান ইবন শাম্মাসা বলেন, তিনি আমর ইবনুল আসকে মৃত্যু শয্যায় দেখতে যান। আমর দেয়ালের দিকে মুখ করে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ বললেন, আব্বা, কাঁদছেন কেন? রাসূলুল্লাহ (সা) কি আপনাকে অমুক অমুক বাশারাত বা সুসংবাদ দেননি? তিনি জবাব দিলেন, আমার সর্বোত্তম সম্পদ—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর শাহাদাত বা সাক্ষ্য। আমার জীবনের তিনটি পর্ব অতিক্রান্ত হয়েছে। একটি পর্ব এমন গেছে যখন আমি ছিলাম কট্টর দুশমন। আমার চরম বাসনা ছিল, যে কোনভাবেই রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যা করা। তারপর আমার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু। রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করে ইসলাম কবুল করলাম। তখন আমার এমন অবস্থা যে, রাসূলুল্লাহর (সা) চেয়ে আর কোন ব্যক্তি আমার নিকট অধিকতর প্রিয় বা সম্মানী বলে মনে হয়নি। অতিরিক্ত সম্মান ও ভীতির কারণে তাঁর প্রতি আমি ভালো করে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। কেউ যদি এখন আমাকে তাঁর চেহারা মুবারক কেমন ছিল জিজ্ঞেস করে, আমি তাকে কোন কিছুই বলতে পারিনে। তখন যদি আমার মরণ হতো, জান্নাতের আশা ছিল। এরপর আমার জীবনের তৃতীয় পর্ব। এ সময় আমি নানা রকম কাজ করেছি। আমি জানিনে এখন আমার কি অবস্থা হবে। আমার মৃত্যু হলে বিলাপকারীরা যেন আমার জানাযার সাথে না যায়।

দাফনের সময় ধীরে ধীরে মাটি চাপা দেবে। দাফনের পর একটি জন্তু জবেহ্ করে তার গোশত ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়া যায়, এতটুকু সময় কবরের কাছে থাকবে। যাতে আমি তোমাদের উপস্থিতিতেই কবরের সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে পারি এবং আল্লাহর দূতের প্রশ্নসমূহের জবাব ঠিক করে নিতে পারি। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে মৃত্যুর পর তাঁকে কিভাবে দাফন করতে হবে সে সম্পর্কে অসীয়াত করলেন। তারপর জিকরে মশগুল হলেন। বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ, তুমি নির্দেশ দিয়েছিলে, আমি তা অমান্য করেছি, তুমি নিষেধ করেছিলে, আমি নাফরমানী করেছি। আমি নির্দোষ নই যে, ওজর পেশ করবো, আমি শক্তিমানও নই যে, বিজয়ী হব।" তারপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে পড়তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হিজরী ৪৩ সনের ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের নামাযের পর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ জানাযার নামায পড়ান। মিসরের 'মাকতাম' নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর নিজ হাতে তৈরী মিসরের প্রথম মসজিদ 'জামে' আমর ইবনুল আস'-এর পাশে তাঁর কবরটি আজও চিহ্নিত রয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল নব্বই বছর।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আমর ইবনুল আসের জীবনের বেশী অংশ জিহাদের ময়দানেই কেটেছে। এ কারণে জ্ঞান অর্জন ও চর্চার সময় ও সুযোগ তিনি কমই পেয়েছেন। কুরআন তিলাওয়াতে তিনি বিশেষ পুলক ও স্বাদ অনুভব করতেন। অত্যন্ত সুন্দর করে তিলাওয়াত করতেন। জীবনটি জিহাদের ময়দানে কাটলেও যতটুকু সময় পেয়েছেন রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত থেকে ইলম ও আমলের উন্নতি সাধন করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ৩৯টি হাদীস বা বাণী তিনি বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ৩টি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। ৩টি এককভাবে মুসলিম বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আমর ইবনুল আস জিহাদের ব্যস্ততা সত্ত্বেও শিক্ষাদান ও ওয়াজ-নসীহতের দায়িত্বও পালন করতেন। 'জাতুস সালাসিল' যুদ্ধে বিজয়ের পর সেখানে অবস্থান করে নও-মুসলিমদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর দুনিয়ার প্রতি কিছু মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেলে তিনি বক্তৃতা-ভাষণে রাসূলুল্লাহর (সা) আদর্শ অনুসরণের প্রতি মানুষকে আহবান জানাতেন।

তিনি সাহিত্য রসিকও ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক। অল্পকথায় অধিক ভাব প্রকাশ, সুন্দর উপমা প্রয়োগ এবং বাক্য ও ভাবের অলঙ্করণ তাঁর সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে তাঁর সাহিত্যের বহু নমুনা সংরক্ষিত হয়েছে। বিশেষতঃ 'আমুর রামাদাহ' অর্থাৎ যে বছর আরবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সে বছর খলীফা উমার মদীনা থেকে মিসরে অবস্থানরত আমরকে খাদ্যশস্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন এবং সে চিঠির জবাবে আমর যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন তা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। তাছাড়া তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ, পত্রাবলী ও বিভিন্ন ধরনের লেখায় সাহিত্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে।

হযরত আমর ইবনুল আসের সমগ্র জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি তাঁর জীবনে পরীক্ষার বিভিন্ন পর্ব অতিক্রম করেছেন। সবগুলি পর্বে তিনি সমানভাবে সফলকাম হতে পারেননি। বিশেষতঃ সাহাবী জীবনের শেষ পর্বের কিছু ঘটনার যৌক্তিতা আপাতঃ দৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামী উম্মাহ্ ইমামরা জীবনের শেষ পর্বের এসব ভূমিকাকে তাঁর ইজতিহাদী ভুল বলে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। তবে জীবনের এ পর্বের কতিপয় বিতর্কিত ঘটনা ছাড়া অন্য সকল সাহাবীদের মত তাঁর সামগ্রিক জীবনকে রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত বা সাহচর্য ফুলের মত শুভ্র ও সুন্দর করে তুলেছিল।

আমর ইবনুল আসের (রা) ঈমানের বলিষ্ঠতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর আমর ইবনুল আস ঈমান এসেছে।' অন্য এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আসের দুই পুত্র—হিশাম ও আমর ঈমান এনেছে।' (মুসনাদে ইমাম আহমাদ) এ কথার সত্যতা তাঁর জীবনের একটি ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) খবর পাঠালেন, 'আমর যেন পোশাক পরে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এখনই হাজির হয়। নির্দেশ মত আমর সাথে সাথে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) অজু করছিলেন, তিনি চোখ তুলে তাকালেন। তারপর চোখ নীচু করে বললেন, তোমাকে আমীর বানিয়ে পাঠাতে চাই। ইন্‌শাআল্লাহ তুমি নিরাপদ থাকবে এবং প্রচুর গনীমাত লাভ করবে। সেই গনীমাত থেকে তুমিও একটা অংশ পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আমর বলে ওঠেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমি সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করিনি ; বরং তা গ্রহণ করেছি অন্তরের টানে। রাসূল (সা) বললেন, 'পবিত্র সম্পদ সত্যনিষ্ঠ মানুষের জন্যই উত্তম।' আরেকবার রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, আমর ইবনুল আস কুরাইশদের নেককার ব্যক্তিদের অন্যতম। (মুসনাদে আহমাদ)

একদিন তিনি কা'বার দেয়ালের ছায়ায় বসে লোকদের হাদীস শুনাচ্ছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কোন ইমামের হাতে বাইয়াত করেছে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁর সহায়তা করা উচিত। কেউ তাঁর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করলে তাকে প্রতিহত করাও উচিত।"আবদুর রহমান ইবন আবদে কা'বা (এই হাদীসের বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি হাদীসটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শুনেছেন? 'আমর নিজের কান ও অন্তরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আমার এ দু'টি কান শুনেছে ও অন্তর সংরক্ষণ করেছে।' এরপর আবদুর রহমান বললেন, আপনার চাচাতো ভাই মুয়াবিয়া আমাদেরকে অবৈধভাবে একে অপরের সম্পদ খাওয়ার ও অন্যায়ভাবে প্রাণ নষ্ট করার আদেশ দেয়। এ কথা শুনে 'আমর চুপ হয়ে যান। তারপর বলেন, "আল্লাহর নাফরমানি যাতে না হয় তা মান এবং যাতে নাফরমানি হয় তা মানবে না।" এ দ্বারা বুঝা যায় তিনি প্রকৃতিগত ভাবেই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) আমর ইবনুল আসকে (রা) তাঁর [illegible] জন্য ভালোবাসতেন। হযরত হাসান (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আমর ইবনুল আসকে জিজ্ঞেস করেন, এমন ব্যক্তি কি সৎ স্বভাব বিশিষ্ট নয়, যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভালোবাসতেন? তিনি বললেন, তার সৌভাগ্য সম্পর্কে কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে? লোকটি বললেন, 'শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে ভালোবাসতেন।'

জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের কতিপয় ব্যক্তির অন্যতম। ইমাম শা'বী বলতেন, ইসলামী আরবে কূটনীতিক চার জন। তন্মধ্যে আমর ইবনুল আস অন্যতম। (আল-ইসাবা) কূটনীতিতে একমাত্র হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) ছিলেন তাঁর সমকক্ষ। তাঁর দৈহিক গঠন, চাল-চলন, কথা-বার্তা প্রভৃতির মাঝে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠতো যে, তিনি নেতৃত্বের জন্যই জন্ম লাভ করেছেন। বর্ণিত আছে, একদিন আমীরুল মু'মিনীন উমার (রা) তাঁকে আসতে দেখে প্রথমে একটু হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, 'আমীর বা নেতা হওয়া ছাড়া আবু আবদিল্লাহর পৃথিবীতে হেঁটে বেড়ানো উচিত নয়।' (রিজালুন হাওলার রাসূল—৬১৮)

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সুস্থ মতামতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'তুমি ইসলামে সঠিক মতামতের অধিকারী'—এ কথা রাসূল (সা) তাঁকে বলেছেন। (কানযুল উম্মাল) হযরত ফারুকে আজম (রা) যখন কোন মোটা বুদ্ধির লোক দেখতেন, বিস্ময়ের সাথে বলতেন, এই ব্যক্তি ও আমর ইবনুল আসের স্রষ্টা একই সত্তা! (আল-ইসাবা)

হযরত আমরের এই সীমাহীন বুদ্ধিমত্তা ও দুঃসাহসের জন্য হযরত রাসূলে পাক (সা) বহু গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আবু বকর, উমার ও আবু উবায়ইদার (রা) মত উঁচু মর্যাদার অধিকারী সাহাবীদের ওপরও তাঁকে আমীর নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকৃতই তিনি মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি দুর্যোগময় মুহূর্তে আমীর বা নেতার মত যোগ্যতা ও মেধার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর যোগ্যতা লক্ষ্য করেই উমারের (রা) মত বিচক্ষণ শাসক তাঁকে ফিলিস্তীন, জর্দান, তারপর মিসরের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি তাঁর খিলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত এ পদে বহাল রেখেছিলেন।

ইতিহাসে তাঁকে 'ফাতেহ মিসর'—মিসর বিজয়ী বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু যে অর্থে তাঁকে বিজয়ী বলা হয় সেই অর্থে বিজয়ী নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মিসরবাসীর মুক্তিদাতা। রোমানদের শত শত বছরের দাসত্ব ও শৃঙ্খল থেকে তিনি মিসরবাসীকে মুক্তি দেন এবং সমগ্র আফ্রিকায় ইসলামী দাওয়াতের পথ সুগম করেন।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ হযরত আমরের (রা) জীবনের গৌরবময় অধ্যায়। সকল যুদ্ধেই তিনি প্রখ্যাত সেনানায়ক হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের (রা) পাশাপাশি থেকেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, সেই প্রথম থেকে যুদ্ধের ময়দানে রাসূল (সা) অন্য কাউকে আমার ও খালিদের সমকক্ষ মনে করেননি। (মুসতাদরিক) মদীনায় যখনই কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত করে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন। একবার কোন কারণে মদীনায় ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবু হুজায়ফার গোলাম সালেম তলোয়ার হাতে মদীনার মসজিদে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরও অসি কোষমুক্ত করে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। পরে রাসূলে পাক (সা) খুতবার মধ্যে বললেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আশ্রয়ে আস না কেন এবং আমর ও সালেমকে কেন আদর্শ হিসেবে গ্রহণ কর না? (আল-ইসাবা)

হযরত আমর ইবনুল আস ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। আল্লাহর রাস্তায় তিনি প্রশস্ত চিত্তে ব্যয় করেছেন। খোদ রাসূলে খোদা (সা) একাধিকবার সে কথা স্বীকার করেছেন। 'আলকামা ইবন রামসা বালাবী বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এক বাহিনী সহ আমরকে পাঠালেন বাহরাইন এবং নিজে বের হলেন অন্য এক অভিযানে। আমিও রাসূলুল্লাহর (সা) এ অভিযানে সহযাত্রী ছিলাম। একদিন রাসূল (সা) একটু তন্দ্রালু হলেন। তন্দ্রা কেটে গেলে বললেন, 'আল্লাহ, আমরের ওপর রহম কর।' আমাদের মধ্যে যারা এ নামের ছিল, আমরা প্রত্যেকেই তাদের কথা চিন্তা করলাম। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তন্দ্রাভিভূত হলেন এবং জেগে উঠে একই কথা বললেন। আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোন্ আমরের কথা বলছেন?' বললেনঃ আমর ইবনুল আস। আমরা কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ আমার সেই সময়ের কথা স্মরণ হয়ে গেল যখন আমি মানুষের কাছে সাদাকাহ বা দান চেয়েছি, সে প্রচুর সাদাকাহ নিয়ে এসেছে। যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছি, এত সাদাকাহ কোথা থেকে নিয়ে এসেছো? সে বলেছে, আল্লাহ দিয়েছেন। অন্য একবার রাসূল (সা) তিনবার বলেন, "হে আল্লাহ, তুমি আমর ইবনুল আসকে ক্ষমা করে দাও। যখন আমি তাকে সাদাকাহ দেয়ার জন্য বলেছি, সে সাদাকাহ নিয়ে হাজির হয়েছে।"

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)

নাম আবু সুলাইমান খালিদ, লকব সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি)। পিতা ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা এবং মাতা লুবাবা আস-সুগরা, উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা বিনতুল হারিস ও হযরত আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিবের স্ত্রী লুবাবা আল-কুবরার বোন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আব্বাস (রা) তাঁর খালু। (উসুদুল গাবা-২/৯৩)

তাঁর খান্দান ছিল জাহিলী আরবের কুরাইশদের মধ্যে অতি সম্ভ্রান্ত। কুব্বা ও 'আয়িন্না (সৈন্য ও সেনা ক্যাম্পের পরিচালন দায়িত্ব)—এ দু'টি দায়িত্ব ছিল তাঁর খান্দানের ওপর। ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় খালিদ ছিলেন এই পদে অধিষ্ঠিত। (আল-ইসতিয়াব-১/১৫৭) হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য কুরাইশদের যে দলটি মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তার নেতা ছিলেন খালিদ। উহুদ যুদ্ধে বীরত্বের সাথে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েন এবং মক্কার মুশরিক বাহিনীর সুনিশ্চিত পরাজয়কে বিজয়ে রূপদান করেন।

হযরত খালিদের ইসলাম গ্রহণের সময় সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তবে মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি আছে।

হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) হাবশা থেকে মদীনায় চলেছেন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে। পথে মদীনা অভিমুখী আরেকটি কাফিলার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ। তারাও চলেছেন একই উদ্দেশ্যে মদীনায়। দ্বিতীয় এই দলটির সাথে ছিলেন হযরত খালিদ। হযরত 'আমর ইবনুল 'আস খালিদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন দিকে?' খালিদ জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কসম, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এ ব্যক্তি নবী—আর কতদিন এভাবে চলবে? চলো যাই ইসলাম গ্রহণ করি।' (আল-ইসাবা-১/৪১৩, মুসনাদে আহমাদ) তাঁরা মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। প্রথমে খালিদ, তারপর 'আমর ইবনুল 'আস রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন। 'আমর মক্কায় ফিরে আসেন; কিন্তু খালিদ মদীনায় থেকে যান।

হযরত খালিদ বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ দেখেছিলাম, আমার আশা ছিল এ বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত তোমাকে কল্যাণ ও মঙ্গলের কাছেই সমর্পণ করবে।' খালিদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর হাতে বাইয়াত করার সময় বলেছিলাম, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে যত পাপ আমি করেছি তা ক্ষমার জন্য দু'আ করুন। রাসূল (সা) বলেছিলেন, ইসলাম অতীতের সকল গুনাহ-খাতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ কথার ওপরই আমি বাইয়াত করলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করে যত অপরাধ সে করেছে, তুমি তা ক্ষমা করে দাও। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৮৪-৮৫)

ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ইসলাম-পূর্ব খান্দানী সামরিক পদে বহাল রেখে তাঁর খিদমত গ্রহণ করেন। (উসুদুল গাবা-২/৯৩) ইসলাম-পূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন মুসলমানদের চরম দুশমন, আর ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের জন্য হয়ে দাঁড়ান ভীষণ বিপজ্জনক। অসংখ্য যুদ্ধে তাঁর তরবারি মুশরিকদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদ সর্বপ্রথম মূতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দাওয়াতী কার্যক্রমের আওতায় হযরত হারিস ইবন 'উমাইর আযদীকে একটি পত্রসহ বসরার শাসকের নিকট পাঠান। শুরাহ্‌বীল ইবন 'আমর গাস্‌সানী মূতা নামক স্থানে হারিসকে হত্যা করে। এ

ঘটনার প্রতিশোধকল্পে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়িদ ইবন হারিসার নেতৃত্বে দু'হাজার সৈন্যের এক বাহিনী পাঠান। প্রতিপক্ষ রোমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দু'লাখ। যায়িদ ইবন হারিসার বাহিনী মদীনা থেকে যাত্রার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের উপদেশ দেন, "যুদ্ধে যায়িদ যদি শহীদ হয় তাহলে জা'ফর এবং জা'ফর শহীদ হলে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে। আর যদি আবদুল্লাহও শহীদ হয় তাহলে তোমরা তোমাদের কাউকে আমীর বানিয়ে নেবে।"

তাঁরা ছিলেন তিনজন— যায়িদ, জা'ফর ও আবদুল্লাহ! তাঁরা সিরিয়ার মূতা অভিযানের তিন বীর। এ অসম যুদ্ধে তাঁরা নজীরবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে একে একে শাহাদাত বরণ করেন। অবশেষে হযরত খালিদ নেতৃত্ব লাভ করেন। একের পর এক তিন সেনাপতির শাহাদাত বরণে মুসলিম বাহিনী সাহস হারিয়ে ফেলে। খালিদ শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করতে না পারলেও মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেন।

হযরত রাসূলে করীম (সা) উল্লেখিত তিন সেনাপতির শাহাদাত ও খালিদের নেতৃত্ব গ্রহণের খবর মদীনায় ঘোষণা করেছিলেন এভাবেঃ

"যায়িদ ইবন হারিসা পতাকা হাতে নিয়ে শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করে। তারপর জা'ফর সেই পতাকা তুলে নেয় এবং সেও যুদ্ধ করে শহীদ হয়। তারপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সেই পতাকা হাতে তুলে নেয় এবং সেও শহীদ হয়। অতঃপর 'সাইফুন মিন সুয়ূফিল্লাহ'— আল্লাহর অন্যতম এক তরবারি সে পতাকা তুলে ধরে এবং তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করেন।" (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৮৬) এইভাবে তিনি লাভ করেন 'সাইফুল্লাহ'— আল্লাহর অসি উপাধি। অবশ্য এই উপাধি লাভের ঘটনা বা সময় সম্পর্কে ভিন্নমতও আছে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, কোন এক স্থানে হযরত রাসূলে করীম (সা) অবস্থান করছিলেন। কেউ পাশ দিয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন,—কে? জবাবে বলা হচ্ছিল অমুক। এক সময় খালিদ গেলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন,—কে? বলা হলো, খালিদ। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দাহ্ খালিদ কত ভালো। সে আল্লাহর অন্যতম এক তরবারি। এটা মূতার পরের ঘটনা। (উসুদুল গাবা-২/৯৪, আল-ইসাবা-১/৪১৩)

যায়িদ, জা'ফর ও আবদুল্লাহ—এ তিন সেনাপতির অধীনে হযরত খালিদ একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে মূতা অভিযানে যোগদান করেছিলেন। উল্লেখিত তিনজনের শেষ ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করলে হযরত সাবিত ইবন আকরাম দৌড়ে পতাকার কাছে যান এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যাতে কোন বিশৃংখলা দেখা না দেয় সে জন্য ডান হাতে পতাকা উঁচু করে ধরেন। পতাকা তুলে ধরে তিনি এক দৌড়ে হযরত খালিদের কাছে এসে বলেন, 'খুজ আল-লিওয়াআ ইয়া আবা সুলাইমান,— 'আবু সুলাইমান, পতাকাটি তুমি ধর'। যে বাহিনীর মধ্যে প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারগণ ছিলেন, সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার কোন অধিকার-যে খালিদের মত নও মুসলিমের থাকতে পারেনা এ কথা তিনি ভালো করেই জানতেন। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে সাবিত ইবন আকরামকে বলেন, 'না, পতাকা আমি গ্রহণ করতে পারিনা, আপনিই এর যোগ্যতম ব্যক্তি। আপনি বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং বদরী (অর্থাৎ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী)।' সাবিত জবাব দিলেন, 'ধর, যুদ্ধে তুমি আমার থেকে পারদর্শী। এ পতাকা আমি তোমার জন্যই তুলে এনেছি।' তারপর হযরত সাবিত (রা) মুসলিম বাহিনীকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি খালিদের নেতৃত্বে রাজি?' তারা সমস্বরে জবাব দিল ঃ 'হাঁ, আমরা রাজি'। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৮৬-৮৭) খালিদ বলেন, মূতার যুদ্ধে আমার হাতে সাতখানি তরবারি ভাঙ্গে। অবশেষে একখানি ইয়ামনী তরবারি অক্ষত থাকে। (উসুদুল গাবা-২/৯৪)

মক্কা বিজয়কালে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। রাসূল (সা) মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণ ভাগের দায়িত্ব তাঁকে দেন। বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় হলেও খালিদের হাতে সেদিন কতিপয় মুশরিক প্রাণ হারায়। তিনি 'কুদার' দিক দিয়ে মক্কায় ঢুকছিলেন, পথে মক্কার একটি মুশরিক দলের মুখোমুখি হন। মুশরিকরা তীর নিক্ষেপ শুরু করে। তিনি তীর ছুঁড়ে তাদের জবাব দেন। তাতে কয়েকজন মুশরিক নিহত হয়। এজন্য তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জবাবদিহি করতে হয়। রাসূল (সা) যখন জানলেন, মুশরিকরাই প্রথম আক্রমণ চালিয়েছে, তখন তিনি এটাকে আল্লাহর ইচ্ছা হিসাবে মেনে নিয়ে চুপ করে যান।

হুনাইন অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বারো হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত হয় মুসলিম বাহিনী। হযরত রাসূলে করীম (সা) গোটা বাহিনীকে গোত্র ভিত্তিক কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। বনু সুলাইম গোত্র ছিল গোটা বাহিনীর পুরোভাগে। আর এর কম্যাণ্ডিং অফিসার ছিলেন হযরত খালিদ। এ যুদ্ধে তিনি দারুণ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর শরীরের একাধিক স্থান আহত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দেখতে আসেন, তাঁর আহত স্থানসমূহে ফুঁক দেন এবং তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। (উসুদুল গাবা-২/৯৫) তায়িফ অভিযানে খালিদ ছিলেন অগ্রগামী বাহিনীর কম্যাণ্ডিং অফিসার। হিজরী নবম সনে তাবুক অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। রাসূল (সা) এ যুদ্ধে দুমাতুল জান্দাল-এর সরদার উকাইদার ইবন আবদিল মালিকের বিরুদ্ধে চার শো সৈনিক সহ পাঠান। খালিদ উকাইদারের ভাইকে হত্যা করেন এবং উকাইদারকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির করেন।

হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদকে দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে বনী জুজাইমা গোত্রে পাঠান। খালিদের দাওয়াতে বনী জুজাইমা গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ সঠিক ভাষায় তা ব্যক্ত করতে না পারায় খালিদ তাদের ভুল বুঝেন। তিনি আক্রমণের নির্দেশ দেন। ফলে, এই গোত্রের বহু লোক হতাহত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বিষয়টি অবগত হয়ে ভীষণ দুঃখিত হন। তিনি হাত উঠিয়ে দু'আ করেন; 'হে আল্লাহ, আমি খালিদের এই কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত' তারপর হযরত আলীকে পাঠিয়ে তাদের সকল ক্ষতিপূরণ দান করেন। তাদের নিহত কুকুরগুলিরও ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। (বুখারীঃ কিতাবুল মাগাযী, উসুদুল গাবা-২/৯৪)

এই ঘটনার পর খালিদ মদীনায় ফিরে এলে বিষয়টি নিয়ে তাঁর ও আবদুর রহমান ইবন 'আউফের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে খালিদ আবদুর রহমানকে কিছু গালমন্দ করেন। কথাটি রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছালে তিনি রেগে যান এবং খালিদকে বলেন, "আমার সাহাবীদের গালি দেবে না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও ব্যয় করে তবুও সে তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেক পরিমাণ ব্যয়ের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবে না।" (উসুদুল গাবা-২/৯৫)

হিজরী দশম সনে হযরত রাসূলে করীম (সা) খালিদকে নাজরানের 'বনু আবদিল মাদ্দান' গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য পাঠান। যেহেতু খালিদ বনু জুজাইমার ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে মারাত্মক ভুল করেছিলেন, এ কারণে রাসূল (সা) যাত্রার পূর্বে তাঁকে বিশেষ হিদায়াত দেনঃ 'কেবল ইসলামের দাওয়াতই দেবে, কোন অবস্থাতেই তলোয়ার উঠাবে না'। তিনি এ হিদায়াত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাঁর দাওয়াতে গোটা আবদুল মাদ্দান গোত্র ইসলাম কবুল করে। এভাবে রণক্ষেত্রের এক সৈনিক প্রথমবারের মত সত্যিকার 'দায়ী-ই ইসলাম' ইসলামের দাওয়াত দানকারী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এ সকল নওমুসলিমকে তিনি তালীম ও তারবিয়াত দেন এবং তাদেরকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে নিয়ে আসেন। একই বছর ইয়ামনবাসীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আলী ও খালিদকে (রা) পাঠানো হয়। তাঁদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইয়ামনবাসী ইসলাম কবুল করে।

জাহিলী আরবের কুরাইশদের মূর্তি পূজার কেন্দ্রসমূহের একটি ছিল 'উয্যা'। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদকে পাঠালেন কেন্দ্রটি ধ্বংসের জন্য। তিনি সেখানে পৌঁছে নিম্নের পংক্তিটি আবৃত্তি করতে করতে কেন্দ্রটি মাটিতে মিশিয়ে দেন ঃ "ওহে উয্যা, তুমি পবিত্র নও, আমরা তোমায় অস্বীকার করি, আমি দেখেছি, আল্লাহ্ তোমায় অপমানিত করেছেন।" (উসুদুল গাবা-২/৯৪)

হযরত রাসূলে করীমের (সা) ইনতিকালের সাথে সাথে আরব উপদ্বীপের চতুর্দিকে ইসলাম ত্যাগকারী, নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার ও যাকাত অস্বীকারকারীদের মারাত্মক ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই ফিতনাবাজদের শির-দাঁড়া গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য খলীফা আবু বকর (রা) সেনা বাহিনী প্রস্তুত করে নিজেই যাত্রার জন্য ঘোড়ায় চড়লেন। কিন্তু বিশিষ্ট সাহাবীরা মনে করলেন খলীফার এ সময় দারুল খিলাফা মদীনায় থাকা উচিত। হযরত আলী (রা) খলীফার ঘোড়ার লাগামটি ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহর রাসূলের খলীফা, কোন্ দিকে? উহুদের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে যে-কথা বলেছিলেন, আমি সে কথাই বলছি ঃ ওহে আবু বকর, তোমার তরবারি উন্মুক্ত হয়ে গেছে, তুমি তোমার নিজকে দিয়ে আমাদের ব্যথিত করো না।" খলীফা সিদ্ধান্ত বাতিল করে মদীনায় থেকে গেলেন। তিনি গোটা সেনা বাহিনীকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করেন এবং একটি ভাগের দায়িত্ব প্রদান করেন খালিদকে। খালিদকে মদীনা থেকে বিদায় দেওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'খালিদ আল্লাহর একটি তরবারি—যা আল্লাহ্ কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছেন। খালিদ আল্লাহর কতইনা ভালো বান্দা এবং গোত্রের কতই না ভালো ভ্রাতা'। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৯১)

হযরত খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। প্রতিটি অভিযানের পূর্বে তিনি তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিতেন ঃ তোমরা কৃষকদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। তাদের নিরাপদে থাকতে দেবে। তবে তাদের কেউ যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

ভণ্ড নবী তুলাইহার বিরুদ্ধে খালিদ অভিযান পরিচালনা করেন। তুমুল লড়াই চলছে। প্রতিটি সংঘর্ষেই তুলাইহার সঙ্গীরা পরাজয় বরণ করছে। একদিন তুলাইহা তার ঘনিষ্ঠজনদের কাছে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের এমন পরাজয় হচ্ছে কেন? তারা বললো, কারণ, আমাদের প্রত্যেকেই চায় তার সঙ্গীটি তার আগে মারা যাক। অন্যদিকে আমরা যাদের সাথে লড়ছি, তাদের প্রত্যেকেই চায় তার সঙ্গীর পূর্বে সে মৃত্যুবরণ করুক। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৯৩) খালিদ তুলাইহার সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করেন এবং তার তিরিশ জন সঙ্গীকে বন্দী করে মদীনায় পাঠান। তিনি মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। হযরত হামযার হন্তা হযরত ওয়াহ্শীর হাতে ভণ্ড মুসাইলামা নিহত হয়।

ভণ্ড নবীদের ফিতনা নির্মূল করার পর হযরত খালিদ যাকাত দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী)-দের দিকে ধাবিত হন। সর্বপ্রথম আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ে আঘাত হানেন। তাদের কিছু মারা যায়, কিছু বন্দী হয়, আর অবশিষ্টরা তাওবাহ্ করে আবার ইসলামে ফিরে আসে। (তারীখুল খুলাফা ঃ সুয়ূতী-৭২) মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল অভিযানে খালিদ ছিলেন অগ্রভাগে। তাবারী বলেছেন ঃ 'মুরতাদদের বিরুদ্ধে অভিযানে যত বিজয় অর্জিত হয়েছে, তার সবই খালিদ ও অন্যান্যদের কৃতিত্ব।'

আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা দমনের পর হযরত খালিদ ইরাকের দিকে অগ্রসর হন। মুজার, কাইসার, আলীম, আমগীশীয়া, হীরা, আমবার, আইনুত তামার, দুমাতুল জান্দাল, হাসীদ, খানাফিস, সানা ও বিশর, ফিরাদ প্রভৃতি যুদ্ধে তিনি অতুলনীয় সাহস ও কৌশল প্রদর্শন করে সমগ্র ইরাক পদানত করেন। হযরত খালিদের সাথে ইরাকীদের সর্বশেষ যুদ্ধ হয় ফিরাদে। ফুরাতের এক তীরে মুসলিম বাহিনী ও অপর তীরে সম্মিলিত ইরাকী-বাহিনী। ইরাকীরা প্রস্তাব দিল ঃ হয় তোমরা এপারে আস, না হয় আমাদের ওপারে যাওয়ার সুযোগ দাও। হযরত খালিদ প্রস্তাবে রাজি হয়ে তাদের এপারে আসার

সুযোগ করে দিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হলো। মুসলিম বহিনী শত্রুবাহিনীকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেললো। পেছনে তাদের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ ফুরাত নদী। পেছনে সরে গেলে ডুবে মরা এবং সামনে এগুলে মুসলিম সৈন্যদের তরবারির শিকার হওয়া ছাড়া আর কোন পথ তাদের ছিল না। হযরত খালিদ গোটা শত্রু বাহিনীকে এমন এক যাঁতাকলে আটক করে পিষে ফেলেন। এ যুদ্ধের পর হযরত খালিদ গোপনে হজ্জে চলে যান।

হযরত খালিদ যখন ইরাকে যুদ্ধরত, সিরিয়ায় তখন অন্য একটি মুসলিম বাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত। খালিদের ইরাক অভিযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে খলীফার দরবার থেকে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো সিরিয়ায় অবস্থানরত বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। খালিদ ইরাক থেকে বসরা উপস্থিত হলেন। পূর্ব থেকেই ইসলামী ফৌজ সেখানে খালিদের প্রতীক্ষায় ছিল। খালিদ পৌঁছেই বসরা আক্রমণ করেন। বসরাবাসীরা সন্ধি চুক্তি করে জীবন রক্ষা করে।

বসরা অভিযান শেষ করে হযরত খালিদ ও আবু উবাইদা আজনাদাইন পৌঁছেন। পূর্ব থেকেই হযরত 'আমর ইবনুল আস সেখানে অবস্থান করছিলেন। হিজরী ১৩ সনে তুমুল লড়াই হয়। আজনাদাইন খালিদের পদানত হয়।

সেনাপতি আবু উবাইদার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী তিন দিক থেকে দিমাশ্‌ক অবরোধ করে বসে আছে। এক দিকের দায়িত্বে হযরত খালিদ নিয়োজিত। তিন মাস অবরোধ করেও কোন ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময় দিমাশকের পাদ্রীর এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। নগরবাসী সেই জন্ম উৎসবে মদ পান করে আনন্দে বিভোর হয়ে পড়ে। হযরত খালিদ যুদ্ধের সময় রাতে প্রায় ঘুমাতেন না। রাতে সামরিক ব্যবস্থাপনা ও দুশমনদের তথ্য সন্ধানে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি দিমাশকবাসীর অবস্থা অবগত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন, তাকবীর ধ্বনি শোনার সাথে সাথে তারা যেন নগর-প্রাচীরের ফটকে ছুটে গিয়ে আক্রমণ চালায়। এদিকে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট সৈনিককে নির্বাচন করে রশির সাহায্যে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং অতর্কিতে ফটকের প্রহরীকে হত্যা করে তালা ভেঙ্গে তাকবীর দেওয়া শুরু করেন। তাকবীর শোনার সাথে সাথে বাইরে অপেক্ষমান সৈন্যরা একযোগে ভেতরে প্রবেশ করে। নগরবাসী তখন ঘুমে অচেতন। এমন অতর্কিত হামলায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে সেনাপতি আবু উবাইদার নিকট সন্ধির প্রস্তাব দেয় এবং নিজেদের হাতে নগর প্রাচীরের অন্য দ্বারগুলি উন্মুক্ত করে দেয়। একদিকে হযরত খালিদ বিজয়ীর বেশে, অন্যদিকে হযরত আবু উবাইদা সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করে নগরে প্রবেশ করেন। নগরের মাঝামাঝি স্থানে খালিদ ও আবু উবাইদা মুখোমুখি হন। যদিও নগরের অর্ধেক যুদ্ধ করে দখল করা হয়, তবুও আবু উবাইদা গোটা নগরবাসীর সাথে সন্ধির শর্তানুযায়ী সমান আচরণ করেন। (তারীখঃ ইবনুল আসীর ৬/৩২৯)।

ফাহলের যুদ্ধেও খালিদ অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন অগ্রবর্তী বাহিনীর কম্যাণ্ডার। রোমানরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। ফাহলের পর খালিদ ও আবু উবাইদা হিমসের দিকে অগ্রসর হন।দিমাশকের প্রশাসনিক দায়িত্বে তখন ইয়াযিদ বিন আবী সুফইয়ান। রোমানরা পুনরায় দিমাশক দখলের পায়তারা চালায়। ইয়াযিদ বাধা দেন। প্রচণ্ড লড়াই চলছে। এমন সময় পেছনের দিক থেকে ধুমকেতুর মত হাজির হলেন হযরত খালিদ। রোমান বাহিনীর মুষ্টিমেয় কিছু সদস্য ছাড়া সকলেই খালিদ-বাহিনীর হাতে নিহত হয়।

সিরিয়ার বিভিন্ন ফ্রন্টে রোমান বাহিনীর পরাজয়ের খবর শুনে এক পর্যায়ে তথাকার রোমান শাসক মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তার পরিষদবর্গ তাকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়ে বলেঃ আমরা অবশ্যই আবু বকরের অশ্বারোহীদের আমাদের ভূমিতে প্রবেশে বাধা দেব। তারা সেনাপতি মাহানের নেতৃত্বে দু'লাখ চল্লিশ হাজার সদস্যের এক বিরাট বাহিনী ইয়ারমুকে

সমাবেশ করে। তাদের পাদরী পুরোহিতরাও নির্জনবাস থেকে বেরিয়ে ধর্মের নামে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তোলে। খলীফা আবু বকর (রা) এ খবর শুনে মন্তব্য করেন, 'আল্লাহর কসম, আমি খালিদের দ্বারা তাদের প্রবৃত্তির এ প্ররোচনার নিরাময় করবো।' হ্যাঁ, খালিদই ছিলেন সেদিন রোমানদের সেই মহাব্যাধির ধন্বন্তরী প্রতিষেধক।

হযরত খালিদ ময়দানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন কম্যাণ্ডার পৃথকভাবে নিজ নিজ সৈন্য পরিচালনা করছে। তিনি মুসলিম যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত এক ভাষণ দেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হামদ-সানার পর বলেন ঃ "আজকের এ দিনটি আল্লাহর অন্যতম একটি দিন। এ দিনে গর্ব ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। তোমরা তোমাদের জিহাদে নিষ্ঠাবান হও, তোমাদের কাজের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর। এসো আমরা ইমারাহ্ বা নেতৃত্ব ভাগাভাগি করে নিই। আমাদের কেউ আজ, কেউ আগামীকাল এবং কেউ পরশু আমীর হোক। এভাবে তোমাদের সকলেই আমীর হবে। তোমরা আজকের দিনটি আমাকে ছেড়ে দাও।" সকলে প্রস্তাবে রাজি হলো। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৯৫) তিনি গোটা বাহিনীকে মোট ৩৮/৩৬ টি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগে একজন অফিসার নিয়োগ করেন। সেদিন তিনি মুসলিম বাহিনীকে এমনভাবে বিন্যাস করেন যে, আরবরা পূর্বে তেমন আর কখনো দেখেনি।

ইয়ারমুকে মুসলিম বাহিনী নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণের পর হযরত খালিদ মহিলাদের আহ্বান জানান এবং প্রথম বারের মত তাদের হাতে তরবারি দিয়ে নির্দেশ দেন, তোমরা মুসলিম মুজাহিদদের পেছনে অবস্থান গ্রহণ করবে। কাউকে পালিয়ে পেছনে সরে আসতে দেখলে তাকে এ তরবারি দিয়ে হত্যা করবে। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৯৫)

এই তোড়জোড়ের মধ্যে একজন মুসলিম মুজাহিদ হতাশ কণ্ঠে বললো ঃ রোমানদের সংখ্যা কত বেশী, আর আমাদের সংখ্যা কত কম। খালিদ তাকে বললেন ঃ তোমার কথা ঠিক নয়। বরং একথা বল, রোমানরা কত কম, এবং মুসলমানরা কত বেশী—মানুষের সংখ্যা দ্বারা নয় ; বরং বিজয়ের দ্বারা সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পরাজয়ের দ্বারা হ্রাস পায়। আল্লাহর কসম, যদি আমার ঘোড়ার ক্ষুর ভালো থাকতো আমি তাদের এ আধিক্যের পরোয়া করতাম না। (তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়াহ ১/১৯৩) উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ ভ্রমণে হযরত খালিদের ঘোড়া 'আসকার'-এর ক্ষুর আহত হয়ে পড়েছিল।

ইয়ারমুকে যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে রোমান সেনাপতি 'মাহান' দূত মারফত জানালো যে, সে খালিদের সাথে সরাসরি কথা বলতে চায়। খালিদ রাজি হলেন। দু'বাহিনীর মধ্যবর্তী ময়দানে দু'সেনাপতি মুখোমুখি হলেন। রোমান সেনাপতি খালিদকে বললো ঃ "আমরা জেনেছি, কঠোর শ্রম ও ক্ষুধা তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। তোমরা চাইলে তোমাদের প্রত্যেককে আমরা দশটি দীনার, এক প্রস্থ পোশাক ও কিছু খাদ্য দিতে পারি। বিনিময়ে তোমরা দেশে ফিরে যাবে। আগামী বছরও অনুরূপ জিনিস আমি তোমাদের কাছে পাঠাবো।" রোমান সেনাপতির এ কথায় যে-অপমান প্রচ্ছন্ন ছিল খালিদ তা অনুধাবন করলেন। তিনি রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উপযুক্ত জবাবটা ছুঁড়ে মারলেন। বললেন ঃ "—ক্ষুধা আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে এখানে আনেনি— যেমনটি তোমরা বলেছো। তবে আমরা একটি রক্তপায়ী জাতি। আমরা জেনেছি, রোমানদের রক্ত অপেক্ষা অধিক লোভনীয় ও পবিত্র রক্ত নাকি পৃথিবীতে আর নেই। তাই সেই রক্তের লোভে আমরা এসেছি।" কথাগুলি ছুঁড়ে দিয়েই মহাবীর খালিদ ঘোড়ার লাগাম ধরে টান দিলেন এবং সোজা নিজ বাহিনীতে ফিরে এসে 'আল্লাহু আকবর, হুব্বি রিয়াহাল জান্নাহ্'— ধ্বনি দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

রোমান বাহিনী এমন ভয়ংকররূপে অগ্রসর হলো যে, আরবরা এমনটি আর কখনো দেখেনি। মুসলিম বাহিনীর মধ্যভাগের দায়িত্বে ছিলেন ইকরিমা ইবন আবী জাহল ও কা'কা ইবন আমর। খালিদ তাঁদের আক্রমণের নির্দেশ দিলেন! তাঁরা দু'জন গানের পংক্তি আবৃত্তি করতে করতে শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলো। খালিদ তাঁর গোটা বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। খালিদ রোমান অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর মধ্যভাগে ঢুকে পড়লেন। তিনি যেদিকে গেলেন, রোমান বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো। একাধারে একদিন ও এক রাত তুমুল লড়াই চললো। পরদিন সকালে খালিদকে দেখা গেল রোমান সেনাপতির মঞ্চের ওপর। তাবারীর মতে, এ যুদ্ধে রণক্ষেত্রে নিহতদের ছাড়াও পশ্চাৎদিকে পলায়নপর সৈনিকদের মধ্যে এক লাখ বিশ হাজার রোমান সৈন্য জর্দান নদীতে ডুবে মারা যায়।

যুদ্ধ শেষ। পরদিন সকালে ইকরিমা ও তাঁর পুত্র 'আমর ইবন ইকরিমাকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল। খালিদ ইকরিমার মাথা নিজের উরু ও 'আমরের মাথা পায়ের নলার ওপর রেখে, তাঁদের মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন এবং গলায় ফোঁটা ফোঁটা পানি ঢালতে ঢালতে বলতে লাগলেন ঃ 'ইবনুল হানতামা' অর্থাৎ 'উমার মনে করেছিলেন আমরা শাহাদাত বরণ করতে জানিনে। কক্ষণো নয়।' এ যুদ্ধে তিন হাজার মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। (তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ—১/১৯৩)

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ব্যক্তিত্ব রোমান বাহিনীকে কতটুকু প্রভাবিত করেছিল বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তা অনুধাবন করা যায়। ইয়ারমুকের যুদ্ধ তখন চলছে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে রোমান বাহিনীর এক কম্যাণ্ডার, নাম 'জারজাহ্' নিজ ছাউনী থেকে বেরিয়ে এল। তার উদ্দেশ্য খালিদের সাথে সরাসরি কথা বলা। খালিদ তাঁকে সময় ও সুযোগ দিলেন। জারজাহ্ বললো ঃ "খালিদ, আমাকে একটি সত্যি কথা বলুন, মিথ্যা বলবেন না। স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিথ্যা বলেন না। আল্লাহ কি আকাশ থেকে আপনাদের নবীকে এমন কোন তরবারি দান করেছেন যা তিনি আপনাকে দিয়েছেন এবং সেই তরবারি যাদেরই বিরুদ্ধে উত্তোলিত হয়েছে, তারা পরাজিত হয়েছে?

খালিদ ঃ না।

জারজাহ ঃ তাহলে আপনাকে 'সাইফুল্লাহ'— আল্লাহর তরবারি বলা হয় কেন?

খালিদ ঃ আল্লাহ আমাদের মাঝে তাঁর রাসূল পাঠালেন। আমাদের কেউ তাঁকে বিশ্বাস করলো, কেউ করলো না। প্রথমে আমি ছিলাম শেষোক্ত দলে। অতঃপর আল্লাহ আমার অন্তর ঘুরিয়ে দেন। আমি তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনে তাঁর হাতে বাইয়াত করি। রাসূল (সা) আমার জন্য দু'আ করেন। আমাকে তিনি বলেন ঃ তুমি আল্লাহর একটি তরবারি। এভাবে আমি হলাম 'সাইফুল্লাহ'।

জারজাহ্ ঃ কিসের দিকে আপনারা আহবান জানান?

খালিদ ঃ আল্লাহর একত্ব ও ইসলামের দিকে।

জারজাহ্ ঃ আজ যে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করবে সেও কি আপনাদের মতই সওয়াব ও প্রতিদান পাবে?

খালিদ ঃ হ্যাঁ, বরং তার থেকেও বেশী।

জারজাহ ঃ কিভাবে? আপনারা তো এগিয়ে আছেন।

খালিদ ঃ আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উঠেছি, বসেছি। আমরা দেখেছি তাঁর মু'জিযা ও অলৌকিক কর্মকাণ্ড। যা কিছু আমরা দেখেছি তা কেউ দেখলে, যা শুনেছি তা কেউ শুনলে, অবশ্যই তার উচিত সহজেই ইসলাম গ্রহণ করা। আর আপনারা যাঁরা তাঁকে দেখেননি, তাঁর কথা শুনেননি, তারপরও অদৃশ্যের ওপর ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতিদান অধিকতর শ্রেষ্ঠ। যদি আপনারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ওপর ঈমান আনেন।"

জারজাহ্ অশ্ব হাঁকিয়ে খালিদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেনঃ খালিদ, আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিন।

জারজাহ্ ইসলাম গ্রহণ করে দু'রাকায়াত নামায আদায় করলেন। এ দু'রাকায়াতই তার জীবনের প্রথম ও শেষ নামায। তারপর এ নও মুসলিম-রোমান শাহাদাতের বাসনা নিয়ে মুসলিম বাহিনীর সাথে চললেন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। আল্লাহ্ পাক তার বাসনা পূর্ণ করলেন। তিনি শহীদ হলেন (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৯৯-৩০১)।

ইয়ারমুকে রোমান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের খবর শুনে হিরাক্লিয়াস হিমস নগরী পেছনে ফেলে পিছু হটে যান। যাবার সময় তিনি বলেছিলেন— 'সালামুন আলাইকা ইয়া সুরিয়া সালামান লা লিকাআ বা'দাহ'— হে সিরিয়া, তোমাকে বিদায়ী সালাম, যে সালামের পর আর কোন সাক্ষাৎ নেই। ইয়ারমুকের পর হযরত খালিদ 'হাদির' জয় করেন।

হাদির অভিযান শেষ করে খালিদ চললেন 'কিন্নাসরীণ'-এর দিকে। কিন্নাস্‌রীনবাসীরা আগে ভাগেই মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কিল্লায় প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। হযরত খালিদ তাদের লক্ষ্য করে বললেনঃ 'তোমরা যদি মেঘমালার ওপর আশ্রয় নাও, আল্লাহ্ সেখানেও আমাদের উঠিয়ে নেবেন আথবা তোমাদের নামিয়ে নিয়ে আসবেন আমাদের কাছে।' (তারীখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ-২/৪) কিন্নাসরীণের অধিবাসীরা হিমসবাসীদের পরিণতি চিন্তা করে খালিদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে।

বাইতুল মাকদাস অবরোধ করা হয়েছে। এ অবরোধে মুসলিম বাহিনীর কম্যাণ্ডিং অফিসারদের মধ্যে খালিদও আছেন। বাইতুল মাকদাসের খৃষ্টান অধিবাসীরা কোন দিশা না পেয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। তবে তারা আবদার রেখেছে স্বয়ং আমীরুল মুমিমীন 'উমার নিজ হাতে সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। তাদের আবদার রক্ষার জন্য খলীফা মদীনা থেকে সিরিয়া এসেছেন। তিনি সিরিয়ায় অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর অফিসারবৃন্দকে 'জাবিয়া' তলব করেছেন। অত্যন্ত জাঁকজমক পোশাক পরে খালিদ এসেছেন। খলীফার দৃষ্টিতে পড়তেই তিনি ঘোড়া থেকে নেমে খালিদের প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করে বলেনঃ 'এত শিগগির অভ্যাস পাল্টে ফেলেছো? খালিদ হাতিয়ার উঁচু করে ধরে বললেন, 'তবে সৈনিক সুলভ অভ্যাস যায়নি।' খলীফা বললেন, 'তাহলে কোন দোষ নেই।' হিজরী ১৭ সনে আবু উবাইদা ও খালিদ যৌথভাবে হিমসের বিদ্রোহ দমন করেন। আর সেই সাথে সমগ্র সিরিয়ায় শত শত বছরের রোমান শাসনের অবসান ঘটে।

এতবড় সেনাপতিকেও খলীফা হযরত 'উমার রেহাই দেননি। তিনি খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে সাধারণ সৈনিকের পদে নামিয়ে দেন। বরখাস্তের সন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য আছে। কারো মতে হযরত 'উমারের খিলাফতের পাঁচ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হিজরী ১৭ সনে তাঁকে অপসারণ করা হয়। আবার কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত উমার খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরই তাঁকে বরখাস্ত করেন, হযরত খালিদ তখন ইয়ারমুকের রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

হযরত খালিদের অপসারণের ঘটনা বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইয়ারমুকে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। এমন সময় মদীনা থেকে নতুন খলীফা উমারের (রা) দূত একটি চিঠি নিয়ে রণাঙ্গনে উপস্থিত হলো। চিঠির বিষয়বস্তু দুইটি— আবু বকরের (রা) মৃত্যু সংবাদ এবং খালিদকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে আবু উবাইদার নিয়োগ। খালিদ চিঠিটি পাঠ করে আবু বকরের জন্য মাগফিরাত ও উমারের সাফল্য কামনা করে দুআ করলেন। তারপর পত্রবাহককে অনুরোধ করলেন সে যেন পত্রের বিষয় কারো কাছে প্রকাশ না করে। এভাবে খালিদ আবু বকরের (রা) মৃত্যু সংবাদ ও উমারের নির্দেশ গোপন করে তার কমাণ্ড চালিয়ে অবশ্যম্ভাবী বিজয় ছিনিয়ে আনেন। তারপর আবু উবাইদার নিকট উপস্থিত হয়ে একজন সাধারণ সৈনিকের মত তাঁকে সম্মান

প্রদর্শন করলেন। আবু উবাইদা প্রথমে মনে করলেন, এ হয়তো রসিকতা। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলেন এ রসিকতা নয়; বরং বাস্তব ও সত্য। পোশাক খুলে আবু 'উবাইদার সামনে রাখলেন।

উল্লেখিত ঘটনাটি কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত খালিদের ব্যয় কখনও সীমা অতিক্রম করে যেত। কবি-সাহিত্যিকদের তিনি মোটা অংকের অর্থ দান করতেন। কবি আশয়াস ইবন কায়েসকে দশ হাজার দিরহাম দান করেন। খলীফা উমার এ কথা অবগত হয়ে আবু উবাইদাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন খালিদকে জিজ্ঞেস করেন কোন্ খাত থেকে এ অর্থ তিনি দান করেছেন? মুসলিম উম্মাহর অর্থ থেকে দিয়ে থাকলে খিয়ানাত বা বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেছেন, আর নিজের অর্থ থেকে দিয়ে থাকলে অপব্যয় করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবু উবাইদা খালীফার এ ফরমান লাভ করেন ইয়ারমুকের রণক্ষেত্রে। তিনি খালিদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন নিজের ব্যক্তিগত অর্থ থেকে দান করেছি। অতঃপর আবু উবাইদা তাকে খলীফার ফরমান পাঠ করে শোনান এবং সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্তের ইঙ্গিত হিসাবে খালিদের মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নেন এবং পাগড়ি ঘাড়ের ওপর নামিয়ে দেন। খালিদ শুধু মন্তব্য করেন, আমি খলীফার ফরমান শুনেছি এবং তা মেনে নিয়েছি। এখনও আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ মানতে এবং খিদমাত অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত। খলীফা তাঁকে মদীনায় তলব করেন। তিনি মদীনায় পৌঁছলে তাঁর সম্পদের কঠোর হিসাব গ্রহণ করা হয়; কিন্তু কোন অসঙ্গতি পাওয়া যায়নি। অতঃপর খলীফা উমার (রা) সর্বত্র ঘোষণা করে দেন, আমি খালিদকে আস্থাহীনতা, ক্রোধবশতঃ বা এ জাতীয় কোন কারণে অপসারণ করিনি। (ইবনুল আসীর-২/৪১৮)

উল্লেখিত ঘটনা ছাড়াও খালিদের অপসারণের আরো কারণ ছিল। খালিদের সৈনিক স্বভাবে ছিল রুক্ষতা। প্রতিটি কাজে তিনি নিজের মর্জিমত চলতেন, খলীফার সাথে পরামর্শের প্রয়োজন মনে করতেন না। সেনাবাহিনীর আয়-ব্যয়ের হিসাবও খলীফার দরবারে নিয়ম মত পাঠাতেন না। ইরাক অভিযান শেষ করেই তিনি খলীফা আবু বকরের (রা) অনুমতি ছাড়াই হজ্জের উদ্দেশ্যে মককায় চলে যান। তাঁর এ কাজে হযরত আবু বকর (রা) ভীষণ বিরক্ত হন। খলীফা তাঁকে বার বার সতর্ক করেন। তিনি খলীফাকে জবাব দেন, আমাকে আমার মর্জিমত কাজ করার সুযোগ দিন, অন্যথায় আমি নিজেই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবো। খালিদের এসব কাজে আবু বকরের (রা) সময় থেকেই হযরত উমার (রা) অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বার বার আবু বকরকে (রা) পরামর্শ দান করেন খালিদকে বরখাস্ত করার জন্য। আবু বকর (রা) প্রতিবারই জবাব দেন, আমি এমন তরবারিকে কোষবদ্ধ করতে পারিনা যাকে আল্লাহ্ কোষমুক্ত করেছেন। উমার খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর খালিদকে সংশোধনের চেষ্টা করেন; কিন্তু ফলোদয় না হওয়ায় তাঁকে বরখাস্ত করেন।

তাছাড়া তাঁকে অপসারণের পশ্চাতে তৃতীয় যে কারণটির কথা ইতিহাসে উল্লেখ আছে তা হলো, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে এ ধারণা ও বিশ্বাস জন্ম লাভ করে যে, ইসলামের বিজয় মূলতঃ খালিদের বাহুবলের ওপর নির্ভরশীল। এ ধরনের অমূলক ধারণা খলীফা উমারের মোটেই মনোপূত ছিল না। তিনি খালিদকে অপসারণ করে এ বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করেন।

বিষয়টি যেভাবে এবং যেমন করেই ঘটুক না কেন, এ ক্ষেত্রে হযরত খালিদের ভূমিকা লক্ষ্যণীয় বিষয়। তিনি যে আনুগত্য, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন ইতিহাসে তার কোন নজীর পাওয়া যাবে না। এমনটি করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন এ কারণে যে, তিনি বিশ্বাস করতেন সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিক— উভয় অবস্থা সমান। সর্ব অবস্থায় আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং যে দ্বীনের প্রতি তিনি ঈমান এনেছেন, তাদের সকলের প্রতি দায়িত্ব পালন করা নিজের অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। একজন অনুগত সেনাপতি এবং একজন অনুগত সাধারণ সৈনিক— এ দু'য়ের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ তাঁর দৃষ্টিতে ছিল না। তাই তিনি সেনাপতির পদ ছেড়ে সাধারণ সৈনিক হিসেবে

সমানভাবে কাজ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। আর একই কারণে আবু উবাইদার হাতে সেনাপতির দায়িত্ব বুঝে দেওয়ার পর সাধারণ সৈনিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলতে পেরেছিলেন ঃ 'এই উম্মাতের আমীন বা পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবাইদাকে তোমাদের আমীর নিয়োগ করা হয়েছে।'

খলীফা হযরত 'উমার (রা) খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করার পর তাঁকে বিভিন্ন প্রদেশে ওয়ালী হিসেবে নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর খালিদ স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। হিজরী ২১/২২ সনে কিছু দিন অসুস্থ থাকার পর মদীনায় ইনতিকাল করেন। অনেকের মতে তিনি হিমসে ইনতিকাল করেন ; কিন্তু একথা সঠিক নয় বলে ধারণা হয়। কারণ, খলীফা হযরত উমার (রা) তাঁর জানাযায় শরিক হন বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ আছে। (উসুদুল গাবা ২/৯৬, আল ইসাবা-১/৪১৫)

হযরত খালিদের (রা) মৃত্যুর পর খলীফা হযরত উমার (রা) বলেছিলেন ঃ 'নারীরা খালিদের মত সন্তান প্রসবে অক্ষম হয়ে গেছে।' খালিদের মৃত্যুর পর খলীফা অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন। মানুষ পরে জেনেছিল, শুধু খালিদের বিয়োগ ব্যথায় তিনি এভাবে কাঁদেননি ; বরং খালিদের অপসারণের কারণ দূরীভূত হওয়ায় তিনি তাঁকে আবার সেনাপতির পদে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। মৃত্যু তাঁর সেই ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হওয়ায় তিনি এত কেঁদেছিলেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৩০৫)

প্রথম থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত হযরত খালিদের জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত হয়েছে। এ কারণে হযরত রাসূলে পাকের (সা) সুহবতে থাকার সুযোগ ও সময় খুব কম পেয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'জিহাদের ব্যস্ততা কুরআনের বিরাট একটি অংশ শিক্ষা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে।' (আল ইসাবা-১/৪১৫) তা সত্ত্বেও সুহবতে নববীর ফয়েজ ও ইলমের সৌভাগ্য থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন, তা নয়। রাসূলে পাকের (সা) ইনতিকালের পর মদীনার আলিম ও মুফতী সাহাবীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তবে সৈনিক স্বভাবের কারণে ইফতা'র মসনদে কখনো তিনি বসেননি। তাঁর ফতোয়ার সংখ্যা দু'চারটির বেশী পাওয়া যায় না। (আ'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন) তিনি মোট ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে দু'টি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম এবং একটি বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

একবার 'আম্মার বিন ইয়াসির (রা) ও তাঁর মধ্যে ঝগড়া হয়। খালিদ তাঁকে ভীষণ গালমন্দ করেন। আম্মারও রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট শিকায়েত করেন। সকল বৃত্তান্ত শুনে রাসূল (সা) মন্তব্য করেন ঃ 'যে 'আম্মারের সাথে হিংসা ও শত্রুতা রাখে সে আল্লাহর সাথে হিংসা ও শত্রুতা রাখে।' খালিদের ওপর রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণীর এমন প্রতিক্রিয়া হলো যে, তিনি তক্ষুণি আম্মারের কাছে ছুটে যান এবং তাঁকে খুশী করেন। খালিদ নিজেই বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে ওঠার পর আম্মারের সন্তুষ্টি অর্জন করা ছাড়া আমার নিকট অধিক প্রিয় আর কোন জিনিস ছিল না।

হযরত খালিদের হৃদয়ে রাসূলে পাকের (সা) প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা এত তীব্র ছিল যে, রাসূলুল্লাহর (সা) শানে কেউ কোন সামান্য অমার্জিত কথা বললে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কিছু স্বর্ণ এলো। তিনি তা নজদী সরদারদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। কুরাইশ ও আনসারদের কেউ কেউ এতে আপত্তি জানায়। এক ব্যক্তি বলে বসে, 'মুহাম্মাদ আল্লাহকে ভয় করুন।' রাসূল (সা) বলেন ঃ 'আমি আল্লাহর নাফরমানী করলে আল্লাহর ইতায়াত বা আনুগত্য করে কে?' লোকটির এমন অমার্জিত কথায় খালিদ ক্রোধে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অনুমতি দিন, তার গর্দান উড়িয়ে দিই। রাসূল (সা) তাঁকে শান্ত করেন। (বুখারী)

হযরত খালিদের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও গৌরবজনক অধ্যায় 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' — আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তাঁর রণক্ষেত্রে কেটেছে। তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক কর্মকাণ্ড ও জিহাদের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কারণে হযরত রাসূলে পাকের পক্ষ থেকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধি লাভ করেন। প্রায় সোয়া শো যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। যেখানেই গেছেন বিজয়ী হয়ে ফিরেছেন। তাঁর ওপর হযরত রাসূলে পাকের এতখানি আস্থা ছিল যে, তাঁর হাতে পতাকা এলে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতেন। প্রচুর সমরাস্ত্র তিনি পৈতৃক বিষয় হিসেবে লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর সব কিছুই আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দেন। (তাবাকাত) তাঁর বন্ধু ও শত্রুরা তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেঃ 'তিনি এমন ব্যক্তি যিনি নিজেও ঘুমান না, অন্যকেও ঘুমাতে দেন না।' খালিদ নিজেই বলতেন ঃ "এমন একটি রাত্রি যা আমি নব বধুর সাথে কাটাতে পারি, অথবা যে রাত্রে আমাকে একটি পুত্র সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়— তা অপেক্ষা একটি প্রচণ্ড শীতের রাত্রে একটি মুহাজির দলের সাথে প্রত্যুষে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ চালাই, তা আমার নিকট অধিক প্রিয়।"

মৃত্যুশয্যায় একদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমি শতাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তরবারি, তীর অথবা বর্শার দু'একটি আঘাত রয়েছে। আর আজ আমি জ্বরাগ্রস্ত উটের মত বিছানায় পা দাপিয়ে মৃত্যুবরণ করছি।" কথাগুলি তিনি যখন বলছিলেন তখন তাঁর দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৩০৫-৩০৬, উসুদুল গাবা-২/৯৫)

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি খলীফা উমারের (রা) অনুকূলে অসীয়াত করে যান। সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর ঘোড়াটি ও কিছু যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে জীবদ্দশায় তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বস্তু-দু'টি মরণের পরও আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে যান।

হযরত রাসূলে করীম (সা) নানা প্রসঙ্গে একাধিকবার তাঁর প্রশংসা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় একদিন কিছু দূরে খালিদকে দেখা গেল। রাসূল (সা) আবু হুরাইরাকে (রা) বললেন, দেখতো কে? তিনি বললেন, খালিদ। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহর এ বান্দাটি কতই না ভালো! একবার তিনি সাহাবীদের বলেন, খালিদকে তোমরা কষ্ট দেবে না। কারণ, সে কাফিরদের বিরুদ্ধে চালিত আল্লাহর তরবারি।

একবার রাসূল (সা) উমারকে (রা) পাঠালেন যাকাত আদায়ের জন্য। ইবন জামীল, খালিদ ও আব্বাস— এ তিনজন যাকাত দিতে অস্বীকার করলো। রাসূল (সা) একথা অবগত হয়ে বললেন ঃ ইবন জামীল ছিল দরিদ্র, আল্লাহ তাকে সম্মদশালী করেছেন। এ তার প্রতিদান। তবে খালিদের প্রতি তোমরা বাড়াবাড়ি করেছো। সে তার সকল যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। তার ওপর যাকাত হয় কেমন করে? আর আব্বাস? তার দায়িত্ব আমার ওপর। তোমাদের কি জানা নেই চাচা পিতৃস্থানীয়? (আবু দাউদ-১/১৬৩)

হযরত খালিদ (রা) কেবল একজন সৈনিকই ছিলেন না, তিনি একজন দক্ষ দা'য়ী-ই-ইসলাম— ইসলামের দাওয়াত দানকারীও ছিলেন। বনী জুজাইমা ও মালিক ইবন নুওয়াইরার ব্যাপারে তরিৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে যে ক্ষতি হয় তা লক্ষ্য করে রাসূল (সা) পরবর্তীতে দায়িত্ব দিয়ে কোথাও পাঠানোর সময় তাঁকে উপদেশ দেন— 'শুধু ইসলামের দাওয়াত দেবে, তলোয়ার ওঠাবে না।' তেমনিভাবে ইয়ামনে পাঠানোর সময়ও নির্দেশ দেন, 'যুদ্ধের সূচনা যেন তোমার পক্ষ থেকে না হয়।' এ হিদায়াত লাভের পর যত যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন কোথাও কোন প্রকার বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে জানা যায় না। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় এবং তাঁর ওফাতের পরেও তিনি যথাযথভাবে দা'য়ীর দায়িত্ব পালন করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য চতুর্দিকে যে বিভিন্ন মিশন পাঠান, তার কয়েকটির দায়িত্ব খালিদ পালন করেন। বনী

জুজাইমা ও বনী আবদিল মাদ্দান তাঁরই চেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করে। ইয়ামনের দাওয়াতী কাজে তিনি হযরত আলীর (রা) সহযোগী ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ভণ্ড নবী তুলাইহা আসাদীর সহযোগী বনু হাওয়াযিন, বনু সুলাইম, বনু 'আমের প্রভৃতি গোত্র পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে। এছাড়াও অসংখ্য লোক বিভিন্ন সময় তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করে। প্রতিটি যুদ্ধ শুরুর আগে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে সব সময় তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে প্রচণ্ড যুদ্ধের মাঝেও তিনি সফল দায়ীর ভূমিকা পালন করেছেন। ইয়ারমুকের রোমান সৈনিক 'জারজাহ্' তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সংক্ষিপ্ত কোন প্রবন্ধে খালিদের জীবনের সব কথা তুলে ধরা যাবে না। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা) খালিদের মৃত্যুর পর শোক প্রকাশ করে যে-কথাগুলি বলেছিলেন, আমরাও সেই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করছি, 'রাহেমাল্লাহ আবা সুলাইমান, মা'ইনদাল্লাহ খায়রুন মিম্মা কানা ফীহিল্লা, লাকাদ 'আশা হামীদান ওয়া মাতা সা'ঈদান— আল্লাহ আবু সুলাইমান খালিদের ওপর রহম করুন। তিনি যে অবস্থায় ছিলেন আল্লাহর কাছে তার থেকে উত্তম কিছু নেই। তিনি জীবনে প্রশংসিত এবং মরণে সৌভাগ্যবান। '(রিজালুন হাওলার রাসূল-৩০৮)

আবদুল্লাহ্ ইবন হুজাফাহ্ আস-সাহ্মী-(রা)

আবু হুজাফাহ্ আবদুল্লাহ্ নাম। পিতার নাম হুজাফাহ্। কুরাইশ গোত্রের বনী সাহম শাখার সন্তান। ইসলামী দাওয়াতের প্রথম ভাগে মুসলমান হন এবং দীর্ঘদিন যাবত হযরত রাসূলেপাকের (সা) সাহচর্যে অবস্থান করেন। তাঁর ভাই কায়েস ইবন হুজাফাহ্কে সঙ্গে করে হাবশাগামী মুহাজিরদের দ্বিতীয় কাফিলার সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। (আল-ইসতিয়াব)

একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে শরিক হন। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) তাঁকে 'বদরী' বা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মুসা বিন 'উকবা, ইবন ইসহাক ও অন্যরা তাঁকে 'বদরী' বলে 'উল্লেখ করেননি। (আল-ইসতিয়াব)

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে একটি অভিযানের আমীর বানিয়ে পাঠান। যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর অধীনস্থ সৈনিকদের রাসূল (সা) নির্দেশ দেন, কক্ষণো তার নির্দেশ অমান্য করবে না। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর হযরত আবদুল্লাহ কোন কারণে ভীষণ রেগে যান। তিনি সৈনিকদের জিজ্ঞেস করেন, রাসূল (সা) কি আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেননি? তারা বললোঃ হ্যাঁ দিয়েছেন। তিনি বললেন, কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়। মুজাহিদরা কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালায়। তারপর সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তারা একে অপরের দিকে তাকায়। অনেকে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলে, আমরা আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসরণ করেছি, আর এখন সেই আগুনে জীবন দেব? এই বিতর্ক চলতে থাকে, আর এদিকে আগুন নিভে যায়। আবদুল্লাহ্র রাগও পড়ে যায়। অভিযান থেকে ফিরে এসে তারা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্কে (সা) জানায়। রাসূল (সা) বললেন, যদি তোমরা ঐ আগুনে ঢুকে পড়তে, আর কোনদিন তা থেকে বের হতে পারতে না। আনুগত্য কেবল এমন সব ব্যাপারে ওয়াজিব, যার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন। (বুখারীঃ কিতাবুল আহকাম, বাবুস সাময়ে' ওয়াত তায়া'হ, হায়াতুস সাহাবা-১/৬৭)

উল্লেখিত ঘটনাটি কোন কোন বর্ণনায় ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই সব বর্ণনা মতে, হযরত আবদুল্লাহর আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশটি প্রকৃত নির্দেশ ছিলনা। তিনি তাঁর সৈনিকদের সাথে একটু রসিকতা করেছিলেন। হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনীকে এক অভিযানে পাঠালেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহকে এ বাহিনীর আমীর নিয়োগ করলেন। আবদুল্লাহ ছিলেন রসিক লোক। কিছুদূর চলার পর তারা এক স্থানে থামলেন। আবদুল্লাহ তাঁর বাহিনীর সদস্যদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি? তারা বললোঃ হাঁ। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদের একটি নির্দেশ দিই তোমরা পালন করবে? তারা বললোঃ হাঁ। তিনি বললেনঃ আমি আমার অধিকার ও আনুগত্যের দাবীতে নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা এ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। নির্দেশ লাভের সাথে সাথে বাহিনীর কোন কোন সদস্য ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। তখন তিনি বললেনঃ থাম, আমি তোমাদের সাথে একটু রসিকতা করেছি মাত্র। বাহিনী মদীনায় ফিরে আসার পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা) কর্ণগোচর হলো। তিনি বললেনঃ কেউ যদি আল্লাহর নাফরমানির নির্দেশ দেয় তোমরা তা মানবে না। (সীরাতু ইবন হিশাম ২/৬৪০)

হিজরী ৬ষ্ঠ মতান্তরে ৭ম সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আশ-পাশের রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রসহ দূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্য সম্রাটদ্বয়ের নিকটও দূত পাঠাবেন বলে স্থির

করলেন। কিন্তু কাজটি খুব সহজ ছিলনা। এর অসুবিধার দিকগুলিও রাসূল (সা) অবহিত ছিলেন। যে সকল দেশে দূতগণ যাবে তথাকার ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। সেখানে তারা সে দেশের রাজা-বাদশাহ্‌কে তাদের পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবে। নিঃসন্দেহে এ দৌত্যগিরি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। হয়তো সেখানে যারা যাবে তারা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। হামদ ও সানার পর কালেমা-ই-শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর বললেনঃ 'আম্মা বাদ! আমি তোমাদের কিছু লোককে আজমী বা অনারব বাদশাহ্‌দের নিকট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবে না, যেমন করেছিল বনী ইসরাইল ঈসা ইবন মরিয়মের সাথে।

সাহাবীরা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার ইচ্ছা পূরণ করবো। আপনার যেখানে ইচ্ছা আমাদের পাঠান।

হযরত রাসূলেপাক (সা) আরব-আজমের রাজা-বাদশাহদের নিকট দাওয়াতপত্র বহন করার জন্য ছয়জন সাহাবীকে নির্বাচন করলেন। এই ছয়জনের একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ। পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে নির্বাচন করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে স্ত্রী-পুত্রের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বের হলেন। উঁচু-নিচু ভূমির বিচিত্র পথ ধরে তিনি চললেন। সম্পূর্ণ একাকী। এক আল্লাহ ছাড়া সংগে আর কেউ নেই। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পারস্যে পৌঁছলেন। সম্রাটের জন্য একটি পত্র নিয়ে এসেছেন—একথা তাঁর পারিষদবর্গকে জানিয়ে তিনি সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। বিষয়টি সম্রাটের কানে গেল। তিনি দরবার সাজানোর জন্য পারিষদবর্গকে নির্দেশ দিলেন। দরবার সাজানো হলে পারস্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দরবারে ডেকে আনা হলো। তারপর আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) দূত হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ একটি পাতলা 'শামলাহ্' (শরীরে পেঁচানো হয় যে চাদর) এবং একটি মোটা 'আবা' (লম্বা কোর্তা) গায়ে জড়িয়ে একজন সাধারণ বেদুঈন বেশে কিসরার রাজ দরবারে প্রবেশ করলেন। তিনি ছিলেন লম্বা-চওড়া সুঠাম দেহের অধিকারী। ইসলামের গরিমা ও ঈমানের গর্বে ছিলেন তিনি গর্বিত।

আবদুল্লাহকে ঢুকতে দেখেই কিসরা একজন পারিষদকে তাঁর হাত থেকে পত্রটি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ পত্রটি লোকটির হাতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেনঃ 'না, রাসূলুল্লাহ (সা) পত্রটি সরাসরি আপনার হাতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি সে নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারিনে।'

কিসরা তাঁর লোকদের বললেন, 'তাঁকে ছেড়ে দাও, আমার নিকট আসতে দাও।' তিনি এগিয়ে গিয়ে কিসরার হাতে চিঠিটি দিলেন। হীরার অধিবাসী একজন আরবী ভাষী সেক্রেটারীকে ডেকে পত্রটি খুলে পাঠ করতে বললেন। পত্রটি পাঠ করা শুরু হলঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম—করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতি। সালামুন 'আলা মান ইত্তাবায়া' আল-হুদা—যারা হিদায়াত গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি সালাম।......।"

পত্রটির এতটুকু শুনেই কিসরা ক্রোধে ফেটে পড়লেন; তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল, ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) পত্রটির সূচনা করেছেন নিজের নাম দিয়ে, অর্থাৎ কিসরার নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এসেছে। কিসরা পত্রটি পাঠকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। পত্রটির বক্তব্য কি তা আর জানার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি

চিৎকার করে বললেনঃ 'সে আমার দাস, আর সে কিনা আমাকে এভাবে লিখেছে?' তারপর আবদুল্লাহকে মজলিস থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁকে বের করে নিয়ে যাওয়া হল।

আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ কিসরার দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি জানেন না তাঁর ভাগ্যে আল্লাহ কি নির্ধারণ করেছেন। তাঁকে কি হত্যা করা হবে, না মুক্তি দেওয়া হবে? নানা রকম চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। মুহূর্তেই তিনি সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আপন মনে বললেনঃ 'আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহর (সা) পত্র পৌঁছানোর পর এখন আমার কপালে যা হয় হোক। আমি কোন কিছুর পরোয়া করিনে।' একথা বলে তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে বাহনে সাওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন। এদিকে কিসরার ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হলে আদুল্লাহকে আবার হাজির করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া গেল না। তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁর কোন সন্ধান পেল না। আরব উপদ্বীপ অভিমুখী রাস্তায় খোঁজ নিয়ে তারা জানতে পেল তিনি স্বদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁর আর নাগাল পাওয়া গেল না।

হযরত আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে কিসরার কাণ্ডকারখানা সবিস্তার বর্ণনা করলেন। সব কিছু শুনে রাসূল (সা) মন্তব্য করলেনঃ 'মায্যাকাহুল্লাহু মুলকাহু— আল্লাহ তার সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করে ফেলুন।' (আল-ইসতিয়ার)

এদিকে 'কিসরা' তাঁর প্রতিনিধি, ইয়ামনের শাসক 'বাজান'কে লিখলেন, "তোমার ওখান থেকে দু'জন তাগড়া ও শক্তিশালী লোক পাঠিয়ে হিজাযে যে ব্যক্তি নবী বলে দাবী করেছে তাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দাও।" 'বাজান' দু'জন লোক নির্বাচন করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠালো। তাদের হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট লিখিত একটি পত্রও ছিল। তাতে নির্দেশ ছিল, তিনি যেন কাল বিলম্ব না করে পত্র বাহকদের সাথে কিসরার দরবারে হাজির হন। 'বাজান' লোক দু'টিকে আরো নির্দেশ দিল, তারা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে তাকে অবহিত করবে।

লোক দু'টি ইয়ামন থেকে যাত্রা করে রাত-দিন ক্রমাগত চলার পর তায়েফে উপনীত হল। সেখানে তারা একটি কুরাইশ ব্যবসায়ী দলের সাক্ষাৎ লাভ করলো। তাদের কাছে মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করলো। তারা জানালো, মুহাম্মাদ এখন ইয়াসরিব (মদীনা) নগরে। কুরাইশরা লোক দু'টির আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে মহাখুশী হয়ে মক্কায় ফিরলো। তারা মক্কাবাসীদের সুসংবাদ দিলঃ "তোমরা উল্লাস কর। কিসরা এবার মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তার অনিষ্ট থেকে তোমরা এবার মুক্তি পাবে।"

এদিকে লোক দু'টি মদীনায় পৌঁছলো। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে 'বাজান'-এর পত্রটি তাঁর হাতে দিয়ে বললোঃ "শাহানশাহ্ কিসরা আমাদের বাদশাহ 'বাজান'কে লিখেছেন, তিনি যেন আপনাকে নেওয়ার জন্য লোক পাঠান। আমরা তাঁরই নির্দেশে আপনাকে নিতে এসেছি। আমাদের আহবানে সাড়া দিলে আপনার যাতে মঙ্গল হয় এবং তিনি যাতে আপনাকে কোন রকম শাস্তি না দেন সে ব্যাপারে আমরা কিসরার সাথে কথা বলবো। আর আমাদের আহবানে সাড়া না দিলে একটু বুঝে শুনে দেবেন। কারণ আপনাকে এবং আপনার জাতিকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতাতো আপনার জানা আছে।"

তাদের কথা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) মৃদু হেসে বললেনঃ 'তোমরা আজ তোমাদের অবস্থানে ফিরে যাও, আগামীকাল আবার একটু এসো।'

পরদিন তারা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে বললোঃ 'কিসরার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য কি আপনি প্রস্তুতি নিয়েছেন?' রাসূল (সা) বললেন! "তোমরা আর

কক্ষণো কিসরার দেখা পাবে না। আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করেছেন। অমুক মাসের অমুক তারিখ তার পুত্র 'শীরাওয়াইহ্' তাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেছে।" একথা শুনে বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া করে তারা রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখতে লাগলো। তারা বললোঃ

"আপনি কি বলছেন তা-কি ভেবে দেখেছেন ? আমরা কি 'বাজান'কে একথা লিখে জানাবো ?"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ "হাঁ। আর তোমরা তাকে একথাও লিখবে যে, আমার এ দ্বীন কিসরার সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌছবে। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তোমার অধীনে যা কিছু আছে তা-সহ তোমার জাতির কর্তৃত্ব তোমাকে দেওয়া হবে।"

লোক দু'টি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে বের হয়ে সোজা 'বাজান'-এর নিকট পৌছলো এবং তাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সমস্ত কথা অবহিত করলো। 'বাজান' মন্তব্য করলোঃ "মুহাম্মদ যা বলেছেন তা সত্য হলে তিনি অবশ্যই নবী। আর সত্য না হলে, আমরা তাকে উচিত শিক্ষা দেব।..."

তাদের এ আলোচনা চলছে, এমন সময় 'বাজানের' নিকট শীরাওয়াইহ'র পত্র এসে পৌছলো। পত্রের বিষয়বস্তু এরূপঃ "অতঃপর আমি কিসরাকে হত্যা করেছি। আমার জাতির পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই তাকে হত্যা করা হয়েছে।.......... আমার এ পত্র তোমার নিকট পৌছার পর তোমার আশে-পাশের লোকদের নিকট থেকে আমার আনুগত্যের অঙ্গীকার নেবে।"

'বাজান' শীরাওয়াইহ'র পত্রটি পাঠ করার সাথে সাথে তা ছুঁড়ে ফেলে এবং নিজেকে একজন মুসলমান বলে ঘোষণা দেয়। তার সাথে তার আশে-পাশে ইয়ামনে যত পারসিক ছিল তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করে।

এহলো পারস্য সম্রাট কিসরার সাথে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন হুজাফাহর (রা) ঘটনাটির সংক্ষিপ্তসার। রোমান কাইসারের সাথে তাঁর যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা আরো চমকপ্রদ। এ ঘটনাটি ঘটে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমারের খিলাফতকালে।

হিজরী ১৯ সনে খলীফা উমার (রা) রোমানদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠালেন। এই বাহিনীতে আবদুল্লাহ্ ইবন হুজাফাহ আস্-সাহমীও ছিলেন। কাইসার মুসলিম মুজাহিদদের ঈমান, বীরত্ব এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার বহু কাহিনী শুনতেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোন মুসলমান সৈনিক বন্দী হলে তাকে জীবিত অবস্থায় তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবে। আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত আবদুল্লাহ্ রোমানদের হাতে বন্দী হলেন। রোমানরা তাকে তাদের বাদশার নিকট হাজির করে বললোঃ "এ ব্যক্তি মুহাম্মাদের একজন সহচর, প্রথম ভাগেই সে তাঁর দ্বীন গ্রহণ করেছে। আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে, আমরা আপনার নিকট উপস্থিত করেছি।"

রোমান সম্রাট আবদুল্লাহ্ ইবন হুজাফাহর দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললোঃ

'আমি তোমার নিকট একটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাই।' আবদুল্লাহ্ঃ 'বিষয়টি কি ?'

সম্রাটঃ "আমি প্রস্তাব করছি তুমি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ কর। যদি তা কর, তোমাকে মুক্তি দেব এবং তোমাকে সম্মানিত করবো।"

বন্দী আবদুল্লাহ্ খুব দ্রুত ও দৃঢ়তার সাথে বললেনঃ

'আফসুস! যেদিকে আপনি আহ্বান জানাচ্ছেন তার থেকে হাজার বার মৃত্যু আমার অধিক প্রিয়।'

সম্রাটঃ 'আমি মনে করি তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক। আমার প্রস্তাব মেনে নিলে আমি তোমাকে আমার ক্ষমতার অংশীদার বানাবো, আমার কন্যা তোমার হাতে সমর্পণ করবো এবং আমার এ সাম্রাজ্য তোমাকে ভাগ করে দেব।'

বেড়ী পরিহিত বন্দী মৃদু হেসে বললেনঃ "আল্লাহর কসম, আপনার গোটা সাম্রাজ্য এবং সেই সাথে আরবদের অধিকারে যা কিছু আছে সবই যদি আমাকে দেওয়া হয়, আর বিনিময়ে আমাকে বলা

হয় এক পলকের জন্য মুহাম্মাদের (সা) দ্বীন আমি পরিত্যাগ করি, আমি তা করবো না।"

সম্রাটঃ 'তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করবো।'

বন্দীঃ 'আপনার যা খুশী করতে পারেন।'

সম্রাটের নির্দেশে বন্দীকে শূলীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে কষে বাঁধা হল। দু'হাতে ঝুলিয়ে বেঁধে খৃষ্টধর্ম পেশ করা হল, তিনি অস্বীকার করলেন। তারপর দু'পায়ে ঝুলিয়ে বেঁধে ইসলাম পরিত্যাগের আহ্বান জানানো হল, তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।

সম্রাট তাঁর লোকদের থামতে বলে তাঁকে শূলীকাষ্ঠ থেকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর বিশাল এক কড়াই আনিয়ে তার মধ্যে তেল ঢালতে বললেন। সেই তেল আগুনে ফুটানো হল। টগবগ করে যখন তেল ফুটতে লাগলো তখন অন্য দু'জন মুসলমান বন্দীকে আনা হল। তাদের একজনকে সেই উত্তপ্ত তেলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। ফেলার সাথে তার দেহের গোশত ছিন্নভিন্ন হয়ে হাড় থেকে পৃথক হয়ে গেল।

সম্রাট আবদুল্লাহর দিকে ফিরে তাকে আবার খৃষ্টধর্ম গ্রহণের আহবান জানালেন। আবদুল্লাহ এবার পূর্বের চেয়ে আরো বেশী কঠোরতার সাথে প্রত্যাখান করলেন। সম্রাটের নির্দেশে এবার আবদুল্লাহকে সেই উত্তপ্ত তেল ভর্তি কড়াইয়ের কাছে আনা হল। এবার আবদুল্লাহর চোখে অশ্রু দেখা দিল। লোকেরা সম্রাটকে বললো, 'বন্দী এবার কাঁদছে।' সম্রাট মনে করলেন, বন্দী ভীত হয়ে পড়েছে। তিনি নির্দেশ দিলেন, 'বন্দীকে আমার কাছে নিয়ে এস।' তাঁকে আনা হল। এবারও তিনি ঘৃণাভরে খৃষ্টধর্ম প্রত্যাখ্যান করলেন। সম্রাট তখন আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক। তাহলে কাঁদছো কেন?' আবদুল্লাহ জবাব দিলেনঃ "আমি একথা চিন্তা করে কাঁদছি যে, এখনই আমাকে এই কড়াইয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং আমি শেষ হয়ে যাব। অথচ আমার বাসনা, আমার দেহের পশমের সমসংখ্যক জীবন যদি আমার হতো এবং সবগুলিই আল্লাহর রাস্তায় এই কড়াই'য়ের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারতাম।"

এবার খোদাদ্রোহী সম্রাট বললেনঃ 'অন্ততঃপক্ষে তুমি যদি আমার মাথায় একটা চুম্বন কর, তোমাকে আমি ছেড়ে দেব।'

আবদুল্লাহ প্রথমে এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন। তবে শর্ত আরোপ করে বললেন, 'যদি আমার সাথে অন্য মুসলিম বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়, আমি রাজি আছি।'

সম্রাট বললেনঃ 'হ্যাঁ, অন্যদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে।'

আবদুল্লাহ বলেনঃ 'আমি মনে মনে বললাম,বিনিময়ে অন্য মুসলিম বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হবে, এতে কোন দোষ নেই।' তিনি সম্রাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর মাথায় চুম্বন করলেন। রোমান সম্রাট মুসলিম বন্দীদের একত্র করে আবদুল্লাহর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সর্বমোট বন্দীর সংখ্যা ছিল ৮০ জন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) মদীনায় ফিরে এসে খলীফা উমারের (রা) নিকট ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। আনন্দে খলীফা ফেটে পড়লেন। তিনি উপস্থিত সেই বন্দীদের প্রতি তাকিয়ে বললেনঃ 'প্রতিটি মুসলমানের উচিত আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহর মাথায় চুম্বন করা এবং আমিই তার সূচনা করছি।' এই বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় চুম্বন করলেন। (দ্রষ্টব্যঃ হায়াতুস সাহাবা—১/৩০২, আল-ইসাবা-২/২৯৬-৯৭, আল-ইসতিয়ার, সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা—১/৫১-৫৬, উসুদুল গাবাহ্-৩/১৪৩)

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে বনী জুজাইমা গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য পাঠান। ভুল বুঝাবুঝির কারণে খালিদ তাদের ওপর আক্রমণ চালান এবং তাদের বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। এ ঘটনায় রাসূল (সা) মর্মাহত হন। তিনি নিহত ব্যক্তিদের

ক্ষতিপূরণ দান করেন এবং খালিদকেও ক্ষমা করে দেন। ইবন ইসহাক বলেন, এ ব্যাপারে খালিদকে নিন্দামন্দ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ আস্-সাহমী আদেশ দিয়েছিলেন বলেই আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ যদি তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ তোমাকে দিয়েছেন।' (সীরাতু ইবন হিশাম—২/৪৩০)

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরের ওপর বসে ঘোষণা করেন, "আমি এখানে বসে থাকাকালীন তোমাদের যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রশ্ন করলে তার জবাব দেওয়া হবে।" আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আমার পিতা কে?' রাসূলুল্লাহ (সা) 'বললেন, তোমার পিতা হুজাফাহ।' (আল-ইসাবা—২/২৯৬) তাঁর মা একথা শুনে বলেন, 'তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কী মারাত্মক প্রশ্নই না করেছিলে। আল্লাহ না করুন, তিনি যদি অন্য কিছু বলতেন, আমার অবস্থা কেমন হতো?'

আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, "আমি আমার নসবের সত্যতা যাচাই করছিলাম। তিনি যদি আমাকে কোন হাবশী দাসের সাথে সম্পৃক্ত করতেন, আমি তা মেনে নিতাম।"
(আল-ইসতিয়াব)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ থেকে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বুখারী বর্ণনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য যাঁরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা হলেন—আবু ওয়ায়িল, সুলাইমান ও ইবন ইয়াসার।

ইবন ইউনুস বলেন, আবদুল্লাহ মিসর অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন এবং হযরত উসমানের খিলাফতকালে মিসরেই ইনতিকাল করেন। তিনি মিসরেই সমাহিত হন। (আল-ইসাবা—২/২৯৬)

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কিছু সাহায্য চাইলো। তিনি দান করলেন। তারপর আরেক ব্যক্তি চাইলো। তিনি অঙ্গীকার করলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, আমি দিয়েছি। আবার চাওয়া হয়েছে, আবারো দিয়েছি। তারপর আবার চাওয়া হয়েছে, অঙ্গীকার করেছি।" মনে হলো, তাঁর কথাটি রাসূলুল্লাহর (সা) পছন্দ হলোনা। আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ, তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি খরচ করুন, 'আরশের অধিকারী যিনি তার কাছে স্বল্পতার আশংকা করবেন না।" রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আমাকে একথারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

(হায়াতুস সাহাবা—২/১৪৫)

ইবন আসাকির যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো, 'তিনি একজন রসিক ও হাস্য-কৌতুকপ্রিয় মানুষ।' তিনি বললেন, "তার কথা ছেড়ে দাও। কারণ, তার একটি বড় পেট আছে। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বড় ভালোবাসে।"

(হায়াতুস সাহাবা—২/৩২১)

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)

নাম খাব্বাব, কুনিয়াত আবু 'আবদিল্লাহ, পিতার নাম আরাত। তাঁর বংশ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, তিনি বনু তামীম, আবার কেউ বলেছেন, বনু খুযা'য়া গোত্রের সন্তান। তবে সহীহ মতানুযায়ী তিনি বনু তামীম গোত্রের সন্তান। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫৪) শৈশবে তিনি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর দাসত্বের কাহিনী ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

বনু খুযা'য়া গোত্রের উম্মু আনমার নাম্নী এক মহিলা মক্কার দাস কেনা-বেচার বাজারে গেল। তার উদ্দেশ্য, সে সুস্থ ও তাজা-মোটা দেখে এমন একটি দাস কিনবে, যে তার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে পারবে। বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে আনীত দাসদের চেহারা সে গভীরভাবে দেখতে লাগলো। অবশেষে সে একটি কিশোর দাস নির্বাচন করলো, যে তখনও যৌবনে পদার্পণ করেনি। তবে দাসটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। চোখে-মুখে তার বুদ্ধিমত্তার ছাপ। আর এটা দেখেই সে তাকে চয়ন করেছে। দাম মিটিয়ে কিশোর দাসটিকে সে সংগে নিয়ে চললো।

কিছুদূর যাওয়ার পর উম্মু আনমার দাসটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলোঃ

—বৎস, তোমার নাম কি?

—খাব্বাব।

—আব্বার নাম?

—আল-আরাত।

—তোমার জন্মভূমি কোথায়?

—নাজ্‌দ।

—তাহলে তুমি আরবের অধিবাসী?

—হাঁ, বনু তামীমের সন্তান।

—তুমি মক্কার এ দাসের আড়তে এলে কিভাবে?

—আরবের কোন এক গোত্র আমাদের গোত্রের উপর আক্রমণ করে গৃহপালিত পশু-পাখি লুট করে নিয়ে যায়, পুরুষদের হত্যা করে এবং নারী-শিশুদের বন্দী করে দাসে পরিণত করে। আমি সেই বন্দী শিশুদের একজন। তারপর হাত বদল হয়ে মক্কায় পৌঁছেছি এবং বর্তমানে আপনার হাতে।

উম্মু আনমার তার দাসটিকে তরবারি নির্মাণের কলা-কৌশল শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মক্কার এক কর্মকারের হাতে সোপর্দ করলো। অল্প দিনের মধ্যে এ বুদ্ধিমান দাস তরবারি নির্মাণ শিল্পে দক্ষ হয়ে ওঠে। উম্মু আনমার একটি দোকান ভাড়া নিয়ে কর্মকারের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করে তাকে তরবারি তৈরীর কাজে লাগিয়ে দেয়।

তাঁর সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারি এবং তরবারি তৈরীর দক্ষতার কথা অল্প দিনের মধ্যে মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ তাঁর নির্মিত তরবারি খরীদের জন্য তাঁর দোকানে ভীড় জমাতে থাকে।

তরুণ হওয়া সত্ত্বেও খাব্বাব লাভ করেছিলেন বয়স্কদের বুদ্ধিমত্তা ও বৃদ্ধদের জ্ঞান। তিনি কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে জাহিলী সমাজ যে বিপর্যয়ের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত সে সম্পর্কে আপন মনে ভাবতেন। তিনি ভাবতেন, কী মারাত্মক মূর্খতা ও ভ্রান্তির মধ্যেই না গোটা আরব জাতি হাবুডুবু খাচ্ছে এবং যার এক নিকৃষ্ট বলি সে নিজেই। তিনি চিন্তা করতেন, অবচেতন মনে মাঝে মাঝে বলতেন, এই রাত্রির শেষ অবশ্যই আছে। এই শেষ দেখার জন্য মনে মনে তিনি দীর্ঘায়ু কামনা করতেন।

দীর্ঘদিন খাব্বাবকে অপেক্ষা করতে হলো না। তিনি শুনতে পেলেন, বনু হাশিমের এক যুবক মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহর মুখ থেকে নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি ছুটে গেলেন। তাঁর কথা শুনলেন এবং সেই জ্যোতি অবলোকন করলেন। সাথে সাথে হাত বাড়িয়ে উচ্চারণ করলেনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এভাবে তিনি হলেন বিশ্বের ষষ্ঠ মুসলমান। এ কারণে তাঁকে 'সাদেসুল ইসলাম' বলা হয়। অবশ্য মুজাহিদ বলেনঃ সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর যথাক্রমেঃ আবু বকর, খাব্বাব, সুহাইব, বিলাল, 'আম্মার ও আম্মারের মা সুমাইয়্যা ইসলামের ঘোষণা দেন। এই বর্ণনা মতে খাব্বাব তৃতীয় মুসলমান। (উসুদুল গাবা-২/৯৮, আল-ইসাবা-১/৪১৬) হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, খাব্বাব তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন।

এখন থেকে খাব্বাবের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হলো। আর তা হলো সত্যের জন্য হাসিমুখে যুলুম-অত্যাচার সহ্য করা ও সত্যের প্রচারে জীবন বাজি রাখার অধ্যায়। খাব্বাব তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা কারো কাছে গোপন করলেন না। অল্প সময়ের মধ্যে এ খবর তাঁর মনিব উম্মু আনমারের কানে পৌঁছলো। ক্রোধে সে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। সে তার ভাই সিবা' ইবন 'আবদিল 'উযযাসহ বনী খুযা'য়ার একদল লোক সংগে করে খাব্বাবের কাছে গেল। তিনি তখন গভীর মনোযোগের সাথে কাজে ব্যস্ত। একটু এগিয়ে গিয়ে সিবা' বললোঃ

—তোমার সম্পর্কে আমরা একটি কথা শুনেছি, আমরা তা বিশ্বাস করিনি।

—কি কথা?

—শুনেছি, তুমি নাকি ধর্মত্যাগ করে বনী হাশিমের এক যুবকের অনুসারী হয়েছো?

—আমি ধর্মত্যাগী হইনি, তবে লা শরীক এক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। তোমাদের মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

খাব্বাবের কথাগুলি তাদের কানে পৌঁছার সাথে সাথে তারা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাত দিয়ে কিল-ঘুষি ও পা দিয়ে পিষতে শুরু করলো। তাঁর দোকানের সব হাতুড়ি, লোহার পাত ও টুকরা তাঁর ওপর ছুঁড়ে মারলো। খাব্বাব সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, দেহ তাঁর রক্তে রঞ্জিত হলো।

অন্য এক দিনের ঘটনা। কুরাইশদের কতিপয় ব্যক্তি তাদের অর্ডার দেওয়া তরবারি নেওয়ার জন্য খাব্বাবের বাড়ীতে গেল। খাব্বাব তরবারি তৈরী করে মক্কায় বিক্রি করতেন এবং বাইরেও চালান দিতেন। ব্যস্ততার কারণে তিনি খুব কম সময়ই বাড়ী থেকে অনুপস্থিত থাকতেন। কিন্তু তারা খাব্বাবকে বাড়ীতে পেলনা। তারা তাঁর অপেক্ষায় থাকলো। কিছুক্ষণ পর খাব্বাব বাড়ীতে এলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে একটা উজ্জ্বল প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তিনি আগত লোকদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বসলেন। তারা জিজ্ঞেস করলোঃ খাব্বাব, তরবারিগুলি কি বানানো হয়েছে?

খাব্বাবের চোখে মুখে একটা খুশীর আভা। আপন মনে তিনি কী যেন ভাবছেন। এ সময় অবচেতনভাবে বলে উঠলেনঃ 'তাঁর ব্যাপারটি বড় অভিনব ধরনের।'

সাথে সাথে লোকগুলি প্রশ্ন করলোঃ তুমি কার কথা বলছো? আমরা তো জানতে চাচ্ছি, তরবারিগুলি বানানো হয়েছে কিনা।

তাদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে খাব্বাব বললেনঃ

—তোমরা কি তাঁকে দেখেছো? তাঁর কোন কথা কি তোমরা শুনেছো?

তারা বিস্ময়ের সাথে একজন আরেকজনের দিকে তাকালো। তাদের একজন একটু রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলোঃ তুমি কি তাকে দেখেছো?

খাব্বাব একটু হেঁয়ালীর মত প্রশ্ন করলেনঃ তুমি কার কথা বলছো?

উত্তেজিত কণ্ঠে লোকটি জবাব দিলঃ তুমি যার কথা বলছো, আমি তার কথাই বলছি।

সত্য প্রকাশের এ সুযোগটুকু খাব্বাব ছাড়লেন না। তিনি বললেনঃ হাঁ, তাঁকে আমি দেখেছি এবং তাঁর কথাও শুনেছি। আমি দেখেছি, সত্য তাঁর চতুর্দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, নূর তাঁর মুখের মধ্যে দীপ্তিমান হয়ে উঠছে।

আগত লোকেরা এখন বিষয়টি বুঝতে শুরু করলো। তাদের একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ
—ওহে উম্মু আনমারের দাস! তুমি কার কথা বলছো? শান্তভাবে খাব্বাব জবাব দিলেনঃ
—আমার আরব ভায়েরা, তিনি আর কে, তোমাদের কাওমের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কে আছেন যার চতুর্দিক থেকে সত্য প্রবাহিত, যার মুখে নূরের আভা দীপ্তিমান?
—আমাদের ধারণা, তুমি মুহাম্মাদের কথাই বলছো। খাব্বাব মাথাটি একটু দুলিয়ে উৎফুল্লভাবে বললেনঃ
—হাঁ, তিনিই আমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন।

এ কথাগুলি উচ্চারণের পর তাঁর মুখ থেকে আর কি বেরিয়েছিল, অথবা তাকে কী বলা হয়েছিল, তিনি তা জানেন না। যতটুকু মনে আছে, কয়েক ঘন্টা পর যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, দেখলেন সেই লোকগুলি নেই। তাঁর শরীর ব্যথা-বেদনায় অসাড় এবং সমস্ত শরীর ও পরনের কাপড়-চোপড় রক্তে একাকার। ঘটনাটি তাঁর বাড়ীর সামনেই ঘটলো। তিনি কোনো মতে উঠে বাড়ীর ভেতরে গেলেন, আহত স্থানে পট্টি লাগিয়ে নতুন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৩০)

এভাবে হযরত খাব্বাব দ্বীনের খাতিরে যুলুম-অত্যাচারের শিকার মানুষদের মধ্যে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী হলেন। দরিদ্র ও দুর্বল হওয়া সত্বেও যাঁরা কুরাইশদের অহমিকা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন খাব্বাব তাঁদের এক প্রধান পুরুষ।

শুকনো পাতার আগুনের মত খাব্বাবের নতুন দ্বীন গ্রহণ এবং তাঁর শাস্তি ভোগের কথা মক্কার অলি-গলিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। খাব্বাবের দুঃসাহসে মক্কাবাসীরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। ইতোপূর্বে তারা একথা আর কক্ষণো শোনেনি যে, কেউ মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে এভাবে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জের সুরে মানুষের সামনে তা ঘোষণা করেছে।

খাব্বাবের ব্যাপারটি কুরাইশ নেতাদের নাড়া দিল। উম্মু আনমারের নাম-গোত্র ও সহায় সম্বলহীন এ দাস কর্মকারটি-যে এভাবে তাদের ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবী ও পিতৃ-পুরুষের ধর্মের নিন্দে-মন্দের আস্পর্ধা ও দুঃসাহস দেখাবে, তা তাদের ধারণায় ছিল না। তারা মনে করলো, এমন পিটুনির পর সে হয়তো শান্ত হয়ে যাবে, কক্ষণো আর এমন বোকামী করবে না।

কুরাইশদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। বরং উল্টো ফল ফললো। খাব্বাবের এই দুঃসাহসে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সাহস বেড়ে গেল। প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দেওয়ার জন্য তারাও উৎসাহী হয়ে পড়লো। একের পর এক তারা সত্যের কালেমা ঘোষণা করতে শুরু করলো।

আবু সুফইয়ান ইবন হারব, ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা, আবু জাহল প্রমুখ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কা'বার চত্বরে সমবেত হলো। তারা মুহাম্মাদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলো। তারা দেখলো, তাঁর বিষয়টি দিন দিন, এমনকি ঘন্টায় ঘন্টায় বৃদ্ধি ও গুরুত্ব লাভ করে চলেছে। তারা বিষয়টি আর বাড়তে না দিয়ে এখনই মূলোৎপাটনের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নিলঃ আজ থেকে প্রতিটি গোত্র, সেই গোত্রের মুহাম্মাদের অনুসারীদের ওপর যুলুম-অত্যাচার চালাতে শুরু করবে। এতে হয় তারা তাদের নতুন দ্বীন ত্যাগ করবে, না হয় মৃত্যুবরণ করবে।

সিবা' ইবন আবদিল 'উয্যা ও তার গোত্রের ওপর খাব্বাবকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব অর্পিত হলো। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে মাটি যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠতো, তারা খাব্বাবকে মক্কার উপত্যকায় টেনে আনতো। তাঁর শরীর সম্পূর্ণ উদোম করে লোহার বর্ম পরাতো। প্রচণ্ড গরমে পিপাসায় তিনি কাতর হয়ে পড়তেন, তবুও এক ফোঁটা পানি দেওয়া হতো না। দারুণ পিপাসায় তিনি যখন ছটফট করতে থাকতেন, তারা তাঁকে বলতোঃ

—মুহাম্মাদ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?

বলতেনঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অন্ধকার থেকে আলোয় নেওয়ার জন্য সত্য ও সঠিক দ্বীন সহকারে তিনি আমাদের নিকট এসেছেন।

তারা আবারো মারপিট করতো ও কিল-ঘুষি মারতো। তারপর জিজ্ঞেস করতোঃ

—লাত ও 'উয্যা সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? বলতেনঃ ক্ষতি বা কল্যাণের কোন ক্ষমতা এ দু'টি বোবা-বধির মূর্তির নেই।

তারা আবার পাথর আগুনে গরম করে সেই পাথরের ওপর তাঁকে শুইয়ে দিত। খাব্বাব বলেনঃ একদিন তারা আমাকে ধরে নিয়ে গেল। তারা আগুন জ্বালিয়ে পাথর গরম করলো এবং সেই পাথরের ওপর আমাকে শুইয়ে দিয়ে একজন তার একটি পা আমার বুকের ওপর উঠিয়ে ঠেসে ধরে রাখলো। (হায়াতুস, সাহাবা-১/২৯২) এভাবে তিনি শুয়ে থাকতেন, আর তাঁর দু' কাঁধের চর্বি গলে বেয়ে পড়তো। ইমাম শা'বী বলেন, তাঁর পিঠের মাংস উঠে যেত।

তাঁর মনিব উম্মু আনমার তার ভাই সিবা' অপেক্ষা হিংস্রতায় কোন অংশে কম ছিল না। একদিন নবী মুহাম্মাদকে (সা) খাব্বাবের দোকানে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে দেখে সে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গেল। সে একদিন পর পর খাব্বাবের দোকানে আসতো এবং খাব্বাবের হাপরে লোহার পাত গরম করে তাঁর মাথায় ঠেসে ধরতো। তীব্র যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে করতে চেতনা হারিয়ে ফেলতেন।

একদিন যখন লোহা গরম করে খাব্বাবের মাথায় ঠেসে ধরা হচ্ছে, ঠিক সেই সময় ঐ পথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কোথাও যাচ্ছিলেন। খাব্বাবের এ অবস্থা দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর কী-ই বা করার ক্ষমতা ছিল? খাব্বাবের জন্য দু'আ ও তাঁকে কিছু সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া তিনি আর কিছুই করতে পারলেন না। দু'হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেনঃ 'আল্লাহুম্মা উনসুর খাব্বাবান—হে আল্লাহ্, খাব্বাবকে আপনি সাহায্য করুন।' (রিজালুন হাওলার রাসূল-৩৩১)

উম্মু আনমারের প্রতি খাব্বাবের বদ-দু'আ আল্লাহ্ পাক কবুল করেছিলেন। তিনি স্বচক্ষে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পূর্বেই তার ফল দেখতে পান। উম্মু আনমারের মাথায় অকস্মাৎ এমন যন্ত্রণা শুরু হয় যে, সে সব সময় কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। তার ছেলেরা চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে গেল। সব ডাক্তারই বললোঃ এ যন্ত্রণা নিরাময়ের কোন ঔষধ নেই। তবে লোহা আগুনে গরম করে মাথায় সেক দিলে একটু উপশম হতে পারে। লোহার পাত গরম করে তার মাথায় সেক দেওয়া শুরু হলো।

খলীফা হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে একদিন খাব্বাব গেলেন তাঁর কাছে। খলীফা অত্যধিক সমাদরের সাথে তাঁকে একটা উঁচু গদির ওপর বসিয়ে বললেনঃ একমাত্র বিলাল ছাড়া এই স্থানে বসার জন্য তোমার থেকে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেউ নেই। খাব্বাব বললেনঃ তিনি আমার সমান হতে পারেন কেমন করে? মুশরিকদের মধ্যেও তাঁর অনেক সাহায্যকারী ছিল; কিন্তু এক আল্লাহ্ ছাড়া আমার প্রতি সমবেদনা জানানোর আর কেউ ছিল না। কুরাইশদের হাতে তিনি যে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, খলীফা তা জানতে চাইলেন। কিন্তু খাব্বাব তা জানাতে সংকোচ বোধ

করলেন। খলীফার বার বার পীড়াপীড়িতে তিনি চাদর সরিয়ে নিজের পিঠটি আলগা করে দিলেন। খলীফা তাঁর পিঠের বীভৎস রূপ দেখে আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করেন; এ কেমন করে হলো?

খাব্বাব বললেনঃ পৌত্তলিকরা আগুন জ্বালালো। যখন তা অঙ্গারে পরিণত হলো, তারা আমার শরীরের কাপড় খুলে ফেললো। তারপর তারা আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিল। আমার পিঠের হাড় থেকে মাংস খসে পড়লো। আমার পিঠের গলিত চর্বিই সেই আগুন নিভিয়ে দেয়। এ ঘটনায় তাঁর পিঠের চামড়া শ্বেতী-রোগীর মত হয়ে গিয়েছিল। (হায়াতুস সাহাবা-১/২৯২, মুসতাদরিক, সীরাতু ইবন হিশাম, টীকা-১/৩৪৩)

দৈহিক নির্যাতনের সাথে সাথে কুরাইশরা তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও উপহাস করতো। তাঁর পাওনা অর্থও তাঁরা আত্মসাৎ করে ফেলতো। ইবন ইসহাক বলেনঃ 'আস ইবন ওয়ায়িল আস-সাহ্মী নামক মক্কার এক কাফির তাঁর নিকট থেকে কিছু তরবারি খরিদ করে এবং এ বাবদ কিছু অর্থ তার কাছে বাকী থাকে। খাব্বাব পাওনা অর্থের তাগাদায় গেলেন। সে বললোঃ ওহে খাব্বাব, তোমাদের বন্ধু মুহাম্মাদ—যার দ্বীনের অনুসারী তুমি—সে কি এমন ধারণা পোষণ করেনা যে, জান্নাতের অধিবাসীরা স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র অথবা চাকর-বাকর যা চাইবে লাভ করবে? খাব্বাব বললেনঃ হাঁ, করেন। সে বললোঃ খাব্বাব কিয়ামত পর্যন্ত একটু সময় দাও, আমি সেখানে গিয়ে তোমার পাওনা পরিশোধ করবো। আল্লাহর কসম, তোমার বন্ধু মুহাম্মাদ ও তুমি আমার থেকে আল্লাহর বেশী প্রিয়পাত্র নও। তোমরা আমার থেকে বেশী সৌভাগ্যও লাভ করতে পারবে না। এ ঘটনার পর আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল করেনঃ "তুমি কি লক্ষ্য করেছ সেই ব্যক্তিকে, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, 'আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? কক্ষণোই নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখবো এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকবো। আর সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একাকী।" (সূরা মরিয়ামঃ ৭৭-৮০)

একদিন খাব্বাব তাঁর মত আরো কতিপয় নির্যাতিত বন্ধুর সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বললেন। খাব্বাব বলেনঃ আমরা যখন আমাদের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বললাম, তখন তিনি একটি ডোরাকাটা চাদর মাথার নীচে দিয়ে কা'বার ছায়ায় শুয়ে ছিলেন। আমরা বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমা চাইবেন না?

আমাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তিনি ওঠে বসলেন। তারপর বললেনঃ "তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক লোককে ধরে গর্ত খুঁড়ে তার অর্ধাংশ পোতা হয়েছে, তারপর করাত দিয়ে মাথার মাঝখান থেকে ফেঁড়ে ফেলা হয়েছে। লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের হাড় থেকে গোশত ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তবুও তাদের দ্বীন থেকে তারা বিন্দুমাত্র টলেনি। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। এমন একদিন আসবে যখন একজন পথিক 'সান'আ' থেকে 'হাদরামাউত' পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। এই দীর্ঘ ভ্রমণে সে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় করবে না। তখন নেকড়ে মেষপাল পাহারা দেবে। কিন্তু তোমরা বেশী অস্থির হয়ে পড়ছো' (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৩১, উসুদুল গাবা-২/৯৮)

খাব্বাব ও তাঁর বন্ধুরা মনোযোগ সহকারে রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী শুনলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে পরিমাণ সবর ও কুরবাণী—ধৈর্য ও ত্যাগ পছন্দ করেন, তাঁরা তা করবেন। এভাবে তাঁদের ঈমান আরো মজবুত হয়ে যায়।

উম্মু আনমার খাব্বাবকে আযাদ করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চলতে থাকে। ইমাম শা'বী বলেন, 'শত নির্যাতনের মুখেও খাব্বাব ধৈর্য ধারণ করেন। কাফিরদের অত্যাচারে তাঁর শিরদাঁড়া একটুও দুর্বল হয়ে পড়েনি।' মক্কায় অবস্থানকালে তিনি তাঁর সবটুকু সময় ইবাদাত ও তাবলীগে দ্বীনের কাজে ব্যয় করতেন। মক্কায় তখনও যারা ভয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেনি, তিনি গোপনে তাদের বাড়ীতে যেয়ে যেয়ে কুরআন শিক্ষা দিতেন। হযরত উমারের (রা) বোন-ভগ্নিপতি ফাতিমা ও সা'ঈদকে তিনি গোপনে কুরআন শিক্ষা দিতেন। যেদিন হযরত রাসূলে কারীমকে হত্যার উদ্দেশ্যে 'উমার (রা) বের হলেন এবং পথে নু'য়াইম ইবন আবদিল্লাহর নিকট তাঁর বোন-ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে তাদের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন, সেদিন সেই সময় খাব্বাব (রা) তাদের কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। 'উমারের (রা) উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি ফাতিমার বাড়ীর এক কোণে আত্মগোপন করেন। অতঃপর 'উমারের (রা) মধ্যে কুরআন পাঠের পর ভাবান্তর সৃষ্টি হলে তিনি যখন বললেন, তোমরা আমাকে মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে চল, তখন খাব্বাব গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি 'উমারকে (রা) বলেনঃ ওহে উমার, আমি আশা করি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নবীর দু'আ কবুল হয়েছে। গতকাল আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) দু'আ করতে শুনেছিঃ 'হে আল্লাহ, তুমি আবুল হাকাম অথবা উমার ইবনুল খাত্তাব—এ দু' ব্যক্তির কোন একজনের দ্বারা ইসলামকে সাহায্য কর।' উমার বললেনঃ খাব্বাব, মুহাম্মাদ এখন কোথায়, আমাকে একটু বল। আমি তাঁর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। খাব্বাব বললেনঃ তিনি এখন সাফা পাহাড়ের নিকটে একটি বাড়ীতে তাঁর কিছু সংগীর সাথে অবস্থান করছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৪৩, ৩৪৫, হায়াতুস সাহাবা-১/২৯৭)

একদিন কুরাইশদের দুই নেতা আকরা' ইবন হাবিস ও উ'য়াইনা ইবন হাসান আল-ফাযারী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে দেখলো, তিনি 'আম্মার, সুহাইব, বিলাল, খাব্বাব প্রমুখ দাস ও দুর্বল মু'মিনদের সাথে বসে আছেন। নেতৃদ্বয় উপস্থিত সকলকে উপেক্ষা করে হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) একটু দূরে ডেকে নিয়ে যেয়ে বললোঃ আরবের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি আপনার কাছে আসে। এই দাসদের সাথে আমরা এক সংগে বসি, আর আরবের লোকেরা তা দেখে যাক, এটা আমাদের আত্ম সম্মানে বাধে। আমরা যখন আপনার কাছে আসি, তাদের একটু দূরে সরিয়ে দেবেন। রাসূল (সা) তাদের কথায় সায় দিলেন। তারা বললো, বিষয়টি তাহলে এখনই লেখাপড়া হয়ে যাক। রাসূল (সা) আলীকে ডেকে কাগজ-কলম আনালেন। খাব্বাব বলেনঃ আমরা তখন একটু দূরে বসে আছি। এমন সময় জিবরীল (আ) এ আয়াতগুলি নিয়ে হাজির হলেনঃ "যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে তাদের তুমি দূরে সরিয়ে দিওনা। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে। আর তা করলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আল আন্‌আমঃ ৫২-৫৩)

খাব্বাব বলেন, উপরোক্ত আয়াত নাযিলের সাথে সাথে হযরত রাসূলে কারীম (সা) কাগজ-কলম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাদেরকে কাছে ডাকলেন। আমরা কাছে গেলে তিনি আমাদের সালাম জানালেন। আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসলাম। আর তক্ষুণি আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেনঃ

"তুমি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখবে তাদের সাথে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা।" (সূরা কাহাফ-২৮)

খাব্বাব বলেন, এর পর থেকে আমরা যখনই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বসতাম, আমরা না ওঠা পর্যন্ত তিনি উঠতেন না। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৭৫)

খাব্বাব দীর্ঘকাল মক্কার কুরাইশদের সীমাহীন নির্যাতন ধৈর্যের সাথে সহ্য করে মক্কার মাটি আঁকড়ে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ পাক হিজরাতের অনুমতি দান করেন এবং তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রিজামন্দী-লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি হিজরাত করেছেন। তিনি বলতেন, আমি কেবল আল্লাহর জন্যই রাসূলুল্লাহর সাথে হিজরাত করেছি। মদীনায় আসার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত খিরাশ ইবন সাম্মার সাথে মতান্তরে জিবর ইবন 'উতাইকের সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা দ্বীনী-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। (উসুদুল গাবা-২/৯৯)

মদীনায় আসার পর হযরত খাব্বাবের জীবনে একটু শান্তি ও নিরাপত্তা দেখা দেয়। যে শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে তিনি আজন্ম বঞ্চিত ছিলেন। এখানে তিনি হযরত রাসূলে কারীমের একান্ত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। বদর ও উহুদসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি উম্মু আনমারের ভাই সিবা'র পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এদিন সে হযরত হামযার (রা) হাতে নিহত হয়।

হযরত খাব্বাবের (রা) সারাটি জীবন দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছে। ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী কিছুকাল তরবারি নির্মাণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। জীবনের শেষ ভাগে তাঁর যথেষ্ট সচ্ছলতা আসে। খলীফা হযরত উমার ও হযরত উসমানের খিলাফতকালে যখন সকল সাহাবীর নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে ভাতা নির্ধারিত হয়, হযরত খাব্বাব তখন থেকে মোটা অংকের ভাতা লাভ করেন। তখন প্রচুর অর্থ তাঁর হাতে জমা হয়ে যায়। তবে সেই অর্থের সাথে তাঁর আচরণ ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি তাঁর দিরহাম ও দীনারসমূহ একটি উন্মুক্ত স্থানে রেখে দেন। অভাবগ্রস্ত ও ফকীর মিসকীনরা সেখান থেকে ইচ্ছামত নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে নিয়ে যেত। এজন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন হতো না। এতকিছু সত্বেও এ চিন্তা করে তিনি সব সময় ভীত ছিলেন যে, হয়তো আল্লাহ তাঁর এ সম্পদের হিসাব চাইবেন এবং এ জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তাঁর সংগী-সাথীদের একটি দল বলেন ঃ "আমরা খাব্বাবের অন্তিম রোগ শয্যায় তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি তাঁর জরাজীর্ণ ঘরের একদিকে ঈঙ্গিত করে আমাদের বললেন ঃ এই স্থানে আশি হাজার দিরহাম আছে। আল্লাহর কসম, কক্ষণো স্থানটির মুখ বন্ধ করিনি এবং কোন সায়েলকেও তা থেকে গ্রহণ করতে নিষেধ করিনি। একথা বলে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বন্ধুরা তাঁকে বললেন ঃ আপনি কাঁদছেন কেন? বললেন ঃ আমার সঙ্গীরা দুনিয়াতে তাদের কাজের কোন প্রতিদান না নিয়ে চলে গেছে। আমি বেঁচে আছি এবং এত সম্পদের মালিক হয়েছি। আমার ভয় হয়, এই সম্পদ আমার সৎকাজের প্রতিদান কিনা। আর এজন্যই আমি অস্থির হয়ে কাঁদি। তারপর তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, যখন তিনি নিজের জন্য ক্রয় করা দামী কাফনের দিকে ইঙ্গিত করে একথাগুলি বললেন ঃ তোমরা দেখ, এই আমার কাফনের কাপড়। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত হামযা উহুদে শাহাদাত বরণ করলে তাঁর কাফনের জন্য একটি চাদর ছাড়া আর কোন কাপড় পাওয়া গেল না। সেই চাদর দিয়ে তার মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়ছিল।"

হিজরী ৩৭ সনে তিনি কূফায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। চিকিৎসা সত্বেও রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি মাঝে মাঝে বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যদি মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি মৃত্যুর জন্য দু'আ করতাম। (আল-ইসাবা-১/৪১৬, উসুদুল গাবা-২/৯৯) তাঁর মৃত্যুর সন, স্থান ও মৃত্যুকালে বয়স সম্পর্কে সীরাত লেখকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী হিজরী ৩৯ সনে সিফফীন যুদ্ধের পর ৭২ বছর বয়সে কূফায় ইনতিকাল করেন। অসুস্থতার কারণে সিফফীন যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। হযরত আলী (রা) সিফফীন যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পান এবং

তিনিই নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। কূফাবাসীরা সাধারণতঃ শহরের ভেতরেই মৃতদের দাফন করতো। মৃত্যুর পূর্বে হযরত খাব্বাব অসিয়াত করে যান, তাঁকে যেন শহরের বাইরে দাফন করা হয়। তাঁর অসিয়াত মুতাবিক তাঁকে কূফা শহরের বাইরে দাফন করা হয়। কূফা শহরের বাইরে দাফনকৃত প্রথম সাহাবী তিনি। (উসুদুল গাবা-২/১০০)

হযরত খাব্বাবকে দাফন করার পর আমীরুল মুমিনীন আলী (রা) তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেনঃ "আল্লাহ খাব্বাবের ওপর রহম করুন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ব্যাকুলভাবে, হিজরাত করেন অনুগত হয়ে এবং জীবন অতিবাহিত করেন মুজাহিদ রূপে। যারা সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের ব্যর্থ করেন না।"

হযরত খাব্বাবের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) কথা ও কাজ জানার প্রবল ঔৎসুক্য ছিল। কখনও কখনও রাসূলুল্লাহর (সা) অজ্ঞাতসারে রাত জেগে জেগে তাঁর ইবাদাতের কায়দা-কানুন দেখতেন এবং সকাল বেলা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। একবার রাসূল (সা) সারারাত নামায পড়লেন, আর তিনি চুপিসারে তা দেখলেন। সকালে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। গত রাতে আপনি এমন নামায পড়েছেন যা এর আগে আর কখনও পড়েননি। তিনি বললেনঃ হাঁ, এটা ছিল আশা ও ভীতির নামায, আমি আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছিলাম, দু'টি দান করেছেন ; কিন্তু একটি দেননি। একটি ছিল, আল্লাহ যেন আমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন। এটা কবুল করেছেন। আরেকটি ছিল, বিজাতীয় কোন শত্রুকে যেন আমার উম্মাতের উপর বিজয়ী না করেন। এটাও আল্লাহ কবুল করেছেন। তৃতীয়টি ছিল, আমার উম্মাতের একদলের হাতে অন্যদল যেন নিষ্ঠুরতার শিকার না হয়। এটা কবুল হয়নি। (উসুদুল গাবা-২/৯৯)

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) তেত্রিশটি (৩৩) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তিনটি মুত্তাফাক আলাইহি, দু'টি বুখারী ও একটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সাহাবা ও তাবেঈদের মধ্যে যে সকল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা হলেনঃ তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ, আবু উমামা বাহিলী, আবু মা'মার, আবদুল্লাহ ইবন শুখাইর, কায়েস ইবন আবী হাযেম, মাসরূক ইবন আজদা, 'আলকামা ইবন কায়েস প্রমুখ।

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাতের কন্যা বর্ণনা করেছেন। আমার আব্বা একবার জিহাদে চলে গেলেন। বিদায় বেলা আমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি মাত্র ছাগী রেখে বলে গেলেনঃ ছাগীটির দুধ দোহনের প্রয়োজন হলে আহলুস সুফ্ফার লোকদের কাছে নিয়ে যাবে। আমরা ছাগীটি তাদের কাছে নিয়ে গেলাম। আমরা সেখানে রাসূলকে (সা) বসা দেখলাম। তিনি ছাগীটি বেঁধে দুইলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের ঘরের সবচেয়ে বড় পাত্রটি আমার কাছে নিয়ে এস। আমি আটা মাখার পাত্রটি নিয়ে এলাম। তিনি তাতে দুধ দুইলেন এবং তা ভরে গেল। তিনি দুধ ভরা পাত্রটি আমাদের হাতে দিয়ে বললেনঃ নিয়ে যাও, নিজেরা পান করবে, পাড়া-প্রতিবেশীদেরও দেবে। আর যখনই প্রয়োজন হয় ছাগীটি আমার কাছে এনে দুইয়ে নিয়ে যাবে। আমরা প্রায়ই ছাগীটি রাসূলুল্লাহর (সা) হাত দ্বারা দুইয়ে নিয়ে আসতাম। আমার আব্বা জিহাদ থেকে ফিরে এলেন। তিনি যখনই ছাগীটি দুইতে গেলেন, দুধ বন্ধ হয়ে গেল। আমার আম্মা বললেনঃ তুমি ছাগীটি নষ্ট করে দিলে। আগে আমরা এই পাত্র ভরে দুধ পেতাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কে দুইতো? আম্মা বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি বললেনঃ তুমি কি আমাকে তাঁর সমকক্ষ মনে করলে? তাঁর চেয়ে বেশী বরকত বিশিষ্ট হাত আর কার আছে? (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৩৭)

মুগীরা ইবন শু'বা (রা)

নাম আবু 'আবদিল্লাহ মুগীরা, পিতা শু'বা ইবন আবী 'আমের। আবু 'আবদিল্লাহ ছাড়াও আবু মুহাম্মাদ ও আবু 'ঈসা তাঁর কুনিয়াত। বনী সাকীফ গোত্রের সন্তান। তাঁর মা উমামা বিনতু আফকাম বনী নাসর ইবন মুয়াবিয়া গোত্রের কন্যা। হিজরী পঞ্চম সনে খন্দক যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরই মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে অবস্থান করতে থাকেন। (আল-ইসাবা-৩/৪৫২, উসুদুল গাবা-৪/৪০৬, আল-ইসতিয়াব)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে মুগীরার সর্বপ্রথম কখন পরিচয় হয় সে সম্পর্কে একটি ঘটনা বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। মুগীরা বলেন ঃ আমি প্রথম যেদিন রাসূলুল্লাহর সাথে পরিচিত হই, সেদিন আবু জাহল ও আমি মক্কার এক ছোট্ট গলিপথ দিয়ে হাঁটছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হল। রাসূল (সা) আবু জাহলকে বললেন ঃ ইয়া আবাল হাকাম—ওহে আবুল হাকাম ; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে এস। আবু জাহল বললো ঃ ইয়া মুহাম্মাদ ! তুমি কি আমাদের ইলাহ্ বা মা'বুদদের নিন্দামন্দ থেকে বিরত হবে না ? তুমি কি শুধু চাও আমরা সাক্ষ্য দিই যে, তুমি পৌঁছিয়েছ ? তাহলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি পৌঁছে দিয়েছ। আল্লাহর কসম, আমি যদি জানতাম তুমি যা বলছো তা সত্য, তাহলে আমরা তোমার ইত্তেবা বা অনুসরণ করতাম।

রাসূলুল্লাহ (সা) চলে গেলেন। আবু জাহল আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো ঃ আল্লাহর কসম ! আমি নিশ্চিতভাবে জানি, মুহাম্মাদ যা বলে তা সত্য। কিন্তু আমাকে তা গ্রহণ করতে যে জিনিস বাধা দেয় তা হচ্ছে ঃ বনু কুসাই দাবী করলো, হিজাবাহ্ আমাদের। (অর্থাৎ কা'বার চাবি তাদের কাছে থাকে, তাদের অনুমতি ব্যতীত কেউ কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না) আমরা বললাম ঃ হাঁ। তারা বললো ঃ সিকায়াহ্ আমাদের। (হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব) আমরা বললাম ঃ হাঁ। তারা বললো ঃ 'আন-নাদওয়াহ আমাদের।' (পরামর্শ সভার দায়িত্ব) আমরা বললাম ঃ হাঁ। তারপর তারা বললো ঃ 'আল-লিওয়া' (যুদ্ধের পতাকা) আমাদের।' আমরা বললাম ঃ হাঁ। তারা মানুষকে আহার করায়, আমরাও আহার করালাম। এই ব্যাপারে আমরা যখন তাদের সমকক্ষতা অর্জন করলাম, তখন তারা বললো ঃ আমাদের নবী আছে। আল্লাহর কসম, আমি তা মানতে পারিনে। (হায়াতুস সাহাবা ১/৮৪)

তিনি হুদাইবিয়া অভিযানে রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী হয়ে বাইয়াতে রিদওয়ানে শরিক হন। কুরাইশরা মক্কায় প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে। কুরাইশ পক্ষে 'উরওয়া ইবন মাসউদ আস্-সাকাফী রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আলোচনার জন্য আসে। আরবের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী সে কথা বলার মধ্যে মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র দাড়ির দিকে হাত বাড়াতে থাকে। মুসলমানদের নিকট এটা ছিল অমার্জিত আচরণ। মুগীরা তখন সশস্ত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) পেছনে দাঁড়িয়ে। উরওয়ার এরূপ আচরণে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। যখনই 'উরওয়া হাত সম্প্রসারণ করছিল, মুগীরার হাত অবলীলাক্রমে তার তরবারির বাঁটের ওপর চলে যাচ্ছিল। এক সময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিন ধমকের সুরে বললেন ঃ সাবধান ! হাত নিয়ন্ত্রণে রাখ। 'উরওয়া ঘাড় ফিরে তাকালো। তাঁকে চিনতে পেরে বললো ঃ 'ওরে ধোঁকাবাজ ! আমি কি তোর পক্ষে কাজ করিনি ? উল্লেখ্য যে, উরওয়া ছিল মুগীরার চাচা। জাহিলী যুগে মুগীরা কয়েকজন লোককে হত্যা করে। এই উরওয়া ইবন মাসউদ নিহত লোকদের দিয়াত বা রক্তমূল্য আদায় করে। উরওয়া এই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত

করেছিল। (বুখারী ঃ কিতাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ ওয়াল মুসালিহা, উসুদুল গাবা-৪/৪০৬ হায়াতুস সাহাবা-১/১০২)

হুদাইবিয়ার পর তিনি একাধিক অভিযানে অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একটি বিশেষ বাহিনীর সাথে তাঁকে ও আবু সুফইয়ানকে তায়েফে পাঠান। তাঁরা বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেন।

বনী সাকীফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াতের উদ্দেশ্যে মদীনায় এলো। মদীনার উপকণ্ঠে মুগীরা উট চরাচ্ছিলেন, সর্বপ্রথম তাঁর সাথেই সাকীফ গোত্রের লোকদের দেখা হল। মুগীরা তাদের দেখেই রাসূলুল্লাহকে (সা) এ সুসংবাদটি দেওয়ার জন্য দৌড় দিলেন। পথে হযরত আবু বকরের (রা) সাথে দেখা হলে তাঁকে সংবাদটি দিলেন। তিনি মুগীরাকে কসম দিয়ে অনুরোধ করলেন, তুমি আমার আগে রাসূলুল্লাহকে (সা) এ সুসংবাদটি দিওনা। সর্বপ্রথম আমিই রাসূলুল্লাহকে (সা) বিষয়টি অবহিত করতে চাই। মুগীরা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন। আবু বকরই (রা) সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) কানে সুসংবাদটি পৌঁছালেন। তারপর মুগীরা সাকীফ গোত্রের নিকট পৌঁছে ইসলামী কায়দায় কিভাবে রাসূলুল্লাহকে (সা) সালাম করতে হবে তা তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। (হায়াতুস সাহাবা ১/১৮৪)

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর দাফন-কাফনের সময় হাজির ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মরদেহ লোকেরা কবরে নামিয়ে যখন ওপরে উঠে এসেছে, হঠাৎ তিনি ইচ্ছা করে নিজের আংটিটি কবরের মধ্যে ফেলে দিলেন। হযরত আলী (রা) তাঁকে আংটিটি উঠিয়ে আনতে বললেন। তিনি কবরে নেমে রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র পা হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে যখন মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছিল, তিনি কবর থেকে উঠে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সর্বশেষ বিদায়ী ব্যক্তির সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি এ কাজ করেছিলেন। তিনি প্রায়ই মানুষের কাছে গর্বের সাথে বলতেন, আমি তোমাদের সকলের শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। (তাবাকাত)

হযরত রাসূলে কারীমের ওফাতের পর প্রথম দুই খলীফার যুগে অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হযরত আবু বকরের (রা) নির্দেশে সর্বপ্রথম তিনি 'বাহীরা' অভিযানে যান। ইয়ামামার ধর্মত্যাগীদের নির্মূল করার ব্যাপারেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

ভণ্ড নবীদের বিদ্রোহ দমনের পর তিনি ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। 'বুয়াইব' বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী কাদেসিয়ার দিকে অগ্রসর হলে পারস্য সেনাপতি বিখ্যাত বীর রুস্তম আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে মুসলমানদের প্রতিনিধি পাঠানোর অনুরোধ জানায়। তার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে একাধিক দূতের যাতায়াত চললো। সর্বশেষ এ দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত মুগীরার ওপর।

পারসিকরা মুসলিম দূতকে ভীত ও আতঙ্কিত করে তোলার জন্য সেনাপতি রুস্তমের দরবার খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে সজ্জিত করে। পারস্য বাহিনীর সকল অফিসার রেশমের বহুমূল্য পোশাক পরিধান করে। স্বয়ং রুস্তম স্বর্ণখচিত মুকুট মস্তকে ধারণ করে গর্বভরে মঞ্চের ওপর উপবিষ্ট হয়। দামী কার্পেটে সমগ্র দরবার আচ্ছাদিত হয়। হযরত মুগীরা দরবারে পৌঁছে নিঃসংকোচে সোজা মঞ্চের ওপর উঠে রুস্তমের পাশে বসে পড়েন। এমন সাহসিকতার সাথে তাঁকে বসতে দেখে রুস্তমের পারিষদবর্গ ভীষণ বিরক্ত হয়। তারা মুগীরার হাত ধরে টেনে এনে মঞ্চের নীচে বসিয়ে দেয়। মুগীরা বললেন ঃ

"'আমরা আরববাসী, আমাদের সেখানে এক ব্যক্তি খোদা হবে, আর অন্যরা তার পূজা করবে এমন বিধান নেই। আমরা সকলে সমান। তোমরা আমাদের ডেকে এনেছো, আমরা উপযাচক হয়ে এখানে আসিনি। তোমাদের এমন আচরণ কি যুক্তিসম্মত? তোমাদের অবস্থা যদি এমন

থাকে, খুব শিগ্গির তোমরা বিলীন হয়ে যাবে। আমি বুঝলাম, তোমাদের শাসন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তোমাদের পরাজয় অনিবার্য। এমন অবস্থায় এবং এমন বুদ্ধির কোন সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারে না।"

দরবারের নীচ শ্রেণীর লোকেরা মন্তব্য করলো, এই আরবী লোকটি সত্য কথাই বলেছে। ইরানীরা এমন সাম্যের সাথে পরিচিত ছিল না। মুগীরার কথা শুনে তারা একটু দমে গেল। রুস্তমও একটু লজ্জিত হল। সে বললো, এটা চাকর-বাকরদের ভুল। তারপর মুগীরাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে মুগীরার তুনীর থেকে তীর বের করে রসিকতার সুরে জিজ্ঞেস করে, 'এ দিয়ে কী হবে?' মুগীরা জবাব দিলেন ঃ 'স্ফুলিঙ্গ ক্ষুদ্র হলেও তা আগুন।' রুস্তম এবার মুগীরার তরবারির দিকে ইঙ্গিত করে বলে, 'তোমার এই তলোয়ারটি তো অনেক পুরনো।' মুগীরা বললেন, 'বাঁট পুরনো হলেও ধার আছে।' এরপর মূল বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়।

রুস্তম স্বজাতির শৌর্য বীর্য, শক্তি ও ক্ষমতা এবং আরবদের তুচ্ছতা ও দারিদ্র্যের উল্লেখ করে বলে, 'তোমরা আমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করে থাকি, তোমাদের বিপদ-আপদও আমরা দূর করে থাকি। তোমরা দেশে ফিরে যাও, তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা আমাদের দেশে প্রবেশে আমরা বাধা দেব না। আর তোমাদের প্রত্যেক সৈনিককে তাদের মর্যাদা অনুসারে আমরা উপঢৌকন দেব।'

মুগীরা বললেন ঃ

"দুনিয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আখিরাত। আল্লাহ আমাদের নিকট একজন নবী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে বলেছেন ঃ যারা আমার দ্বীন গ্রহণ করবে না, আমি তাদের উপর এই দলটিকে বিজয়ী করবো, এদের দ্বারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নেব। তারা যতদিন এই দ্বীন আঁকড়ে থাকবে, আমি তাদের বিজয়ী রাখবো। অপমানিত ব্যক্তিরা এ দ্বীন প্রত্যাখ্যান করবে এবং সম্মানিত ব্যক্তিরা তা আঁকড়ে থাকবে।"

রুস্তম ঃ 'সেই দ্বীন কি?'

মুগীরা ঃ 'সেই দ্বীনের ভিত্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এই কথার শাহাদাত বা সাক্ষ্য এবং আল্লাহর নিকট থেকে যা কিছু এসেছে তার স্বীকৃতি দান।'

রুস্তম ঃ 'এ তো খুব চমৎকার কথা! আর কি?'

মুগীরা ঃ 'মানুষকে মানুষের ইবাদাত বা বন্দেগী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে নিয়ে যাওয়া।'

রুস্তম ঃ 'খুবই চমৎকার কথা! আর কি?'

মুগীরা ঃ 'প্রতিটি মানুষই আদমের সন্তান, প্রত্যেকেই আমরা ভাই-ভাই।'

রুস্তম ঃ 'কী চমৎকার! যদি আমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করি তোমরা কি তোমাদের দেশে ফিরে যাবে?'

মুগীরা ঃ 'আল্লাহর কসম, আমরা ফিরে যাব। তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন প্রয়োজন ছাড়া আমরা তোমাদের দেশের কাছেই ঘেঁষবো না।'

রুস্তম ঃ 'খুবই ভালো কথা!'

বর্ণনাকারী বলেন, মুগীরা বের হয়ে গেলে রুস্তম তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করে। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহ তাদের অকল্যাণ ও লাঞ্ছিত করেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আলোচনার এক পর্যায়ে রুস্তম বলেঃ 'আমরা তোমাদের হত্যা করবো।'
মুগীরা বলেনঃ 'তোমরা আমাদের হত্যা করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করবো, আর আমরা তোমাদের হত্যা করলে তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং তোমরা তখন জিযিয়া দানে বাধ্য হবে।' জিযিয়ার কথা শুনে তারা চিৎকার করে ওঠে।
মুগীরা বলেনঃ 'জিযিয়া' দানে অস্বীকৃত হলে তরবারিই হবে তোমাদের ও আমাদের শেষ ফয়সালা।' এমন কঠোর উত্তরে রুস্তম ক্রোধোন্মত্ত হয়ে পড়ে। সে বলেঃ 'সূর্যের শপথ! আগামীকাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই তোমাদের সেনাবাহিনী নাস্তানাবুদ করে ফেলা হবে।'
মুগীরা বলেনঃ 'নদী পার হয়ে তোমরা আমাদের দিকে যাবে, না আমরা তোমাদের দিকে আসবো?'
রুস্তমঃ 'আমরাই নদী পার হয়ে তোমাদের দিকে যাব।'

এই আলোচনার পর মুগীরা শিবিরে ফিরে আসেন। মুসলিম সৈনিকরা একটু পিছু হটে পারস্য বাহিনীকে নদী পার হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এ যুদ্ধে হযরত মুগীরা অংশগ্রহণ করেন এবং পারস্য বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। (হায়াতুস সাহাবা-১/২২০, ২২২-২৩, ৩/৬৮৭-৯২, তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ-১/২০৯)।

হিজরী উনিশ সনে রায়, কাওমাস ও ইসপাহানবাসীরা শাহানশাহ ইয়াযদিগিরদের সাথে যোগাযোগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষাট হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গড়ে তোলে। হযরত আম্মার বিন ইয়াসির খলীফা উমারকে (রা) বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করেন। বাহিনীসহ খলীফা নিজেই রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার কথা চিন্তা করে সে ইচ্ছা ত্যাগ করেন। তিনি বসরা ও কূফার আমীরদ্বয়কে নির্দেশ দেন, তারা যেন নিজ নিজ বাহিনীসহ নিহাওয়ান্দের দিকে অগ্রসর হয়। তিনি নু'মান ইবন মুকাররিনকে সেনাপতি নিয়োগ করে হিদায়াত দেন, যদি তুমি শহীদ হও, হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান হবে তোমার স্থলাভিষিক্ত। হুজাইফা শহীদ হলে জারীর ইবন আবদিল্লাহ আল বাজালী তার স্থলাভিষিক্ত হবে, আর সে শহীদ হলে মুগীরা ইবন শু'বা পতাকা তুলে ধরবে।

মুসলিম সৈন্যরা নিহাওয়ান্দের নিকটে ছাউনী ফেলার পর ইরানীরা আবারো আলাপ আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে একজন দূত পাঠানোর অনুরোধ জানায়। যেহেতু পূর্বেই একবার সাফল্যের সাথে মুগীরা দৌত্যগিরির দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এ কারণে দ্বিতীয়বার এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকেই নির্বাচন করা হয়। দূত হিসাবে ইরানীদের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, অবস্থা আগের মতই। ইরানী সেনাপতি স্বর্ণখচিত মুকুট পরে মঞ্চে বসে আছে। দরবারের অন্যান্য সিপাহী সান্ত্রীরা চকচকে তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে ভাব-গম্ভীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। সমগ্র দরবার নিস্তব্ধ-নীরব। মুগীরা কারো প্রতি কোন রকম ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা ঢুকে গেলেন। পথে প্রহরীরা বাধা দিতে চাইলো। তিনি তাদের বললেন, 'দূতদের সাথে এমন আচরণ শোভনীয় নয়।' আলোচনা শুরু হল। পারস্য সেনাপতি মারওয়ানশাহ বললো, "তোমরা আরবের অধিবাসী, তোমাদের অপেক্ষা অধিক হতভাগ্য, দারিদ্র্যপীড়িত ও অপবিত্র জাতি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই। আমার সৈনিকরা অনেক আগেই তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতো; কিন্তু তোমরা এত নীচ যে, তোমাদের নাপাক রক্তে আমরা আমাদের তীর রঞ্জিত করতে চাইনি। এখনও তোমরা ফিরে গেলে আমরা তোমাদের ক্ষমা করে দেব। অন্যথায় রণক্ষেত্রে তোমাদের লাশ তোমরা তড়পাতে দেখবে।"

হযরত মুগীরা হামদ ও নাতের পর বললেনঃ "তোমার ধারণা মত নিশ্চয় আমরা এক সময় তেমনই ছিলাম। কিন্তু আমাদের রাসূল (সা) আমাদের 'আদল বা কায়া পাল্টে দিয়েছেন। এখন চতুর্দিকে আমাদের ক্ষেত্র পরিষ্কার। যতক্ষণ রণক্ষেত্রে আমাদের লাশ তড়পাতে না থাকবে, আমরা

তোমাদের সিংহাসন ও মুকুট ছিনিয়ে নেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারিনে।”

দৌত্যগিরি ব্যর্থ হল। উভয়পক্ষে যুদ্ধের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। হযরত মুগীরাকে নিয়োগ করা হল বাম ভাগের দায়িত্বে। নিহাওয়ান্দের এ যুদ্ধে হযরত নু'মান ইবন মুকাররিন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণতে লাগলেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তায় কোন পরিবর্তন হল না। পারস্য বাহিনী পরাজয় বরণ করলো। যুদ্ধ শেষে হযরত মা'কাল দেখতে গেলেন হযরত নু'মান ইবন মুকাররিনকে। তখনও তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল, দৃষ্টিশক্তিও কাজ করছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘কে?’ মা'কাল নিজের পরিচয় দিলেন। নু'মান জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘যুদ্ধের ফলাফল কী?’ মাকাল বললেনঃ ‘আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেছেন।’ তিনি বললেনঃ ‘আল-হামদুলিল্লাহ—সকল প্রশংসা আল্লাহর। উমারকে অবহিত কর।’ এ কথাগুলো বলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিহাওয়ান্দের পর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী পাঠিয়ে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়। হামাদান অভিযানের সার্বিক দায়িত্ব হযরত মুগীরার ওপর অর্পিত হয়। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তিনি হামাদানবাসীদের পরাজিত করে তাদেরকে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি যোগ দেন। এ যুদ্ধে তিনি চোখে মারাত্মক রকম আঘাত পান। (আল-ইসাবা-৩/৪৫৩, উসুদুল গাবা-৪/৪০১)

বসরা শহর পত্তনের পর হযরত 'উমার (রা) তাঁকে সেখানকার ওয়ালী নিয়োগ করেন। তিনি বসরার ওয়ালী থাকাকালীন অনেক নিয়ম-পদ্ধতি চালু করেন। সৈনিকদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম বসরায় একটি পৃথক ‘দিওয়ান’ বা দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। (আল-ইসাবা-৩/৪৫৩) কিছুদিন পর তাঁর চরিত্রের প্রতি মারাত্মক এক দোষারোপের কারণে খলিফা ‘উমার (রা) ওয়ালীর পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন। তদন্তের পরে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। (উসুদুল গাবা-৪/৪০৬) রাসূলুল্লাহর (সা) একজন সাহাবী তাঁর প্রতি আরোপিত জঘন্য অভিযোগ থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় হযরত উমার (রা) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করেন। এ ঘটনার পর হযরত উমার (রা) তাঁকে 'আম্মার ইবন ইয়াসিরের (রা) স্থলে কূফার ওয়ালী নিয়োগ করেন। হযরত উমারের খিলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। হযরত উসমান (রা) তাঁকে উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত করেন। (উসুদুল গাবা—৪/৪০৭)

খলীফা হযরত উসমানকে (রা) তিনি সবসময় সৎ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। ইমাম আহমাদ মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত উসমান যখন গৃহবন্দী তখন মুগীরা একদিন তাঁর কাছে গেলেন। তিনি খলীফাকে বললেন, ‘আপনি জনগণের ইমাম বা নেতা। আপনার ওপর যা আপতিত হয়েছে, তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমি আপনাকে তিনটি পন্থার কথা বলবো, এর যে কোন একটি গ্রহণ করুন। ১. আপনি ঘর থেকে বের হয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করুন। আপনার সে শক্তি ও ক্ষমতা আছে। আপনি আছেন সত্যের ওপর, আর তারা আছে বাতিলের ওপর। ২. আপনি বাড়ীর পেছন দরজা দিয়ে গোপনে বের হয়ে বাহনে আরোহণ করুন এবং সোজা মক্কায় চলে যান। বিদ্রোহীরা সেখানে আপনার কোন ক্ষতি করবে না। ৩. আপনি সিরিয়া চলে যান। কারণ, সেখানে মুয়াবিয়া আছেন। জবাবে খলীফা উসমান বললেনঃ প্রথমতঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) উম্মাতের মধ্যে প্রথম রক্তপাতকারী হতে চাই না। দ্বিতীয়তঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিঃ একজন কুরাইশ ব্যক্তিকে মক্কায় কবর দেওয়া হবে, তার ওপর বিশ্বের অর্ধেক আযাব বা শাস্তি আপতিত হবে। আমি অবশ্যই সেই ব্যক্তি হতে চাই না। তৃতীয়তঃ দারুল হিজরাহ্ ও মুজাবিরাতু রাসূলিল্লাহ— হিজরাতস্থল ও রাসূলুল্লাহর (সা) নৈকট্য (মদীনা) ত্যাগ করে সিরিয়া যেতে আমি ইচ্ছুক নই। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩৯৬)

হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে বিরোধ শুরু হল। প্রথম দিকে হযরত মুগীরা (রা) হযরত আলীর (রা) পক্ষে ছিলেন। তিনি আলীর (রা) খিদমতে হাজির হয়ে সরলভাবে পরামর্শ দেন, "যদি আপনি আপনার খিলাফত শক্তিশালী করতে চান তাহলে তালহা ও যুবাইরকে যথাক্রমে কুফা ও বসরার ওয়ালী নিয়োগ করুন। আর আমীর মুয়াবিয়াকে তার পূর্ব পদে আপাততঃ বহাল রাখুন, তারপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যা ইচ্ছা হয় করবেন।" হযরত আলী (রা) তাঁকে জবাব দেন, "তালহা-যুবাইরের ব্যাপারে ভেবে দেখবো; তবে মুয়াবিয়া যতদিন তার বর্তমান কার্যকলাপ বন্ধ না করবে, আমি তাঁকে না কোথাও ওয়ালী নিযুক্ত করবো, না তার কোন সাহায্যগ্রহণ করবো।" এই জবাবে মুগীরা ক্ষুব্ধ হন। (আল-ইসতিয়াব) হযরত উসমানের (রা) হত্যার পর মুসলিম উম্মাহর দু' বিবদমান পক্ষের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ হয়। তিনি এসব সংঘর্ষ থেকে সযত্নে দূরে থাকেন। সিফ্ফীনের পর দু'মাতুল জান্দালে সালিশী রায় শোনার জন্য তিনিও উপস্থিত ছিলেন। দু'মাতুল জান্দালে সালিশী ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি হযরত মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষে যোগদান করেন এবং তার হাতে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ করেন। এরপর থেকে তিনি প্রকাশ্যে হযরত আলীর (রা) বিরোধিতা শুরু করেন। (আল-ইসাবা ৩/৪৫৩, মুসতাদরিক-৩/৪৫০)।

হযরত মুগীরার (রা) সমর্থন ও সহযোগিতা হযরত মুয়াবিয়ার বিশেষ উপকারে আসে। অনেক বড় বড় সমস্যা তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করে দেন। খিলাফতের ব্যাপারে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সামনে এমনসব কঠিন সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, তখন যদি মুগীরার বুদ্ধি ও মেধা কাজ না করতো তাহলে হযরত মুয়াবিয়াকে অত্যন্ত মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হতে হতো। যিয়াদ ছিলেন আরবের অতি চালাক ও কৌশলী লোকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ। তিনি ছিলেন হযরত আলীর (রা) পক্ষ থেকে পারস্যের ওয়ালী এবং হযরত মুয়াবিয়ার (রা) চরম বিরোধী। হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পর হযরত হাসান (রা) খিলাফতের দাবী থেকে সরে দাঁড়ানোর পর হযরত মুয়াবিয়া (রা) যখন সমগ্র মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র খলীফা, তখনও যিয়াদ তাঁকে খলীফা বলে স্বীকার করেননি। হযরত মুগীরা এমন কট্টর দুশমনকেও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) অনুগত বানিয়ে দেন এবং মুয়াবিয়াকে এক মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

হিজরী ৪১ সনে হযরত আমীর মুয়াবিয়া বিশেষ অবদানের পুরস্কার স্বরূপ হযরত মুগীরাকে কূফার ওয়ালী নিয়োগ করেন। হিজরী ৩৩ সনে কূফার খারেজীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই বিদ্রোহ দমন করেন। এভাবে তিনি হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফত শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেন।

হযরত মুগীরার মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকে বলেছেন, হিজরী ৫০ সনে কূফায় যে প্লেগ দেখা দেয় সেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন হিজরী ৪৯/৫১ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ (সত্তর) বছর।

হযরত মুগীরা (রা) যদিও একজন বিজ্ঞ কূটনীতিক ও সৈনিক ছিলেন, তথাপি দ্বীনী বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। সমবয়সীদের মধ্যে অগাধ জ্ঞানের জন্য তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত (১৩৩)টি হাদীস দেখা যায়। তারমধ্যে ৯টি মুত্তাফাক আলাইহি, একটি বুখারী ও দু'টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ তাঁর তিন পুত্র—'উরওয়া, হামযা, আক্কার এবং অন্যান্যের মধ্যে যুবাইর ইবন ইয়াহয়িয়া, মিসওয়ার ইবন মাখরামা, কায়েস ইবন আবী হাযেম, মাসরূক ইবন আজদা', নাফে' ইবন হুবায়রা, উরওয়া ইবন যুবাইর, 'আমর ইবন ওয়াহ্হাব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

দ্বীনী জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া সত্বেও তিনি ইলম ও ইফতা'র মসনদের পরিবর্তে রাজনীতি ও কূটনীতির জটিল ময়দানে বিচরণ করেন। এ অঙ্গনেই তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

তাঁকে আরবের শ্রেষ্ঠতম কূটনীতিকদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইমাম শা'বী বলেন, আরবের অতি চালাক ব্যক্তি চারজন—মুয়াবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, 'আমর ইবনুল 'আস, মুগীরা ইবন শু'বা ও যিয়াদ। (উসুদুল গাবা-৪/৪০৭, আল ইসাবা ৩/৪৫৩) ইবন সা'দ বলেন, তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার কারণে লোকে তাঁকে 'মুগীরাতুর রায়' মতামত বা সিদ্ধান্তের অধিকারী মুগীরা বলে উল্লেখ করতো। (আল-ইসতিয়াব) এ সকল অসাধারণ গুণের কারণে হযরত উমার (রা) তাঁকে অনেক বড় বড় পদে নিয়োগ করেন। এমন কি ইরানী দরবারে দৌত্যগিরির দুর্লভ সম্মানও অর্জন করেন।

কাবীসা ইবন জাবির বলেন, আমি দীর্ঘদিন মুগীরার সাহচর্যে কাটিয়েছি। তিনি এত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন যে, যদি কোন শহরের এমন আটটি দরজা থাকে যে, তার কোন একটির ভেতর দিয়েও কৌশল ও চাতুর্য ছাড়া বের হওয়া যায় না, মুগীরা তার প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম ছিলেন। জটিল বিষয়ের জট খোলার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাবারী বলেন, কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ব্যক্তকালে তা থেকে সরে আসার পথও বের করে রাখতেন। যখনই কোন দু'টি বিষয় সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়তো, অবশ্যই একটির ব্যাপারে তাঁর সঠিক রায় প্রকাশ পেত। (আল-ইসাবা ৩/৪৫৩)

হযরত মুগীরার চাতুর্য ও কূটনীতির বহু কৌতুকপূর্ণ ঘটনা ইতিহাসে দেখা যায়। হযরত উমার (রা) তাঁকে বাহরাইনের ওয়ালী নিয়োগ করেন। বাহরাইনবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে খলীফার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করে। হযরত উমার তাঁকে বরখাস্ত করেন। তিনি যাতে দ্বিতীয়বার সেখানে ওয়ালীর পদে নিয়োগ না পান সেজন্য সেখানকার দাহকান বা সরদার এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র করে। সে এক লাখ দিরহাম সংগ্রহ করে খলীফার নিকট জমা দিয়ে বলে, 'মুগীরা বাইতুল মাল থেকে এ অর্থ আত্মসাৎ করে আমার কাছে জমা রেখেছিলেন।' হযরত উমার অত্যন্ত কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। বিষয়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক। একদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, অন্যদিকে অসংখ্য লোক তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী, আত্মসাৎকৃত অর্থও উপস্থিত। দোষ প্রমাণের জন্য অতিরিক্ত কোন সাক্ষী-সাবুতের প্রয়োজন নেই। এমন পরিস্থিতিতেও মুগীরা বুদ্ধির ভারসাম্য বজায় রাখেন। অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে তিনি বলেন, দাহকান বা সরদার মিথ্যা বলেছে। আমি তো তার নিকট দু'লাখ জমা রেখেছিলাম, একলাখ সে আত্মসাৎ করেছে।' একথা শুনে 'দাহকান' ভয়ে মুষড়ে পড়ে। এখন তো তাকে দু'লাখই বাইতুল মালে জমা দিতে হবে। সে অকপটে তার কারসাজির কথা স্বীকার করে। বার বার কসম খেয়ে বলতে থাকে, 'মুগীরা আমার কাছে কোন অর্থই জমা রাখেননি।' এভাবে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। মুগীরার দুর্নাম রটানোর জন্য সে মনগড়া কাহিনী তৈরী করেছিল, বিষয়টি মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর হযরত উমার (রা) মুগীরাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি দু'লাখের কথা স্বীকার করলে কেন?' তিনি বললেন, 'সে আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করেছিল, এভাবে ছাড়া তার বদলা নেওয়ার আমার আর কোন উপায় ছিল না'। (আল-ইসাবা ৩/৪৫৩)

প্রখ্যাত সাহাবী নু'মান ইবন মুকাররিন (রা) একবার মুগীরাকে বলেন, 'ওয়াল্লাহি ইন্নাকা লাজু মানাকিব—অর্থাৎ তুমি বুদ্ধিমত্তা, পরামর্শদান ও সঠিক মতামতের অধিকারী ব্যক্তি।' (হায়াতুস সাহাবা—১/৫১২)

আবদুর রহমান ইবন আবী বকর (রা)

তাঁর ইসলাম-পূর্ব যুগের নাম আবদুল কা'বা, মতান্তরে আবদুল 'উয্যা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান। তাঁর ডাক নাম বা কুনিয়াত তিনটিঃ আবু আবদিল্লাহ, তাঁর পুত্র মুহাম্মাদের নামানুসারে আবু মুহাম্মাদ ও আবু 'উসমান। তবে আবু আবদিল্লাহ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পিতা প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও মাতা উম্মু রুমান বা উম্মু রুম্মান। পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সহোদর। (উসুদুল গাবা-৩/৩০৪-৩০৫)

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের সন্তানদের সকলে প্রথম ভাগেই ইসলাম গ্রহণ করলেও আবদুর রহমান দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইসলাম থেকে দূরে থাকেন। বদর যুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের মাঝামাঝি পর্বে তিনি একটু সামনে এগিয়ে এসে মুসলমানদের প্রতি চ্যালেঞ্জের সুরে বললেনঃ 'হাল মিন মুবারিযিন"—আমার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাহস রাখে এমন কেউ কি আছে? তাঁর এ চ্যালেঞ্জ শুনে পিতা হযরত আবু বকরের (রা) চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি তাঁর সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, কিন্তু হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে নিবৃত্ত করেন। উহুদের যুদ্ধেও তিনি মক্কার কুরাইশদের সাথে ছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন কুরাইশদের তীরন্দায বাহিনীর অন্যতম সদস্য। (উসুদুল গাবা-৩/৩০৫) পরবর্তীকালে একদিন আবদুর রহমান পিতা আবু বকরকে (রা) বলেন, উহুদের ময়দানে আমি আপনাকে পেয়েও এড়িয়ে গিয়েছিলাম। জবাবে আবু বকর (রা) বলেন, আমি তোমাকে দেখলে ছেড়ে দিতাম না। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩১৩)

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত আবদুর রহমান ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর মদীনায় হিজরাত করে পিতা আবু বকরের (রা) সাথে বসবাস করতে থাকেন। হযরত আবু বকরের (রা) যাবতীয় কাজ কারবার তিনিই দেখাশুনা করতেন। একবার রাত্রিবেলা হযরত আবু বকর (রা) আসহাবে সুফফার কতিপয় লোককে দাওয়াত করলেন। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে যাচ্ছি, আমার ফিরে আসার পূর্বেই তুমি মেহমানদের খাইয়ে দেবে।' পিতার নির্দেশমত আবদুর রহমান যথাসময়ে মেহমানদের সামনে খাবার হাজির করলেন। কিন্তু তাঁরা মেযবানের অনুপস্থিতিতে খেতে অস্বীকার করলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন হযরত আবু বকর (রা) দেরীতে ফিরলেন। ফিরে এসে যখন জানলেন, মেহমানরা এখনও অভুক্ত রয়েছে, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আবদুর রহমানকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোকে আমি খাবার দেব না।' আবদুর রহমান ভয়ে জড়সড় হয়ে বাড়ীর এক কোণে বসে ছিলেন। একটু সাহস করে তিনি বললেন, 'আপনি মেহমানদের একটু জিজ্ঞেস করুন, আমি তাঁদের খাওয়ার জন্য সেধেছিলাম কিনা।' মেহমানরা আবদুর রহমানের কথা সমর্থন করলেন। তাঁরাও কসম খেয়ে বললেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আবদুর রহমানকে খেতে না দেবেন, আমরা খাবনা।' এভাবে আবু বকরের রাগ প্রশমিত হয় এবং সকলে এক সাথে বসে আহার করেন। আবদুর রহমান বলেন, "সেদিন আমাদের খাবারে এত বরকত হয়েছিল যে, আমরা খাচ্ছিলাম, কিন্তু তা মোটেই কমছিল না। আমি সেই খাবার থেকে কিছু রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বেশ কিছু সাহাবীসহ তা আহার করেন।" (বুখারী)

স্বভাবগত ভাবেই হযরত আবদুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দায। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়, তিনি প্রত্যেকটিতে অংশগ্রহণ করে বীরত্ব ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। খাইবার অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সহযাত্রী হন এবং খাইবারের গনীমাত থেকে চল্লিশ 'ওয়াসাক' খাদ্যশস্য লাভ করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম ২/৩৫২) বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে 'তানয়ীমে' পাঠিয়েছিলেন নতুন করে ইহরাম বাঁধার জন্য। উল্লেখ্য যে, হযরত 'আয়িশা (রা) এ সফরে ঋতুবতী হওয়ার কারণে হজ্জের কিছু অবশ্য পালনীয় কাজ স্থগিত রেখে ইহরাম ভেঙ্গে ফেলেন। সুস্থ হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে 'তানয়ীমে' গিয়ে পুনরায় ইহরাম বেঁধে স্থগিত কাজগুলি সম্পাদন করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬০২)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর আরব উপদ্বীপের চতুর্দিকে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তা দমনে তিনি অন্যাদের সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ভণ্ড-নবী মুসাইলামা আল কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তিনি চরম বীরত্বের পরিচয় দেন। এ যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের সাতজন বিখ্যাত বীরকে একাই হত্যা করেন। ইয়ামামার শত্রুপক্ষের দুর্গের এক স্থানে ফেটে ছোট্ট একটি পথ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম মুজাহিদরা বার বার সেই ছিদ্র পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিল। কারণ, শত্রুপক্ষের মাহকাম ইবন তুফাইল নামক এক বীর সৈনিক অটলভাবে পথটি পাহারা দিচ্ছিল। হযরত আবদুর রহমান তার সিনা তাক করে একটি তীর নিক্ষেপ করেন এবং সেই তীরের আঘাতে সে মাটিতে ঢলে পড়ে। মুসলিম মুজাহিদরা সাথে সাথে মাহকামের সঙ্গীদের পায়ে পিষতে পিষতে ভেতরে প্রবেশ করে দুর্গের দরজা খুলে দেন। এভাবে দুর্গের পতন হয়। হযরত উসমানের শাহাদাতের পর হযরত আলী ও হযরত 'আয়িশার (রা) মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে যে উটের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আবদুর রহমান বোনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। (আল-ইসাবা-২/৪০৮)

•

হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁর জীবদ্দশাতেই পুত্র ইয়াযিদকে স্থলাভিষিক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। তিনি স্বীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে ইয়াযিদের নামে মদীনার জনগণের বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ নেয়ার জন্য মদীনার ওয়ালী মারওয়ানকে নির্দেশ দিলেন। তাঁর এ নির্দেশ মদীনার মসজিদে সমবেত লোকদের পাঠ করে শুনানোর কথাও বললেন। মারওয়ান মুয়াবিয়ার (রা) এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করলেন। তিনি মসজিদে মদীনার জনগণকে সমবেত করে আমীর মুয়াবিয়ার নির্দেশ পাঠ করে শুনালেন। তাঁর পাঠ শেষ হতে না হতেই হযরত আবদুর রহমান ইবন আবী বকর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মজলিসের নীরবতা ভঙ্গ করে গর্জে উঠলেন। "আল্লাহর কসম! তোমরা উম্মাতে মুহাম্মাদীর মতামতের পরোয়া না করে খিলাফতকে হিরাকলী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করছো। এক হিরাকলের মৃত্যু হলে আর এক হিরাকল তার স্থলাভিষিক্ত হবে।" অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, মারওয়ান বলেনঃ এ তো আবু বকর ও উমার প্রবর্তিত পদ্ধতি। আবদুর রহমান প্রতিবাদ করে বলেনঃ না, এটা হিরাকল ও কায়সারের পদ্ধতি। পিতার পর পুত্রকে সিংহাসনে বসানোর পদ্ধতি। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর এবং হুসাইন ইবন আলীও আবদুর রহমানকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। (আল-ইসাবা-২/৪০৮, উসুদুল গাবা-৩/৩০৬)

মারওয়ান তখন অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে আবদুর রহমানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ বন্ধুগণ! এ সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসুস" অর্থাৎ পিতা-মাতার আনুগত্য না করার জন্য আল্লাহ তার নিন্দা করেছেন, সূরা আহকাফ-১৭। উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর হুজরা থেকে তার এ কথা শুনলেন।

তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন ঃ 'আল্লাহর কসম ! না, আবদুর রহমানের শানে নয়। যদি তোমরা চাও, কোন ব্যক্তির শানে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল, আমি তা বলতে পারি। (আল-ইসাবা ৪/৪০৮, উসুদুল গাবা-৩/৩০৬)

হযরত আবদুর রহমান সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন, মুয়াবিয়ার (রা) এ ইচ্ছা পূর্ণ হলে মুসলিম উম্মাহ্ এক মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হবে। তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন, এটা ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা উৎখাত করে মুসলিম উম্মাহর ওপর কায়সারিয়্যাহ বা কিসরাবিয়্যাহ্ চাপিয়ে দেয়ার একটি ষড়যন্ত্র।

হযরত আবদুর রহমান হযরত মুয়াবিয়ার এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) এবার ভিন্ন পথ অবলম্বন করলেন। তিনি আবদুর রহমানের কণ্ঠরোধ করার জন্য এক লাখ দিরহামসহ একজন দূত তাঁর কাছে পাঠালেন। হযরত সিদ্দীকে আকবরের পুত্র আবদুর রহমান দিরহামের থলিটি দূরে নিক্ষেপ করে দূতকে বললেন ঃ 'ফিরে যাও। মুয়াবিয়াকে বলবে, আবদুর রহমান দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিক্রী করবে না।' (আল-ইসতিয়াব, উসুদুল গাবা-৩/৩০৬, হায়াতুস সাহাবা-২/২৫৪, রিজালুন হাওলার রাসূল-৫২৮)

এ ঘটনার পর হযরত আবদুর রহমান যখন জানতে পেলেন হযরত মুয়াবিয়া (রা) সিরিয়া থেকে মদীনায় আসছেন, তিনি সাথে সাথে মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে যান। সেখানে শহর থেকে দশ মাইল দূরে 'হাবশী' নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন এবং সর্বাধিক সঠিক মতানুযায়ী হিজরী ৫৩ সনে ইয়াযিদের বাইয়াতের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিন সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় প্রতিদিনের মত যথারীতি শুয়ে পড়েন ; কিন্তু সেই ঘুম থেকে আর জাগেননি। হযরত 'আয়িশার মনে একটু সন্দেহ হয়, কেউ হয়তো তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে। এর কিছুদিন পর এক সুস্থ সবল মহিলা হযরত আয়িশার (রা) নিকট আসে এবং নামাযে সিজদারত অবস্থায় মারা যায়। এ ঘটনার পর তাঁর মনের খটকা দূর হয়ে যায়। হযরত আবদুর রহমানের সঙ্গী-সাথীরা তাঁর লাশ মক্কায় এনে দাফন করে।

হযরত 'আয়িশা (রা) ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে হজ্জের নিয়তে মক্কায় যান এবং কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কান্নার মধ্যে কবি মুতাম্মিম ইবন নুওয়াইরাহ রচিত একটি শোক গাঁথার শ্লোক বার বার আওড়াচ্ছিলেন। তারপর ভাইয়ের রূহের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ "আল্লাহর কসম ! আমি তোমার মরণ সময়ে উপস্থিত থাকলে এখন এভাবে কাঁদতাম না এবং যেখানে তুমি মৃত্যুবরণ করেছিলে সেখানেই তোমাকে দাফন করতাম।" (মুসতাদরিক ৩/৪৭৬, আল-ইসাবা-২/৪০৮)

হযরত আবদুর রহমান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু হুজাইফা ইবন 'উত্‌বা (রা)

নাম আবু হুজাইফা হাশীম, মতান্তরে হাশেম, পিতা উতবা, মাতা ফাতিমা বিন্‌তু সাফওয়ান এবং ডাকনাম উম্মু সাফওয়ান। কুরাইশ গোত্রের সন্তান।

আবু হুজাইফা সাবেকীনে ইসলাম অর্থাৎ প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ব্যক্তি। তাঁর পিতা 'উতবা ইসলামের চরম দুশমন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের এক প্রধান পুরুষ। ইসলামের বিরোধিতায় সে তার জীবন উৎসর্গ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি মহিমা, তারই প্রিয়তম পুত্র আবু হুজাইফা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে মোটেও বিলম্ব করেননি। মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নেওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেন এবং আরো অনেকের মত কুরাইশদের হাতে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন। (উসুদুল গাবা-৫/১৭০) ইবন ইসহাক বলেন, তিনি তেতাল্লিশ (৪৩) জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা—৪/৪২)।

আবু হুজাইফা (রা) হাবশার দু'টি হিজরাতেই অংশগ্রহণ করেন। প্রথমবার হিজরাত করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। পরে আবার হাবশায় চলে যান। হাবশার হিজরাতে তাঁর স্ত্রী হযরত সাহলা বিনতু সুহাইলও সাথী ছিলেন। তাঁদের পুত্র মুহাম্মাদ ইবন আবী-হুজাইফা সেই প্রবাসে হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। (উসুদুল গাবা—৫/১৭০)।

হাবশা থেকে দ্বিতীয়বারের মত মক্কায় ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন, মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানদের মধ্যে মদীনায় হিজরাতের হিড়িক পড়ে গেছে। তাঁর দাস সালেমকে সংগে করে তিনিও মদীনায় পৌঁছলেন এবং হযরত আব্বাদ ইবন বিশ্‌র আল-আনসারীর অতিথি হলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের দু'জনের মধ্যে 'মুওয়াখাত' বা ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। (উসুদুল গাবা—৫/১৭০)।

রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষতঃ বদর যুদ্ধের ঘটনাটি ছিল তাঁর ও সকল মুসলমানের জন্য দারুণ শিক্ষণীয়। এ যুদ্ধে এক পক্ষে তিনি এবং অন্য পক্ষে তাঁর পিতা উতবা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। সত্য ও ন্যায়ের প্রেম সেদিন মুসলমানদেরকে আপন পর সম্পর্ক বিস্মৃত করে দিয়েছিল। সেদিন আবু হুজাইফা চিৎকার করে আপন পিতা প্রতিপক্ষের দুঃসাহসী বীর উতবাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানন। তাঁর এ আহবান শুনে তাঁর সহোদরা হিন্দা বিনতু উতবা একটি কবিতায় তাঁকে ভীষণ তিরস্কার ও নিন্দা করে। উসুদুল গাবা গ্রন্থে কবিতাটির দু'টি পংক্তি সংকলিত হয়েছে।

বদর যুদ্ধে আবু হুজাইফার পিতা উতবাসহ অধিকাংশ কুরাইশ নেতা মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয় এবং তাদের সকলের লাশ বদরের একটি কূপে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দেওয়া হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সেই কূপের কাছে দাঁড়িয়ে নিহত কুরাইশ নেতৃবৃন্দের এক একজন করে নাম ধরে ডেকে বলতে লাগলেন, "ওহে উতবা, ওহে শাইবা, ওহে উমাইয়া ইবনে খালাফ, ওহে আবু জাহল! তোমরা কি আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য পেয়েছ? আমি তো আমার অঙ্গীকার সত্য পেয়েছি।" (বুখারী) ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, সে সময় হযরত আবু হুজাইফাকে খুবই উদাস ও বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করেন, "আবু হুজাইফা, সম্ভবতঃ তোমার পিতার জন্য তোমার কষ্ট হচ্ছে।" আবু হুজাইফা বলেন, "আল্লাহর কসম, না। তাঁর নিহত হওয়ার

জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। তবে আমার ধারণা ছিল, তিনি একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সিদ্ধান্তদানকারী ব্যক্তি। তাই আমার আশা ছিল, তিনি ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। কিন্তু রাসূল (সা) যখন তাঁর 'কুফর' অবস্থায় মৃত্যুবরণের নিশ্চয়তা দান করলেন, তখন আমার দুরাশার জন্য আফসুস হলো।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আবু হুজাইফার জন্য দু'আ করলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম—১/৬৩৮-৪১, উসুদুল গাবা—৫/১৭১)

হযরত রাসূলে কারীমের ওফাতের পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে আরব উপদ্বীপে কতিপয় ভণ্ড নবীর ফিতনা ও উৎপাত শুরু হয়। ইয়ামামার মুসাইলামা কাজ্জাবও ছিল সেইসব ভণ্ড নবীর একজন। খলীফা তার বিরুদ্ধে এক বাহিনী পাঠান। এই বাহিনীতে হযরত আবু হুজাইফাও (রা) ছিলেন। ভণ্ড মুসাইলামার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে তিনি ইয়ামামার রণক্ষেত্রে শহীদ হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ অথবা ৫৪ বছর।

হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধের সময় একদিন সাহাবীদের বললেন, "আমি জানতে পেরেছি, বনী হাশেম ও অন্য কতিপয় গোত্রের কিছু লোককে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাধ্য করা হয়েছে। তাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। তোমাদের কেউ বনী হাশেমের কোন ব্যক্তির মুখোমুখি হলে তাকে হত্যা করবে না। কেউ আবুল বুখতারী ইবন হিশামের দেখা পেলে তাকে হত্যা করবে না। আর কেউ রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা "আববাস ইবন আবদিল মুত্তালিবের সামনাসামনি হলে তাকেও হত্যা করবে না। কারণ, তিনি বাধ্য হয়ে এসেছেন।" সংগে সংগে আবু হুজাইফা বলে উঠলেন, "আমরা আমাদের পিতা, পুত্র ও ভ্রাতাদের হত্যা করবো, আর আববাসকে ছেড়ে দেব? আল্লাহর কসম, আমি তার সাক্ষাৎ পেলে তরবারি দিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।" রাসূলুল্লাহ (সা) হুজাইফার এ কথা শুনে বললেন, "ওহে আবু হাফ্স (উমার), আল্লাহর রাসূলের চাচাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হবে?" উমার বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, তরবারি দিয়ে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। আল্লাহর কসম, সে একজন মুনাফিক।" আবু হুজাইফা বলেন, "সেদিন যে কথাটি বলেছিলাম, সে জন্য আমি নিরাপত্তা বোধ করি না এবং শাহাদাতের মাধ্যমে তার কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত সর্বদা আমি ভীত সন্ত্রস্ত।" ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি তাঁর কাফফারা আদায় করেন। (হায়াতুস সাহাবা—২/৩৬৪-৬৫)।

সালেম মাওলা আবী হুজাইফা (রা)

হযরত রাসূলে করীম (সা) একদিন সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, "তোমরা কুরআন শেখ চার ব্যক্তির নিকট থেকে ঃ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, সালেম মাওলা আবী হুজাইফা, উবাই ইবন কা'ব ও মু'য়াজ ইবন জাবাল।" কে এই সালেম মাওলা আবী হুজাইফা—যাকে কুরআন শেখার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করলেন?

তাঁর নাম সালেম, কুনিয়াত আবু 'আবদিল্লাহ। পিতার নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইবন মুন্দাহ বলেছেন, 'উবায়েদ ইবন রাবী'য়া। আবার কারো মতে, মা'কাল। ইরানী বংশোদ্ভূত। পারস্যের 'ইসতাখরান' তাঁর পিতৃপুরুষের আবাসভূমি। হযরত সুবাইতা বিনতু ইউ'য়ার আল আনসারিয়্যার দাস হিসেবে মদীনায় পৌঁছেন। হযরত সুবাইতা ছিলেন হযরত আবু হুজাইফার স্ত্রী। সুবাইতা তাকে নিঃশর্ত আযাদ করে দিলে আবু হুজাইফা তাঁকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি সালেম ইবন আবী হুজাইফা হিসেবে পরিচিত হন যেমন হয়েছিলেন যায়িদ ইবন মুহাম্মাদ। কেউ কেউ তাঁকে আবু হুজাইফার দাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এসব কারণে তাঁকে মুহাজিরদের মধ্যে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে হযরত সুবাইতার আযাদকৃত দাস হওয়ার কারণে তাঁকে আনসারীও বলা হয়। আবার মূলে পারস্যের সন্তান হওয়ার কারণে কেউ কেউ তাঁকে আজমী বা অনারব বলেও উল্লেখ করেছেন।

হযরত সালেম মক্কায় হযরত আবু হুজাইফার সাথে বসবাস করতেন। এই আবু হুজাইফা ছিলেন মক্কার কুরাইশ সর্দার ইসলামের চিরদুশমন 'উতবা'র ছেলে। ইসলামী দাওয়াতের সূচনালগ্নেই যারা লাব্বাইক বলে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আবু হুজাইফা ও তাঁর পালিত পুত্র সালেমও ছিলেন। তাঁরা পিতা-পুত্র দু'জন নীরবে ও বিনীতভাবে তাঁদের রবের ইবাদাত করে চললেন এবং কুরাইশদের নির্মম অত্যাচারের মুখে সীমাহীন ধৈর্য্য অবলম্বন করলেন। একদিন পালিতপুত্র গ্রহণের প্রথা বাতিল করে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো—'উদয়ূহুম লি আবায়িহিম'—তাদেরকে তাদের পিতার নামে সম্পৃক্ত করে ডাক। প্রত্যেক পালিত পুত্র আপন আপন জন্মদাতা পিতার নামে পরিচিতি গ্রহণ করলো। যেমন যায়িদ ইবন মুহাম্মাদ হলো যায়িদ ইবন হারিসা। কিন্তু সালেমের পিতৃ পরিচয় ছিল অজ্ঞাত। তাই তিনি পরিচিত হলেন 'সালেম মাওলা আবী হুজাইফা'—আবু হুজাইফার বন্ধু, সাথী, ভাই বা আযাদকৃত দাস সালেম হিসেবে।

ইসলাম পালিত পুত্রের প্রথা বাতিল ঘোষণা করে। সম্ভবতঃ ইসলাম মুসলিম জাতিকে এ কথা বলতে চায় যে, রক্ত, আত্মীয়তা বা অন্য কোন সম্পর্ককে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া তোমাদের উচিত নয়। বিশ্বাস বা আকীদার ভিত্তিতেই তোমাদের সম্পর্ক নির্মিত হওয়া উচিত। প্রথম পর্যায়ের মুসলমানরা এ ভাবটি খুব ভালো করে বুঝেছিলেন। তাই, তাঁদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পর তাঁদের দ্বীনী ভাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কিছু ছিল না। এটা আমরা আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে দেখেছি। তেমনিভাবে দেখে থাকি সম্ভ্রান্ত কুরাইশ আবু হুজাইফা ও তাঁর পিতৃ পরিচয়হীন অজ্ঞাত-অখ্যাত দাস সালেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

হযরত সালেমের ঈমান ছিল সিদ্দীকীনদের ঈমানের মত এবং আল্লাহর পথে তিনি চলেছিলেন মুত্তাকীনদের মত। সমাজে তাঁর স্থান কি এবং তাঁর জন্ম-পরিচয়ই বা কি সেদিকে তিনি কোন ভ্রূক্ষেপ করেননি। ইসলাম যে নতুন সমাজ বিনির্মাণ করেছিল, সেই সমাজ তাঁর তাকওয়া ও ইখলাসের জন্য তাঁকে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। এই মহান পুণ্যময় নতুন সমাজেই আবু হুজাইফা—

গতকাল যে তাঁর দাস ছিল তাকে ভাই বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করে গৌরব বোধ করেছিলেন। এমনকি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ফাতিমা বিনতুল ওয়ালীদকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে নিজ পরিবারকে সম্মান ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে সমাজ ব্যবস্থা সকল প্রকার যুলুম-অত্যাচার দূর করে সবরকম মিথ্যা আভিজাত্যকে বাতিল ঘোষণা করেছিল, সেখানে সালেমের ঈমান, সততা ও দৃঢ়তা তাঁকে প্রথম সারির ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

হযরত রাসূলে করীমের (সা) হিজরাতের পূর্বেই তিনি তাঁর দ্বীনী বন্ধু আবু হুজাইফার সাথে মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় তিনি হযরত আব্বাদ ইবন বিশরের অতিথি হন। মককায় রাসূলুল্লাহ (সা) আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহর সাথে তাঁর দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দেন। কিন্তু মদীনায় তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় হযরত মুয়াজ ইবন মায়েজ আল-আনসারীর সাথে।

সাহাবীদের যুগে 'কিরআত' শিল্পে যাঁদেরকে ইমাম গণ্য করা হতো, সালেম তাদের একজন। রাসূলুল্লাহ (সা) যে চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআন শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সালেম তাঁদের অন্যতম। তিনি এমন সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন যে, কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে তা শুনতো। একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির হতে দেরী হলো। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার দেরী হলো কেন?" আয়িশা বললেন, "একজন ক্বারী সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করছিল, তাই শুনছিলাম।" তিনি তার তিলাওয়াতের মাধুর্য্য বর্ণনা করলেন। তাঁর বর্ণনা শুনে রাসূলে করীম (সা) চাদরটি টেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, সেই ক্বারী আর কেউ নয়, তিনি সালেম মাওলা আবী হুজাইফা। রাসূল (সা) তাঁর তিলাওয়াত শুনে মন্তব্য করলেন, "আলহামদুলিল্লাহ আল্লাজী জা'য়ালা ফী উম্মাতী মিছলাকা" —আমার উম্মাতের মধ্যে যিনি তোমার মত লোককে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। (উসুদুল গাবা-২/২৪৬)

সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং বেশী কুরআন হিফ্জ থাকার কারণে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সালেমকে অত্যধিক সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে যারা মদীনায় হিজরাত করেছিলেন, মসজিদে কুবায় সালেম তাদের নামাযের ইমামতি করতেন।" (বুখারী) হযরত আবু বকর ও হযরত উমারের মত বিশিষ্ট সাহাবীরাও তাঁর পেছনে নামায আদায় করতেন।

বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই তিনি হযরত রাসূলে করীমের (সা) সাথে ছিলেন। (উসুদুল গাবা-২/২৪৬) বদর যুদ্ধে তিনি কাফের উমাইর ইবন আবী উমাইরকে নিজ হাতে হত্যা করেন। (ইবন হিশাম-১/৭০৮)

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার চারদিকের গ্রাম ও গোত্রগুলিতে কতকগুলি দাওয়াতী প্রতিনিধি দল পাঠালেন। তিনি তাদেরকে বলে দিলেন, "যোদ্ধা হিসেবে নয়, বরং দায়ী বা আহবানকারী হিসেবে তোমাদেরকে পাঠানো হচ্ছে।" এমন একটি দলের নেতা ছিলেন হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। খালিদ তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর এমন এক ঘটনা ঘটলো যে, তিনি তরবারি চালালেন এবং তাতে প্রতিপক্ষের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হলো। এ খবর রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছলে তিনি দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর কাছে এই বলে ওজর পেশ করেছিলেন—"হে আল্লাহ, খালিদ যা করেছে, তার দায়-দায়িত্ব থেকে আমি তোমার কাছে অব্যাহতি চাই।" এ অভিযানে হযরত সালেম হযরত খালিদের সহগামী ছিলেন। খালিদের এ কাজ সালেম নীরবে মেনে নেননি। তিনি খালিদের এ কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁর প্রতিবাদের মুখে মহাবীর খালিদ কখনও লা জওয়াব হয়ে যান, আবার কখনও আত্মপক্ষ সমর্থন করে যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। আবার কখনও সালেমের সাথে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হন। কিন্তু সালেম স্বীয় মতের ওপর অটল থাকেন। খালিদের ভয়ে

সেদিন তিনি সত্য বলা থেকে চুপ থাকেননি।

সালেম ক'দিন আগেও যিনি ছিলেন মককার এক দাস, আজ তিনি খালিদের মত মককার এক সম্ভ্রান্ত কুরাইশ সিপাহসালারের কোন পরোয়াই করলেন না। খালিদও কোন রকম বিরক্তিবোধ করেননি। কারণ, ইসলাম তাঁদের উভয়কে সম মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। নেতার প্রতি অহেতুক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সালেম সেদিন খালিদের ভুল মেনে নেননি। বরং তিনি দায়িত্বের অংশীদার হিসেবে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আত্মতৃপ্তি বা নামের জন্য একাজ করেননি ; বরং বারবার তিনি যে রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে শুনেছিলেন, 'আদ-দ্বীন আন-নাসীহা'-দ্বীনের অপর নাম সতোপদেশ। এ উপদেশই তিনি সেদিন খালিদকে দান করেছিলেন।

হযরত খালিদের এ বাড়াবাড়ির কথা রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌছলে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন—"কেউ কি তার এ কাজের প্রতিবাদ বা নিন্দে করেনি?" রাসূলে পাকের ক্রোধ পড়ে গেল যখন তিনি শুনলেনঃ "হ্যাঁ, সালেম প্রতিবাদ করেছিল, তার সাথে ঝগড়া করেছিল।"

হযরত রাসূলে করীম (সা) আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। হযরত আবু বকরের খিলাফত মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হলো। তাদের সাথে সংঘটিত হয় ভয়াবহ ইয়ামামার যুদ্ধ। এমন ভয়াবহ যুদ্ধ ইতিপূর্বে ইসলামের ইতিহাসে আর সংঘটিত হয়নি। মুসলিম বাহিনী মদীনা থেকে ইয়ামামার উদ্দেশ্যে বের হলো। সালেম এবং তাঁর দ্বীনী ভাই আবু হুজাইফা অন্যদের সাথে বেরিয়ে পড়লেন। যুদ্ধের প্রথম পর্বে মুসলিম বাহিনী কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে তারা বুঝতে পারে যুদ্ধ যুদ্ধই এবং দায়িত্ব দায়িত্বই। হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ নতুন করে তাদের সংগঠিত করেন এবং অভূতপূর্ব কায়দায় তিনি বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। প্রথমতঃ যখন মুসলিম বাহিনী পিছু হটে যাচ্ছিল, তখন হযরত সালেম চিৎকার করে উঠলেন, "আফসুস, রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে আমাদের অবস্থা তো এমন ছিল না।" তিনি নিজের জন্য একটি গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে যান। (উসুদুল গাবা-২/২৪৬)

ইয়ামামার যুদ্ধে প্রথমে হযরত যায়িদ ইবনুল খাত্তাবের হাতে ছিল মুসলিম বাহিনীর পতাকা। তিনি শাহাদাত বরণ করলে পতাকাটি মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সালেম তা তুলে ধরেন। কেউ কেউ তাঁর পতাকা গ্রহণে আপত্তি করে বলে, "আমরা তোমার দিক থেকে শত্রু বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা করছি।" সালেম বলেন, "তাহলে আমি তো হয়ে যাব কুরআনের এক নিকৃষ্ট বাহক।" (হায়াতুস সাহাবা-১/৫৩৫)

শত্রু বাহিনীকে আক্রমণের পূর্বে দুই দ্বীনী ভাই—আবু হুজাইফা ও সালেম পরস্পর বুকে বুক মেলালেন এবং দ্বীনে হকের পথে শহীদ হওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। তারপর উভয়ে শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আবু হুজাইফা একদিকে চিৎকার করে বলছেন, "ওহে কুরআনের ধারকরা, তোমরা তোমাদের 'আমল দ্বারা কুরআনকে সুসজ্জিত কর।" আর অন্যদিকে মুসাইলামা কাজ্জাবের বাহিনীর ওপর তরবারির আঘাত হানছেন। আর একদিকে সালেম চিৎকার করে বলছেন—"আমি হব কুরআনের নিকৃষ্ট বাহক—যদি আমার দিক থেকে শত্রু বাহিনীর আক্রমণ আসে।" মুখে তিনি একথা বলছেন আর দু'হাতে তরবারি শত্রুসৈন্যের গর্দানে মারছেন।

এক ধর্মত্যাগীর অসির তীব্র আঘাত তাঁর ডান হাতে পড়লো। হাতটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি বাম হাতে পতাকাটি উঁচু করে ধরেন। বাম হাতটিও শত্রুর আঘাতে কেটে পড়ে গেলে পতাকাটি গলার সাথে পেঁচিয়ে ধরেন। এ অবস্থায় তিনি উচ্চারণ করতে থাকেন কুরআনের এ আয়াত, "ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, ওয়াকা আইয়্যিন মিন নাবিয়্যিন কা-তালা মা'য়াহু রিব্বিয়্যুনা কাসীর।"............ "মুহাম্মাদ আল্লাহর এক রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। অতীতে কত নবীর সহযোগী হয়ে কত আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিই না যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যে বিপদ মুসীবত

আপতিত হয়েছে, তাতে তারা দুর্বল হয়ে পড়েনি এবং থেমেও যায়নি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।" এই ছিল তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের শ্লোগান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুরতাদদের একটি দল সালেমকে ঘিরে ফেলে। মহাবীর সালেম লুটিয়ে পড়েন। তখনও তাঁর দেহে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। মুসাইলামা কাজ্জাবের নিহত হওয়ার সাথে মুসলমানদের বিজয় ও মুরতাদদের পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। মুসলমানরা আহত-নিহতদের খোঁজ করতে লাগলো। সালেমকে তারা জীবনের শেষ অবস্থায় খুঁজে পেল। এ অবস্থায় সালেম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ

—আবু হুজাইফার অবস্থা কি?

—সে শাহাদাত বরণ করেছে।

—যে ব্যক্তি আমার দিক থেকে শত্রু বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা করে পতাকা আমার হাতে দিতে আপত্তি জানিয়েছিল, তার অবস্থা কি?

—শহীদ হয়েছে।

—আমাকে তাদের মাঝখানেই শুইয়ে দাও।

—তারা দু'জন তোমার দু'পাশেই শহীদ হয়েছে।

হযরত সালেম শেষ বারের মত শুধু একটু মুচকি হাসি হেসেছিলেন। আর কোন কথা বলেননি। সালেম এবং আবু হুজাইফা উভয়ে যা আন্তরিকভাবে কামনা করেছিলেন, লাভ করেন। তাঁরা এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন, একসাথে জীবন যাপন করেন এবং এক সাথে একস্থানে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত সালেমের কাহিনী বিলাল ও অন্যান্য অসংখ্য অসহায় দাসদের কাহিনীরই মত। ইসলাম তাঁদের সকলের কাঁধ থেকে দাসত্বের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদেরকে সত্য ও কল্যাণময় সমাজে ইমাম, নেতা ও পরিচালকের আসনে বসিয়ে দেয়। তাঁর মধ্যে মহান ইসলামের যাবতীয় গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি যা সত্য বলে জানতেন অকপটে তা প্রকাশ করে দিতেন, তা বলা থেকে কক্ষণো বিরত থাকতেন না। তাঁর মুমিন বন্ধুরা তাঁর নাম রেখেছিল—'সালেম মিনাস সালেহীন'—সত্যনিষ্ঠদের দলভুক্ত সালেম।

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সালেমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে বলেছিলেন, "আজ সালেম জীবিত থাকলে শুরার পরামর্শ ছাড়াই আমি তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব দিতাম।" (উসুদুল গাবা-২/২৪৬)

হযরত সালেম ছিলেন নিঃসন্তান। তাই মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে অসীয়াত করে যান। এক তৃতীয়াংশ দাসমুক্তি ও অন্যান্য ইসলামী কাজের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ পূর্বতন মনিব হযরত সুবাইতার অনুকূলে। হযরত আবু বকর (রা) অসীয়াত মত এক তৃতীয়াংশ সুবাইতার কাছে পাঠালে তিনি এই বলে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান যে, আমি তো তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়েছি, বিনিময়ে কোন কিছু আশা করিনি। পরে খলীফা উমার (রা) তা বাইতুল মালে জমা দেন। (আল ইসতিয়াব, উসুদুল গাবা-২/২৪৭)

হযরত সালেম থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবার অনেক সাহাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাতিব ইবন আবী বালতা'য়া (রা)

নাম হাতিব, কুনিয়াত আবু মুহাম্মাদ, আবু আবদিল্লাহ। পিতার নাম আবু বালতা'য়া আমর। তাঁর বংশ পরিচয় ও মক্কায় উপস্থিতির ব্যাপারে সীরাত লেখকদের মতভেদ আছে। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মতে পিতৃ-পুরুষের আদি বাসস্থান ইয়ামান। বনী আসাদ, অতঃপর যুবাইর ইবনুল আওয়ামের হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ হয়ে তারা মক্কায় বসবাস করতো। আবার কেউ বলেছেন, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবন হুমাইদের দাস ছিলেন। মুকাতাবা বা চুক্তির ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ করে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। (উসুদুল গাবা-১/৩৬১)

মারযুবানী তাঁর মু'জামুশ শু'য়ারা গ্রন্থে বলেন, "তিনি জাহিলী যুগে কুরাইশদের অন্যতম খ্যাতিমান ঘোড় সাওয়ার ও কবি ছিলেন"। (আল-ইসাবা-১/৩০০) হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনা ইসলামের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর তাঁর দাস সা'দকে সংগে করে তিনি মদীনায় উপস্থিত হন। সেখানে হযরত মুনজির ইবন মুহাম্মাদ আল-আনসারীর অতিথি হন এবং হযরত খালিদ-ইবন রাখবালার (রা) সাথে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূসা ইবন 'উকবা ও ইবন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। (উসুদুল গাবা-১/৩৬১) তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা মতে উহুদ, খন্দকসহ রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে সংঘটিত সকল যুদ্ধে যোগদান করেন।

উহুদ থেকে ফিরে হিজরী ষষ্ঠ সনে ইসলামের মুবাল্লিগ বা প্রচারক হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মিসর অধিপতি মাকুকাসের দরবারে পাঠান। তিনি মাকুকাসের নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) যে পত্রটি বহন করে নিয়ে যান তার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ।

"অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামী-দাওয়াতের দিকে আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করলে আপনি নিরাপদ থাকবেন এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ বিনিময় দান করবেন। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে সকল কিবতীর পাপ আপনার ওপর বর্তাবে। হে আসমানী কিতাবের অধিকারীরা! আপনারা এমন একটি কালেমা বা কথার দিকে আসুন যা আমাদের ও আপনাদের সকলের জন্য সমান। অর্থাৎ আমরা শুধু এক আল্লাহর ইবাদাত করবো, তার সাথে অন্য কিছু শরীক করবো না এবং আমাদের একজন আর একজনকে খোদার আসনে বসাবো না।"

হযরত হাতিব ইবন আবী বালতা'য়া মিসরে মাকুকাসের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) উপরোক্ত পত্রটি পৌঁছে দেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে নিম্নোক্ত আলোচনা হয়ঃ

হাতিব ঃ আপনার পূর্বে এখানে এমন একজন শাসক অতীত হয়েছেন যিনি নিজেকে খোদা মনে করতেন। আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাবে নিমজ্জিত করে দৃষ্টান্তমূলক প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। অন্যদের থেকে আপনারও উপদেশ হাসিল করা উচিত। আপনি নিজেই উপদেশ লাভের স্থলে পরিণত হন, এমনটি বাঞ্ছনীয় নয়।

মাকুকাস ঃ আমরা এক ধর্মের অনুসারী। যতদিন অন্য কোন ধর্ম সে ধর্ম থেকে উন্নততর প্রমাণিত না হয় ততদিন আমরা তা পরিত্যাগ করতে পারিনে।

হাতিব ঃ আমরা আপনাকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি—যা অন্য সকল দ্বীন থেকে উত্তম ও পরিপূর্ণ। এই নবী যখন মানুষকে এ দ্বীনের দাওয়াত দিলেন, কুরাইশরা তখন তীব্র বিরোধিতা করলো। তাছাড়া ইহুদীরা সর্বাধিক বৈরী ভাব প্রকাশ করে। তবে তুলনামূলকভাবে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা

নমনীয় ছিল। আল্লাহর কসম! মূসা (আ) যেমন ঈসার (আ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন তেমনি ঈসাও (আ) মুহাম্মাদের (সা) সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। আপনারা যেমন ইন্‌জীলের দিকে ইহুদীদেরকে আহবান জানান আমরাও তেমনি আপনাদেরকে কুরআনের দাওয়াত দিই। নবীদের আবির্ভাবকালীন সময়ে পৃথিবীতে যত কাওম, বা জাতি থাকে তারা সকলে সেই নবীর উম্মাত এবং তাদের ওপর সেই নবীর আনুগত্য ফরয। যেহেতু আপনি একজন নবীর যুগ লাভ করেছেন, তাই তাঁর ওপর ঈমান আনা আপনার অবশ্য কর্তব্য। আমরা আপনাকে দ্বীনে মসীহ থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছিনা, বরং সঠিকভাবে সেদিকেই নিয়ে যেতে চাচ্ছি।

মাকুকাসঃ মুহাম্মাদ কি সত্যিই একজন নবী?

হাতিবঃ কেন সত্য নয়?

মাকুকাসঃ কুরাইশরা যখন তাঁকে নিজ শহর থেকে তাড়িয়ে দিল, তিনি তাদের জন্য বদ-দু'আ করলেন না কেন?

হাতিবঃ আপনারা কি বিশ্বাস করেন ঈসা (আ) আল্লাহর রাসূল? যদি তাই হয়, তাহলে যখন তাঁকে শূলীতে চড়ানো হয়, তাঁর কাওমের লোকদের জন্য বদদু'য়া করলেন না কেন?

এমন অন্তরভেদী তাৎক্ষণিক জবাবে অবলীলাক্রমে মাকুকাসের মুখ থেকে প্রশংসাসূচক ধ্বনি উচ্চারিত হলো। তিনি আরো বললেন, "নিশ্চয়ই আপনি একজন মহাজ্ঞানী এবং একজন মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকেই এসেছেন।" (উসুদুল গাবা-১/৩৬১) "আমি যতটুকু ভেবে দেখেছি, এই নবী কোন অনর্থক কাজের আদেশ দেন না এবং কোন পছন্দনীয় বিষয় থেকেও বিরত রাখেন না। আমি না তাঁকে ভ্রান্ত যাদুকর বলতে পারি, আর না মিথ্যুক ভবিষ্যদ্বক্তা। তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের অনেক নিদর্শন বিদ্যমান। আমি শিগগিরই বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখবো।" কথাগুলি বলে তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পবিত্র পত্রখানি উঠিয়ে হাতির দাঁতের একটি বাক্সে বন্দী করেন এবং সীলযুক্ত করে উপস্থিত এক দাসীর হিফাজতে দিয়ে দেন।

মাকুকাস অত্যন্ত সম্মানের সাথে হযরত হাতিবকে বিদায় দেন এবং তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহর জন্য তিনজন দাসী, দুলদুল নামের একটি খচ্চর এবং বেশ কিছু কাপড়সহ মূল্যবান উপহার পাঠান। (যাদুল মা'য়াদ-২/৫৭) মাকুকাস প্রেরিত দাসীত্রয়ের একজন হযরত মারিয়্যা কিবতিয়্যা, হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে নিজের জন্য রাখেন এবং তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহর (সা) পুত্র হযরত ইব্রাহীম। দ্বিতীয় দাসীটি হযরত মারিয়্যার বোন সীরীন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দান করেন প্রখ্যাত কবি হযরত হাস্‌সান বিন সাবিতকে (রা) এবং তাঁর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করে হযরত আবদুর রহমান ইবন হাস্‌সান। তৃতীয় দাসীটিকে রাসূলুল্লাহ (সা) দান করেন আবু জাহম ইবন হুজাইফা আল-আদাবীকে। (হায়াতুস সাহাবা-১/১৪০-৪১, উসুদুল গাবা-১/৩৬২)

হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়। বিষয়টি যাতে প্রতিপক্ষ মক্কার কুরাইশরা জানতে না পারে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সকলকে সতর্ক করে দেন। হযরত হাতিব মক্কায় বসবাস না করলেও কুরাইশদের সাথে পুরাতন বন্ধুত্বের কারণে তাদের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি মদীনাবাসীদের এই গোপন প্রস্তুতির খবরসম্বলিত একটি পত্রসহ মুযাইনা গোত্রের এক মহিলাকে মক্কার দিকে পাঠান। এর বিনিময়ে মহিলাটিকে তিনি নির্ধারিত মজুরী দেবেন বলে চুক্তি হয়। পত্রখানি মাথার চুলের বেণীর মধ্যে লুকিয়ে মহিলাটি মক্কার দিকে যাত্রা করে। এদিকে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সব খবর অবগত হলেন। সাথে সাথে তিনি মহিলাটির পিছু ধাওয়া করে পত্রটি উদ্ধারের জন্য আলী, যুবাইর ও মিকদাদকে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা তিনজন খুব দ্রুত সাওয়ারী দাবড়িয়ে 'খালীকা' মতান্তরে 'রাওদাতু খাক' নামক স্থানে মহিলাকে ধরে ফেলেন। প্রথমে তাঁরা তার বাহনে সন্ধান করে কোন কিছুই পেলেন না। তারপর হযরত আলী (রা) মহিলাকে বললেন, "আমি আল্লাহর

নামে কসম করে বলছি, রাসূলুল্লাহকে (সা) মিথ্যা খবর দেওয়া হয়নি এবং আমাদেরকেও মিথ্যা বলা হয়নি। হয় তুমি নিজেই পত্রটি বের করে দাও, নয়তো আমরা তোমাকে উলংগ করে তালাশ করবো।" তাঁদের এ কঠোরতা দেখে মহিলা বললো, 'তোমরা একটু সরে যাও'' তাঁরা সরে দাঁড়ালেন। সে তার মাথার বেণী খুলে তার মধ্য থেকে পত্রটি বের করে দিল। তাঁরা তিনজন পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। পত্রটি পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেন, "ওহে হাতিব, তুমি এমন কাজ করলে কেন?" হাতিব বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবেন না। যদিও আমি কুরাইশ বংশের কেউ নই, তবুও জাহিলী যুগে তাদের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যেহেতু মুহাজিরদের সকলে তাদের মক্কাস্থ আত্মীয়-বন্ধুদের সাহায্য-সহায়তা করে থাকেন, এ জন্য আমার ইচ্ছে হলো, আমার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কুরাইশরা যে সদ্ব্যবহার করে থাকে তার কিছু প্রতিদান কমপক্ষে আমি তাদের দান করি। একাজ আমি মুরতাদ হয়ে বা ইসলাম ত্যাগ করে অথবা কুফরকে ইসলামের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে করিনি।" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হাতিব বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পরিবার-পরিজন তাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য ক্ষতিকর হবে না—এমনটি মনে করেই আমি চিঠিটি লিখেছি। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আল্লাহ সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি। কিন্তু মক্কায় আমি ছিলাম একজন বহিরাগত এবং সেখানে আমার মা, ভাই ও ছেলেরা রয়েছে।" (আল-ইসাবা-১/৩০০, হায়াতুস সাহাবা-২/৪২৫)

হাতিবের বক্তব্য শুনার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) উপস্থিত সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, "সে সত্য কথাটি প্রকাশ করে দিয়েছে। এ কারণে কেউ যেন তাকে গালমন্দ না করে।" হযরত উমার আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমানদের প্রতি আস্থাহীনতার কাজ করেছে। অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "সে কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি? আল্লাহ বদরের যোদ্ধাদের অনুমতি দিয়েছেন, তোমরা যা খুশী কর জান্নাত তোমাদের জন্য অবধারিত।" রহমাতুল লিল আলামীন দয়ার নবীর এ অপূর্ব উদারতায় উমারের দু'চোখ সজল হয়ে ওঠে। (সহীহুল বুখারী, ফদলু মান শাহেদা বদরান)

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়,

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের আচরণ কর, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে।" (সূরা মুমতাহিনা-১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে দ্বিতীয়বার মাকুকাসের দরবারে পাঠান এবং মাকুকাসের সাথে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। হযরত আমর ইবনুল আসের (রা) মিসর জয়ের পূর্ব পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে এ চুক্তি বহাল থাকে। (আল-ইসতিয়াব)

হিজরী ৩০ সনে ৬৫ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। হযরত উসমান (রা) জানাযার নামাযের ইমামতি করেন এবং বিপুলসংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে তাঁর দাফন কাজ সম্পন্ন হয়। (আল-ইসতিয়াব)

প্রতিশ্রুতি পালন, উপকারের প্রতিদান দেওয়া এবং স্পষ্ট ভাষণ তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন দরদ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি যে পত্রটি লেখেন তা ছিল মূলতঃ এ দরদের তাকিদেই। আর রাসূল (সা) তা উপলব্ধি করেই তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

তাঁর স্বভাব ছিল কিছুটা রুক্ষ। দাসদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ

(সা) ও পরবর্তী খলীফারা মাঝে মাঝে তাঁকে বকাঝকা করে সংশোধন করতেন। একবার তাঁর এক দাস হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর কঠোরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিশ্চয়ই হাতিব জাহান্নামে যাবে।" রাসূল (সা) বললেন, "তুমি মিথ্যা বলছো। যে ব্যক্তি বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশ নিয়েছে সে জাহান্নামে যেতে পারে না।" (ইসতিয়াব)

হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে বহুবার তাঁর দাসেরা তাঁর বিরুদ্ধে খলীফার নিকট কঠোরতার অভিযোগ এনেছে। একবার তাঁর এক দাস মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তির একটি উট জবেহ করে দেয়, তার শাস্তি স্বরূপ তিনি সেই দাসের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেন। খলীফা জানতে পেয়ে তাঁকে ডেকে বলেন, "জানতে পেলাম, তুমি তোমার দাসদের অনাহারে রাখ।" খলীফা তাঁকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন।

ব্যবসা ছিল তাঁর জীবিকার প্রধান উৎস। খাবারের একটি দোকান থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। মৃত্যুকালে চার হাজার দীনার এবং অনেকগুলি বাড়ী রেখে যান।

কেউ বলেছেন, হাতিব থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) তিনটি হাদীস, আবার কেউ বলেছেন দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে।

'উতবা ইবন গাযওয়ান (রা)

নাম 'উতবা, ডাক নাম আবু আবদিল্লাহ। পিতা গাযওয়ান ইবন জাবির। জাহিলী যুগে তার গোত্র বনী নাওফাল ইবন আবদে মান্নাফের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল।

ইসলামের সূচনালগ্নে তাওহীদের আহবানে সাড়া দানকারীদের মধ্যে উতবা অন্যতম ব্যক্তি। একবার এক ভাষণে তিনি দাবী করেন, তিনি সপ্তম মুসলমান। (উসুদুল গাবা-৩/৩৬৪)

মক্কায় কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশার দ্বিতীয় হিজরাতে শরিক হন। তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর। কিছুদিন হাবশায় থাকার পর আবার মক্কায় ফিরে এসে বসবাস করতে থাকেন। হযরত রাসূলে করীম (সা) তখনও মক্কায়। (আল-ইসতিয়াব, উসুদুল গাবা-৩/৩৬৪)

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় হিজরাত করেন এবং কুফর ও ইসলামের মধ্যে সামরিক সংঘাত শুরু হলো, তিনি এবং মিকদাদ একটি কুরাইশ বাহিনীর সাথে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। ইকরামা ইবন আবী জাহল ছিল এই বাহিনীর নেতা। পথে মদীনার মুসলিম মুজাহিদদের একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে এই বাহিনীর ছোট-খাট একটি সংঘর্ষ হয়। এই মুজাহিদ দলটির নেতা ছিলেন হযরত 'উবাইদা ইবনুল হারিস। 'উতবা এবং মিকদাদ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তারা সুযোগমত মুজাহিদ দলটির সাথে যোগ দেন। মদীনায় পৌঁছে উতবা হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালামা 'আজলানীর অতিথি হন এবং হযরত আবু দুজানা আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। (তাবাকাতে ইবন সা'দ-৩/৬৯)

হযরত 'উতবা ইবন গাযওয়ান ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দায। বদর, উহুদ, খন্দক ছাড়াও যে সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন তার সবগুলোতে তিনি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ (সা) যে অনুসন্ধানী দলটি নাখলার দিকে পাঠান, তিনি সেই দলেরও সদস্য ছিলেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩৫০)

হিজরী ১৪ সনে দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা) ইরাকের সামুদ্রিক বন্দর উবুল্লা, মায়সান ও তার আশ-পাশের এলাকায় অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করে একটি বাহিনীসহ মদীনা থেকে পাঠান। ঘটনাটি বিভিন্ন গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ "আমীরুল মুমিনীন হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ই'শার নামাযের পর একটু বিশ্রামের জন্য বিছানায় গেলেন, যাতে একটু পরে রাতে নগর ভ্রমণে বের হতে পারেন। কিন্তু তাঁর দু'চোখে ঘুম নেই। দূত খবর নিয়ে এসেছে, পরাজিত পারস্য বাহিনী পাল্টা আক্রমণের জন্য বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে সুসংগঠিত হয়েছে। খলীফাকে আরো জানানো হয়েছে, বসরার নিকটবর্তী 'উবুল্লা' নগরী পরাজিত পারস্য বাহিনীর অর্থ ও লোক সরবরাহের প্রধান উৎস। খলীফা পারস্য বাহিনীর এই উৎস বন্ধ করার জন্য 'উবুল্লায়' অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু অপর্যাপ্ত সামরিক শক্তি তাঁর এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। কারণ, মদীনায় তখন অল্প কিছু লোক ছাড়া প্রায় সকলে বিভিন্ন ফ্রন্টে অভিযানে লিপ্ত। খলীফা 'উমার (রা) তখন তাঁর চিরাচরিত পদ্ধতি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। আর তা হলো, সৈন্যের স্বল্পতা শক্তিশালী ও যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা দূরীকরণ। তিনি সেনা কমাণ্ডারদের সম্পর্কে ভাবলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আপন মনে বলে উঠলেনঃ "পেয়েছি। হ্যাঁ, আমি পেয়েছি।" তারপর একথা বলতে বলতে তিনি বিছানায় গেলেন, "তিনি সেই মুজাহিদ যাঁকে বদর, উহুদ ও খন্দকের মত যুদ্ধসমূহ চিনেছে। ইয়ামামাও তাঁর যোগ্যতা ও ভূমিকার সাক্ষী। কোন যুদ্ধেই তাঁর তরবারি ভোতা হয়নি, তাঁর একটি তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তদুপরি তিনি দুইটি হিজরাতের অধিকারী, ধরাপৃষ্ঠে তিনি সপ্তম মুসলমান।"

সকাল বেলা তিনি বললেনঃ "তোমরা কেউ 'উতবা ইবন গাযওয়ানকে ডেকে দাও।"

খলীফা তাঁকে তিনশো'র কিছু বেশী সদস্য বিশিষ্ট একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন এবং পশ্চাৎগামী আরো কিছু সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার অঙ্গীকারও করেন।

মদীনা থেকে উতবা তাঁর বাহিনীসহ রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে খলীফা উমার বাহিনী প্রধান 'উতবাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ

"আল্লাহর রহমত ও বরকতের ওপর নির্ভর করে আরবের শেষ সীমা ও অনারব সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী অংশের দিকে আপনার সঙ্গীদের নিয়ে আপনি রওয়ানা হয়ে যান। যতদূর সম্ভব তাকওয়া অবলম্বন করবেন এবং স্মরণ রাখবেন, আপনারা শত্রু-ভূমিতে যাচ্ছেন। আমি আশা করি আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। আমি 'আলা ইবনুল হাদরামীকে লিখেছি, 'আরফাজা ইবন হারসামাকে পাঠিয়ে আপনাকে সাহায্য করার জন্য। শত্রুর মুকাবিলায় তিনি এক করিৎকর্মা মুজাহিদ। তিনি আপনার উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন। অনারবদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবেন। যারা সে আহ্বান মেনে নেবে, তাদেরকে নিরাপত্তা দেবেন। আর যারা তা অস্বীকার করবে, জিযিয়া দিয়ে শাসিত জীবন যাপনে বাধ্য করবেন। অন্যথায় তলোয়ারের সাহায্যে ফায়সালা করবেন। চলার পথে যে সকল আরব গোত্রের পাশ দিয়ে যাবেন তাদেরকে শত্রুর সাথে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করবেন এবং সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবেন।" (উসুদুল গাবা-৩/৩৬৪)

উতবা ইবন গাযওয়ান তাঁর বাহিনী নিয়ে রওয়ানা দিলেন। সেই বাহিনীর সাথে তাঁর স্ত্রীসহ অন্য সৈনিকদের আরো পনেরো জন মহিলাও চললেন। তাঁরা 'উবুল্লা' শহরের অদূরে 'কাসবা' নামক এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ বিশিষ্ট ভূমিতে পৌঁছলেন। তাঁদের কাছে তখন খেয়ে বেঁচে থাকার মত কোন কিছু নেই। যখন তারা মারাত্মক ক্ষুধার সম্মুখীন হলেন, উতবা তাঁর বাহিনীর কতিপয় সদস্যকে খাওয়ার কোন কিছু তালাশ করার নির্দেশ দিলেন। তাঁদের এই খাদ্য তালাশের সাথে একটি চমকপ্রদ কাহিনী জড়িত আছে। তাদেরই একজন বর্ণনা করছেনঃ

"আমরা খাদ্যের সন্ধানে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। সেখানে দু'টো বস্তা পড়ে থাকতে দেখলাম। তার একটিতে খেজুর ভর্তি এবং অন্যটিতে এক প্রকার সাদা শস্যদানা যার উপরিভাগ সোনালী আবরণে আবৃত। আমরা বস্তা দুটো টেনে আমাদের সেনা ছাওনীর কাছাকাছি নিয়ে এলাম। আমাদের একজন শস্যদানাভরা বস্তাটির দিকে তাকিয়ে বললো, "এটা বিষ, শত্রুরা রেখে দিয়েছে। কেউ এর ধারে কাছে যাবে না।" আমরা খেজুর খেতে লাগলাম। এর মধ্যে আমাদের একটি ঘোড়া ছুটে গিয়ে শস্যদানার বস্তায় মুখ দিয়ে খেতে শুরু করলো। আমরা তো প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, ঘোড়াটি মারা যাবার পূর্বেই জবেহ করে দেওয়ার যাতে তার গোশত আমরা খেতে পারি।

অতঃপর ঘোড়ার মালিক আমাদের বললোঃ একটু অপেক্ষা করা যাক, আজ রাত আমরা ঘোড়াটি পাহারা দিই। যদি দেখা যায়, সত্যি সত্যিই ঘোড়াটি 'মারা যাচ্ছে তাহলে জবেহ করা যাবে। কিন্তু সকালে দেখা গেল ঘোড়াটি সম্পূর্ণ সুস্থ্য। তখন আমার বোন আমাকে বললোঃ ভাই, আমার আব্বাকে আমি বলতে শুনেছি, বিষ আগুনে জ্বালিয়ে সিদ্ধ করা হলে তার ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। তারপর সে কিছু শস্যদানা নিয়ে হাঁড়িতে ফেলে সিদ্ধ করা শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর সে আমাদের ডেকে বললো, দেখুন, কেমন লাল হয়ে গেছে। সে দানাগুলির খোসা ছড়িয়ে সাদা দানা বের করলো। আমরা সেগুলি একটি পাত্রে রাখলাম। উতবা বললেনঃ তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে ফেল। আমরা খেয়ে দেখলাম চমৎকার স্বাদ। পরে আমরা জেনেছিলাম এই শস্যদানার নাম "ধান"।

এই 'উবুল্লা' ছিল দিজলার তীরে, শত্রু বাহিনীর একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি। উতবা মাত্র ছ'শো যোদ্ধা ও কতিপয় মহিলাকে সাথে নিয়ে এ ঘাঁটি জয় করেন। তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল অতি মামুলী ধরনের।

যন্ত্রঃ তীর, তরবারি, বর্শা ইত্যাদি। কিন্তু তিনি মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাহায্যে এ অসাধ্য সাধন করেন।

উতবা মহিলাদের জন্য অনেকগুলি পতাকা বানিয়ে বর্শার মাথায় বেঁধে দেন। তাদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন মুসলিম মুজাহিদদের পেছনে সেগুলি উঁচু করে ধরে রাখে। তিনি তাদের আরো বলেন, আমরা যখন 'উবুল্লা' শহরের কাছাকাছি পৌঁছে যাব তখন তোমরা খুব বেশী করে ধুলো উড়াবে, যাতে চারিদিক ধুলোয় অন্ধকার হয়ে যায়।

মুসলিম বাহিনী যখন উবুল্লার নিকটবর্তী হলো, পারস্য বাহিনী শহর থেকে বেরিয়ে এসে দিগন্তব্যাপী ধুলোর মেঘ ও অসংখ্য পতাকার ওঠানামা দেখতে পেল। তারা পরস্পর বলাবলি করলোঃ এতো অগ্রবর্তী বাহিনী। এদের পেছনে অসংখ্য সৈন্য রয়েছে, তারাই এ ধুলো উড়াচ্ছে।

তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হলো, আতঙ্কে তারা অস্থির হয়ে পড়লো। তারা হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে দিজলা নদীতে নোঙ্গর করা নৌকায় উঠে পালিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে গেল। উতবা তাঁর বাহিনীর একজন সদস্যকেও না হারিয়ে উবুল্লায় প্রবেশ করেন। অতঃপর দিজলা উপকূলবর্তী নগর ও গ্রামসমূহ পদানত করে ইসলামী ঝাণ্ডা সমুন্নত করেন।

'উবুল্লায় মুসলিম বাহিনী অগণিত গণিমত লাভ করে। মুসলিম বাহিনীর এক সৈনিক মদীনায় এলে মদীনাবাসীরা তাকে প্রশ্ন করে 'উবুল্লায় মুসলমানরা কেমন আছে?' তিনি বলেন, "তোমরা কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞেস করছো? আল্লাহর কসম, আমি যখন তাদেরকে রেখে এসেছি তখন তারা সোনা রূপো পাল্লায় করে ওজন দিচ্ছে।" একথা শুনে মদীনাবাসীরা উবুল্লার দিকে সওয়ারী হাঁকালো।

উবুল্লা জয়ের পর হযরত 'উতবা ভেবে দেখলেন, যদি তাঁর সৈন্যরা এই বিজাতীয় ভূমিতে শহরের স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সহ-অবস্থান করে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি বিজাতীয় আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে। বিষয়টি তিনি খলীফা উমারকে (রা) জানান এবং বসরা নামক স্থানে একটি সামরিক শহর নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই বসরা ছিল উবুল্লা বন্দরের নিকটবর্তী একটি স্থান যেখানে পারস্য উপসাগরে চলাচলরত ভারতবর্ষ ও পারস্যের জাহাজসমূহ নোঙ্গর করতো। হযরত 'উতবা (রা) আটশো লোক সঙ্গে করে সর্বপ্রথম উক্ত স্থানে যান এবং বসরা নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রত্যেক গোত্রের জন্য তিনি পৃথক মহল্লা নির্ধারণ করে দেন। জামে মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করেন হযরত মিহজান ইবনুল আদরা-এর ওপর। নগরীর বাড়ী-ঘর প্রথমতঃ গাছ-পাথর দিয়ে তৈরী হয়। এ কারণে জামে মসজিদও গাছপালা দিয়ে নির্মিত হয়। তবে তিনি নিজের জন্য কোন প্রাসাদ নির্মাণ করেননি। কাপড়ের তৈরী তাঁবুতে তিনি বসবাস করতেন। (উসুদুল গাবা-৩/৩৬৪)

হযরত 'উতবা (রা) এই নতুন শহরের প্রথম শাসক নিযুক্ত হন এবং ছয় মাস যাবত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি তাঁর যুহদ ও নির্মোহ স্বভাব তাঁকে পদ থেকে সরে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া তিনি বসরার মুসলমানদের বিলাসী জীবন যাপন লক্ষ্য করে আঁতকে ওঠেন। যারা কিছুদিন পূর্বেও সিদ্ধ ধানের চেয়ে উত্তম খাবার চিনতো না, এখন তারা পারস্যের অভিজাত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এই সময় তিনি মসজিদে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তার কিয়দংশ নিম্নরূপঃ

"বন্ধুগণ! দুনিয়া গতিশীল ও বিলীয়মান। তার বেশী অংশ অতিক্রান্ত হয়েছে। তোমরা নিশ্চিতভাবে এই দুনিয়া থেকে এমন এক স্থানে স্থানান্তরিত হবে যার কোন ধ্বংস নেই। তাহলে সর্বোত্তম পাথেয় সংগে নিয়ে যাচ্ছ না কেন? আমাকে বলা হয়েছে, যদি কোন প্রস্তর খণ্ড জাহান্নামের

কিনারা থেকে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সত্তর বছরেও তার তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহর কসম! তোমরা তা পূর্ণ করে ফেলবে। কি, তোমরা অবাক হচ্ছো? আল্লাহর কসম, আমাকে বলা হয়েছে, জান্নাতের দরযা এত প্রশস্ত হবে যে, সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে চল্লিশ বছর লাগবে। কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন সেখানে প্রচণ্ড ভীড় জমে যাবে। আমি যখন ঈমান আনি, তখন রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে মাত্র ছয় ব্যক্তি। অভাব ও দারিদ্র্যের এমন চরম অবস্থা ছিল যে, গাছের পাতাই ছিল আমাদের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন। সেই পাতা খেতে খেতে আমাদের ঠোঁটে ঘা হয়ে যেত। একদিন আমি একটি চাদর কুড়িয়ে পাই। সেটা ফেঁড়ে আমি ও সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস পরনের তহবন্দ বানিয়ে নিই। কিন্তু আজ এমন দিন এসেছে যখন আমাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের আমীর হয়েছে। আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বড় মনে করি— এমন অবস্থা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। নবুওয়াত শেষ হয়েছে। অবশেষে রাজতন্ত্র কায়েম হবে এবং খুব শিগগিরই তোমরা অন্যান্য আমীরদের পরীক্ষা করবে।" (মুসনাদে আহমাদ ইবন হাম্বল-৪/১৭৪)

অতঃপর হযরত 'উতবা (রা) হযরত মাজাশি' ইবন মাসউদকে ফুরাতের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেন এবং হযরত মুগীরা ইবন শু'বাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যান। সেখানে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রা)ও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি খলীফার নিকট দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান; কিন্তু খলীফা তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বার বার আবেদন করেন, আর খলীফাও বার বার তা প্রত্যাখ্যান করেন। খলীফা তাঁকে বসরায় ফিরে গিয়ে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি খলীফার নির্দেশ মেনে নেন। মক্কা থেকে বসরা অভিমুখে যাত্রাকালে উটের পিঠে আরোহণের পূর্ব মুহূর্তে অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি দু'আ করেন—'আল্লাহুম্মা লা তারুদ্দানী ইলাইহা, আল্লাহুম্মা লা তারুদ্দানী ইলাইহা—' ওহে আল্লাহ, তুমি আমাকে বসরায় ফিরিয়ে নিও না, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিও না। আল্লাহ পাক তাঁর দু'আ কবুল করেন। পথিমধ্যে হঠাৎ উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মা'দানে সালীম নামক স্থানে পঁচাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ১৭ মতান্তরে ২০। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থসমূহে 'উতবা ইবন গাযওয়ান থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

'আমের ইবন ফুহাইরা (রা)

নাম 'আমের, ডাক নাম আবু 'আমর। পিতা ফুহাইরা, মতান্তরে ফুহাইরা তাঁর মাতার নাম। ইবন হিশাম বলেন, 'আমের ইবন ফুহাইরা বনী আসাদের এক অনারব নিগ্রো দাস। হযরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে খরীদ করে আযাদ করে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫৯) অন্য একটি বর্ণনা মতে, 'আমের ছিলেন হযরত 'আয়িশার বৈপিত্রীয় ভাই ইযদ গোত্রের তুফাইল ইবন আবদিল্লাহর দাস। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হিজরাতের পূর্বে যাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন 'আমের ইবন ফুহাইরা তাদের মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩১৮)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কায় হযরত আরকামের গৃহে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই ইসলামের সেই সূচনা লগ্নে 'আমের ইবন ফুহাইরা তাওহীদের দাওয়াত কবুল করেন। একে তো অসহায় দাস, তার ওপর ইসলাম গ্রহণ, ফলে মুসীবতের পাহাড় তাঁর ওপর নেমে আসে। নির্যাতনের নানা রকম কৌশল তার ওপর প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনি সকল অত্যাচারের মুখেও পাহাড়ের মত অটল থাকেন। অবশেষে হযরত সিদ্দিকে আকবরের (রা) বদান্যতায় তিনি দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্তি পান। (উসুদুল গাবা-৩/১৯১)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন আবু বকর সিদ্দিককে (রা) সংগে করে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে 'সাওর' পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেন, তখন 'আমের ইবন ফুহাইরা সারাদিন 'সাওর' পর্বতের আশেপাশের চারণক্ষেত্রে আবু বকরের (রা) বকরী চরাতেন এবং যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকর (রা) অবস্থান করছিলেন, সন্ধ্যায় সেই গুহার নিকট ছাগলের পাল নিয়ে আসতেন। তারপর বকরীর দুধ দুইয়ে তাঁদের পানের ব্যবস্থা করতেন। আর এদিকে হযরত আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহ প্রতিদিন রাতে গোপনে সাওর পর্বতের গুহায় আসতেন রাসূলুল্লাহ (সা) ও সিদ্দীকে আকবরকে মক্কার অবস্থা জানাতে। সকালে তিনি যখন বাড়ীতে ফিরতেন 'আমের বকরীর পাল নিয়ে তার পিছে পিছে চলতেন, যাতে তাঁর পায়ের নিশানা মুছে যায় এবং কারো মনে কোন রকম সন্দেহ না দেখা দেয়। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৮৬, বুখারী-কিতাবুল মাগাযী)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকর (রা) সাওর পর্বতের গুহা থেকে বেরিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করেন এবং আবু বকর (রা) স্বীয় বাহনের পেছনে 'আমেরকে উঠিয়ে নেন। এভাবে 'আমের মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় তিনি হযরত সা'দ ইবন খুসাইমার (রা) অতিথি হন এবং হযরত হারিস ইবন আউসের সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। (তাবাকাতে ইবন সা'দ-৩/১৬৪)

মক্কা থেকে মদীনায় আগত যে সকল লোকের স্বাস্থ্যের জন্য প্রথম প্রথম মদীনার আবও-হাওয়া উপযোগী হচ্ছিল না 'আমের তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মদীনা আল্লাহর যমীনের মধ্যে সর্বাধিক জ্বরের এলাকা। সেখানে রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী সাথীরা ব্যাপকভাবে জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আবু বকর তাঁর দুই আযাদকৃত দাস—'আমের ইবন ফুহাইরা ও বিলালের সাথে একই ঘরে থাকতেন। তাঁরা সবাই জ্বরে পড়লেন। আমি তাঁদের দেখতে গেলাম। এটা পর্দার হুকুমের আগের কথা। প্রচণ্ড জ্বরে তখন তাঁদের অচেতন অবস্থা। প্রথমে আবু বকরের কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর আমি 'আমের ইবন ফুহাইরার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, " 'আমের, কেমন অনুভব করছেন?" তিনি দু'লাইন কবিতা আউড়িয়ে জবাব দিলেন,

"মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের পূর্বেই আমি তাকে পেয়েছি, নিশ্চয় কাপুরুষের মৃত্যু ওপর থেকে হঠাৎ আসে। প্রতিটি মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী বাঁচার চেষ্টা করে, যেমন গরু তার শিং দিয়ে চামড়া বাঁচিয়ে থাকে।"

'আয়িশা বলেন, "আল্লাহর কসম, 'আমের নিজেই জানেনা সে কী বলছে।" তারপর হযরত 'আয়িশা (রা) বিলালের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফিরে যান এবং তাঁদের অবস্থা রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন দু'আ করেন, "হে আল্লাহ, মদীনাকে তুমি আমাদের নিকট মক্কার মত বা তার চেয়ে বেশী পছন্দনীয় ও প্রিয় বানিয়ে দাও, তার খাদ্যদ্রব্যে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং তার রোগ-ব্যাধি 'মাহইয়া' নামক স্থানে সরিয়ে নাও।" [সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫৮৮-৮৯, সহীহুল বুখারী—বাবু হিজরাতিন নাবী ওয়া আসহাবিহি] রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আ কবুল হয় এবং তাঁরা সকলে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

হযরত 'আমের ইবন ফুহাইরা বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরিক ছিলেন। উহুদ যুদ্ধের পর আবু বারা 'আমের ইবন মালিক নামক এক ব্যক্তি মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন ; কিন্তু সে না করলো কবুল এবং না করলো প্রত্যাখ্যান। সে বললো, "হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি আপনার সাথীদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নাজদবাসীদের নিকট পাঠাতেন এবং তারা যদি নাজদীদের কাছে আপনার দাওয়াত পেশ করতেন তাহলে আমার বিশ্বাস তারা আপনার দাওয়াত কবুল করতো।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আমি নাজদীদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর আক্রমণের ভয় করছি।" আবু বারা বললো, "তাদের ব্যাপারে আমি জিম্মাদার। আপনি লোক পাঠান এবং তারা আপনার দ্বীনের দাওয়াত দিক।"

তার কথার উপর আস্থা রেখে হযরত রাসূলে কারীম (সা) চল্লিশ মতান্তরে সত্তর জন লোককে বাছাই করে একটি দল গঠন করেন। এই দলের মধ্যে হযরত 'আমের ইবন ফুহাইরাও ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে এই দলটি উহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার চতুর্থ মাসে ৪ হিজরী সনে মদীনা থেকে যাত্রা করে এবং বনী 'আমের ও হাররা বনী সুলাইমের মধ্যবর্তী 'বি'রে মা'উনা' নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করে।

অতঃপর তাঁরা হারাম ইবন মিলহানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি চিঠি 'আমের ইবন তুফাইলের কাছে পাঠান। চিঠিটি পাঠ না করেই 'আমের ইবন তুফাইল দূত হারাম ইবন মিলহানকে হত্যা করে। তারপর বনী সুলাইম, রি'ল ও যাকওয়ানের সহায়তায় দলটির ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে একমাত্র কা'ব ইবন যায়িদ মতান্তরে 'আমর ইবন উমাইয়া দামারী (রা) ছাড়া সকলকে হত্যা করে। হযরত কা'ব মারাত্মক আহত অবস্থায় কোন রকম বেঁচে যান। পরে তিনি খন্দক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৩-৮৬

গাদ্দার জাব্বার ইবন সালমার বর্শা যখন হযরত 'আমের ইবন ফুহাইরার (রা) বক্ষ বিদীর্ণ করে গেল, তখন অবলীলাক্রমে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল- 'ফুযতু ওয়াল্লাহ—আল্লাহর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।' লাশ লাফিয়ে আসমানের দিকে উঠে গেল। ফিরিশতারা তাঁর দাফন কাফন করে। তাঁর পবিত্র রূহের জন্য 'আলা 'ইল্লীয়্যীনের দরযা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। এই অলৌকিক দৃশ্য অবলোকনে ঘাতক জাব্বার ইবন সালমা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং এত প্রভাবিত হয় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করে। বি'রে মা'উনা'র এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) একাধারে চল্লিশ দিন ফজরের নামাযে 'কুনূতে নাযিলা' পাঠ করেন এবং এই ঘাতকদের জন্য বদ দু'আ করেন।

এই ঘটনার পর 'আমের ইবন তুফাইল মদীনায় আসে এবং রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করে, "হে মুহাম্মাদ, ঐ ব্যক্তি কে যাকে তীরবিদ্ধ করার পরই আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়?" রাসূলুল্লাহ

(সাঁ) বললেন, "সে 'আমের ইবন ফুহাইরা।" (টীকা সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৬, তাবাকাত ইবন সা'দ—মাগাযী)

হযরত 'আমের ইবন ফুহাইরার দেহের বাহ্যিক রং ছিল হাবশী নিগ্রোদের মত কালো এবং তাঁর ৩৪ (চৌত্রিশ) বছর জীবনের বেশীর ভাগ অত্যাচারী মনিবদের দাসত্ব ও গোলামীতে অতিবাহিত হয়েছে। তবে চারিত্রিক সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন মহীয়ান। তিনি বিভিন্ন বিপদ মুসীবতে যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তাতেই তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য অতি চমৎকার রূপে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। তিনি এমন বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বহু সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে তাঁর ওপর আস্থা রেখেছেন। শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে দুনিয়ার প্রতি উদাসীন করে তুলেছিল। তাই 'বি'রে মাউনা'র সংঘর্ষে যখন তাঁর বুকে বর্শা বিধিয়ে দেওয়া হলো, অবলীলায় তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'ফুযতু ওয়াল্লাহ—আল্লাহর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।'

আবদুল্লাহ ইবন সুহাইল (রা)

নাম 'আবদুল্লাহ, ডাক নাম বা কুনিয়াত আবু সুহাইল। পিতা সুহাইল এবং মাতা ফাখ্‌তা বিন্‌তু 'আমের।

ইসলামের প্রথম পর্বে ঈমান আনেন এবং হাবশা অভিমুখী দ্বিতীয় কাফিলার সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। কিছুদিন হাবশায় অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে এলে পিতা তাঁকে বন্দী করে এবং তাঁর ওপর নির্দয় অত্যাচার চালায়। 'আবদুল্লাহ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় মুশরিকী জীবনে বা পৌত্তলিকতায় ফিরে যাওয়ার ভান করেন। মাতা-পিতা ও মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাহ্যিক আচরণ দেখে ইসলাম পরিত্যাগ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়।

এদিকে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যান। মক্কা ও মদীনার মাঝে সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়। মক্কাবাসীরা 'আবদুল্লাহকে তাদের সহযোদ্ধা হিসেবে বদরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু যে হৃদয়ে একবার ঈমানের নূর প্রবেশ করে সেখানে যে কক্ষণো শিরকের অন্ধকার প্রবেশ করতে পারেনা—একথাটি তাদের জানা ছিল না। মূলতঃ 'আবদুল্লাহ কোনদিন ইসলাম ত্যাগ করেননি। তিনি শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। বদরে মুসলিম ও কুরাইশ বাহিনী মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমনি সময় সুযোগ বুঝে 'আবদুল্লাহ মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন।

এ আকস্মিক ঘটনায় 'আবদুল্লাহর পিতা ক্রোধে ফেটে পড়ে। সে এর প্রতিশোধকল্পে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাতে কোন লাভ হলোনা। 'আবদুল্লাহ তখন স্বাধীন, তাঁর দ্বীনী ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পিতার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়ছেন। অবশেষে বিজয় হলো মুসলমানদের। বদরের পর সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধেই হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে থেকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি শরিক ছিলেন। (আল-ইসাবা-২/৩২৩)

মক্কা বিজয়ের সময়ও হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। তাঁর পিতা সুহাইল তখনও মক্কায় কাফির অবস্থায় জীবিত। হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) পিতার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আমান বা নিরাপত্তা চাইলেন। এ সম্পর্কে তাঁর পিতা সুহাইল বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, আমি আমার ঘরে প্রবেশ করে দরযা বন্ধ করে দিলাম। তারপর আমার ছেলে আবদুল্লাহকে আমার নিরাপত্তার আবেদন জানানোর জন্য মুহাম্মাদের (সা) নিকট পাঠালাম। কারণ, আমি যে নিহত হবোনা, এমন বিশ্বাস আমার ছিল না। আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতাকে কি আমান বা নিরাপত্তা দান করছেন?" রাসূলুল্লাহ বললেন, "হাঁ। তাকে আল্লাহর আমানে আমান বা নিরাপত্তা দেওয়া গেল। সে আত্মপ্রকাশ করুক।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আশে পাশের লোকদের বললেন, "সুহাইল ইবন 'আমরকে কেউ যেন হেয় চোখে না দেখে। আল্লাহর কসম, সে একজন সম্মানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এমন ব্যক্তি কক্ষণো ইসলামের সৌন্দর্য থেকে অজ্ঞ থাকতে পারেনা। এখন তো সে দেখতে পেয়েছে, সে যার সাহায্যকারী ছিল তাতে কোন কল্যাণ নেই।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ শুনিয়ে সুসংবাদ দিলেন। পিতা পুত্রের সৌভাগ্যে আনন্দে বিগলিত হয়ে বলে ওঠেন, "আল্লাহর কসম, তুমি ছোটবেলা

ও বড় হয়ে—উভয় জীবনে সৎকর্মশীল।" রাসূলুল্লাহর (সা) এ আশ্বাসের পর সুহাইল দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান অবস্থায় তাঁর দরবারে হাজির হন। হুনাইন যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মক্কা থেকে রওয়ানা হন। পথে মক্কার অনতিদূরে 'জি'রানা' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) হুনাইনের গণীমত থেকে তাঁকে ১০০ (একশো) উট দান করেন। (হায়াতুস সাহাবা ১/১৭৩-১৭৪)

খলীফা আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে 'আরব উপদ্বীপে যাকাত অস্বীকারকারী ও ভণ্ড নবীদের যে বিদ্রোহ দেখা দেয়, হযরত আবদুল্লাহ (রা) সেই বিদ্রোহ দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হিজরী ১২ সনে ইয়ামামার প্রান্তরে ভণ্ড নবী মুসাইলামার সাথে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়, আবদুল্লাহ সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতানুসারে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আটত্রিশ বছর।

আবদুল্লাহর (রা) পিতা সুহাইল তখনও মক্কায় জীবিত। এ ঘটনার পর খলীফা হযরত আবু বকর (রা) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। তিনি আবদুল্লাহর পিতার সাথে দেখা করে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আবদুল্লাহর পিতা খলীফাকে বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'একজন শহীদ ব্যক্তি তার পরিবারের সত্তর (৭০) জনের শাফায়াত বা শুফারিশ করবে।' আমার আশা আছে, সে সময় আমার ছেলে আমাকে ভুলবে না।"

যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা)

নাম যায়িদ, ডাক নাম আবু আবদির রহমান। পিতা খাত্তাব ইবন নুফাইল, মাতা আসমা বিনতু ওয়াহাব। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের বৈমাত্রীয় ভাই এবং বয়সে হযরত 'উমার থেকে বড়। (উসুদুল গাবা-২/২২৮)

ইসলামের সূচনা পর্বে উমারের বাড়াবাড়ির কারণে যদিও খাত্তাবের বাড়ী সন্ত্রস্ত ছিল; তথাপি যায়িদ উমারের পূর্বেই ইসলাম কবুল করেন এবং মুহাজিরদের প্রথম কাফিলার সাথে মদীনায় হিজরাতও করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় আসার পর মা'ন ইবন 'আদী আল 'আজলানীর সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

মদীনায় আসার পর সর্বপ্রথম 'বদর' যুদ্ধে শরিক হন। তারপর উহুদেও অংশগ্রহণ করেন। দারুণ সাহসী ছিলেন। প্রত্যেক যুদ্ধে তিনি যতটা না বিজয় কামনা করতেন তারচেয়ে বেশী কামনা করতেন শাহাদাত। উহুদে তিনি অসীম সাহসের সাথে লড়ছেন। এমন সময় তাঁর ভাই উমার লক্ষ্য করলেন যায়িদের বর্মটি খুলে পড়ে গেছে এবং সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি নাঙ্গা শরীরে শত্রু বাহিনীর মাঝখানে ঢুকে পড়ছেন। উমার ভাইকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি চিৎকার করে ভাইকে ডেকে বললেন, "খুজ দিরয়ী' ইয়া যায়িদ, ফা কাতিল বিহা'—যায়িদ, এই নাও আমার বর্মটি। এটি পরে যুদ্ধ কর।"

যায়িদ উত্তর দিলেন, "ইন্নী উরীদু মিনাশ শাহাদাতি মা তুরীদুহু ইয়া উমার'—ওহে উমার, তোমার মত আমারও তো শাহাদাতের সুমধুর পানীয় পান করার আকাঙ্ক্ষা আছে।" তারপর দু'জনেই বর্ম ছাড়াই যুদ্ধ করেন। (তাবাকাত ইবন সা'দ-৩/২৭৫, হায়াতুস সাহাবা-১/৫১৫, রিজালুন হাওলার রাসূল-৩৪৪)

তিনি হুদাইবিয়ার ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন এবং হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাতে বাইয়াত করেন। তাছাড়া খন্দক, হুনাইন, আওতাস প্রভৃতি যুদ্ধেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। এ সফরেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী শোনেন, "তোমরা যা নিজেরা খাও, পর, তাই তোমাদের দাস-দাসীদের খাওয়াও, পরাও। যদি তারা কোন অপরাধ করে, আর তোমরা তা ক্ষমা করতে না পার, তাহলে তাকে বিক্রী করে দাও।" (তাবাকাত-৩/২৭৪)

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে ধর্মদ্রোহীদের যে ফিত্না বা অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা নির্মূলের জন্য হযরত যায়িদ অন্যদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেক মুরতাদকে তিনি স্বহস্তে হত্যা করেন। বিখ্যাত মুরতাদ 'নাহার ইবন 'উনফুহ্—যার ইসলাম ত্যাগ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) তার মুসলমান থাকাকালেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাকে হযরত যায়িদ নিজ হাতে খতম করেন। মুসাইলামা কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে ইসলামী ঝাণ্ডা বহনের দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। যুদ্ধ চলাকালে বনু হানীফা একবার এমন মারাত্মক আক্রমণ চালায় যে, মুসলিম বাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। কিছু সৈনিক তো যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এতে যায়িদের সাহস আরও বেড়ে যায়। তিনি চিৎকার করে সাথীদের আহ্বান জানিয়ে বলতে লাগলেন, "ওহে জনমণ্ডলী, তোমরা দাঁত কামড়ে ধরে শত্রু নিধন কার্য চালিয়ে যাও। তোমরা সুদৃঢ় থাক। আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাদের পরাজিত না করা অথবা আমি আল্লাহর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা আমি বলবো না। আল্লাহর সাথে মিলিত হলে সেখানেই আমি আত্মপক্ষ সমর্থন

করে কথা বলবো।" (রিজালুন হাওলার রাসূল-৩৪৫) তারপর তিনি সংগী-সাথীদের ভুলের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বলতে থাকেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'তাজিরু ইলাইকা মিন মিরারে আসহাবী'—হে আল্লাহ, আমার সংগী-সাথীদের ভেগে যাওয়ায় আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।" (হায়াতুস সাহাবা-১/৫৩৪-৩৫) এ অবস্থায় তিনি পতাকা দুলিয়ে শত্রু বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে চলে যান এবং তরবারি চালাতে চালাতে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের পর হযরত সালেম (রা) পতাকা তুলে নেন। হযরত যায়িদের মৃত্যুসন হিজরী ১২। (আল-ইসাবা-১/৫৬৫)

হযরত যায়িদ ছিলেন হযরত উমারের (রা) অতি প্রিয়জন। তাঁর মৃত্যুতে হযরত উমার অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর সামনে কোন মুসীবত উপস্থিত হলেই তিনি বলতেন, 'যায়িদের মৃত্যুশোক আমি পেয়েছি এবং সবর করেছি।' যায়িদের হত্যাকারীকে দেখে উমার (রা) বলেন, "তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি আমার ভাইকে হত্যা করেছো। প্রভাতের পূবালী বায়ু তারই স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে।" (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৯২) এত প্রিয় ভায়ের মৃত্যুশোকে তিনি কিন্তু দিশেহারা হয়ে পড়েননি। মদীনায় খলীফা আবু বকরের (রা) সাথে তিনি ইয়ামামা প্রত্যাগত সৈনিকদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। তাদের কাছে ভায়ের শাহাদাতের খবর শুনে তিনি বলে ওঠেন, "সাবাকানী ইলাল হুসনাইন আসলামা কাবলী ওয়া ইসতাশহাদা কাবলী'—দু'টি নেক কাজে তিনি আমার থেকে অগ্রগামী রয়ে গেলেন—আমার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমার আগে শাহাদাতও বরণ করলেন।" (আল-ইসাবা-১/৫৬৫)

ঠিক এই সময় আরবের তৎকালীন এক বিখ্যাত কবি মুতাম্মিম ইবন নুওয়াইরার এক ভাইও একটি যুদ্ধে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের হাতে নিহত হয়। কবি মুতাম্মিম তাঁর ভাইকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি মৃত ভায়ের স্মরণে এমন এক করুণ মরসিয়া রচনা করেন যে, তা শুনে শ্রোতাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো। ঘটনাক্রমে হযরত উমারের (রা) সাথে কবির সাক্ষাত হয়। উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তোমার ভায়ের মৃত্যুতে কতখানি শোক পেয়েছো?' কবি বললেন, "কোন এক রোগে আমার একটি চোখ থেকে অশ্রু বের হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভায়ের শোকে যেদিন থেকে সেই চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করে আজ পর্যন্ত তা আর বন্ধ হয়নি।" তার কথা শুনে হযরত উমার মন্তব্য করেন, "শোক-দুঃখের এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়। যে চলে যায় তার জন্য কেউ এতখানি ব্যথাতুর হয় না।" তারপর তিনি বলেন, "আল্লাহ যায়িদকে ক্ষমা করুন। যদি আমি কবি হতাম, তার জন্য আমি মরসিয়া রচনা করতাম।" একথা শুনে কবি মুতাম্মিম বলে ওঠেন, "আমীরুল মু'মিনীন, যদি আপনার ভায়ের মত আমার ভাই শহীদ হতো, আমি কক্ষণো অশ্রু বিসর্জন করতাম না।" কবির এ কথায় হযরত উমার (রা) অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করেন। তারপর তিনি বলেন, 'এর থেকে উত্তম সান্ত্বনা বাণী আর কেউ আমাকে শুনায়নি।'

বিভিন্ন ব্যক্তি হযরত যায়িদ ইবনুল খাত্তাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শুরাহবীল ইবন হাসানা (রা)

নাম শুরাহবীল, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু আবদিল্লাহ বা আবু 'আবদির রহমান। পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল মুতা', মাতা হাসানা। তবে আবু 'আমরের মতে হাসানা তাঁর মেয়ের নাম। যাই হোক, শুরাহবীলের পিতা মারা যাওয়ার পর তাঁর মা হাসানা দ্বিতীয়বার সুফইয়ান আনসারীকে বিয়ে করেন। এ কারণে তিনি পিতার পরিবর্তে মাতার নামের সাথে পরিচিত হন। এই হাসানার বংশ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন কিন্দা গোত্রের, কেউ বলেছেন বনী তামীম গোত্রের, আবার অনেকের মতে বনী জুমাহ গোত্রের। তিনি মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরিবারের অন্যদের সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। অতঃপর সেখান থেকে মদীনায় চলে যান। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৬৪, ৩৬৯)।

শুরাহবীল ইসলামের সূচনা পর্বেই মুসলমান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং মক্কা থেকে হাবশাগামী প্রথম কাফিলার সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। তারপর হাবশা থেকে সরাসরি মীদনায় আসেন এবং মায়ের দিক দিয়ে সম্পর্কিত বনী খুরাইক গোত্রে বসবাস করতে থাকেন। মদীনায় আসার পর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাত পর্যন্ত তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের অল্প কিছুদিন আগে তিনি মদীনায় আসেন। ইসলামের খিদমতে তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মজীবন শুরু হয় খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফত কালে।

হিজরী ১২ সনে খলীফা আবু বকর (রা) মুসলিম বাহিনীর শ্রেষ্ঠ চার সৈনিককে কমাণ্ডার হিসেবে নির্বাচন করেন। তাঁরা হলেনঃ ১· আমর ইবনুল 'আস, ২· ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান, ৩· আবু 'উবাইদা ইবনুল জাররাহ এবং ৪· শুরাহবীল ইবন হাসানা। প্রত্যেকের জন্য সৈনিক বাছাই করলেন এবং কে কোন্ পথে অগ্রসর হবেন তাও বলে দিলেন। বিজয়ের পর কে কোথাকার ওয়ালী হবেন সেটাও নির্ধারণ করে দিলেন। যথাঃ 'আমর ফিলিস্তীনের, ইয়াযীদ দিমাশ্‌কের এবং শুরাহবীল জর্দানের। (তারীখুল উম্মাহ্ আল ইসলামিয়্যাহ-১/১৯০-৯১) অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় পাঁচ জন সেনা কমাণ্ডারের নাম এসেছে। উপরে উল্লেখিত চারজনের মধ্যে তিনজন এবং আবু 'উবাইদার স্থলে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও ইয়াজ ইবন গান্‌ম আল ফিহ্‌র এর নাম বর্ণিত হয়েছে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৮৪, ১/২১৩) ইবনুল বারকী বলেন, খলীফা 'উমার (রা) শুরাহবীলকে শামের এক চতুর্থাংশের শাসক নিযুক্ত করেন। (আল ইসাবা ২/১৪৩)।

সিরিয়া অভিযানে বসরার যুদ্ধে শুরাহবীল ছিলেন একজন কমাণ্ডিং অফিসার। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তাঁর ও প্রতিপক্ষের নেতা 'রোমানাস'-এর মধ্যে মত বিনিময় হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি সৈন্য সুসংগঠিত করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন এমন সময় হযরত খালিদ এসে উপস্থিত হলেন। খালিদ প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে প্রতিপক্ষ জিযিয়া দানে সম্মত হয় (ফুতূহুল বুলদান—১১৯)।

বসরার পর রোমানরা আজনা দাইনে সমবেত হয়। খালিদ তাদের প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হন। কিছুদুর যাওয়ার পর শুরাহবীলও তাঁর সাথে যোগ দেন। উভয়ে সম্মিলিতভাবে রোমান বাহিনীর মুখোমুখি হন এবং এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। দিমাশ্‌ক অভিযানে তিনি পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার এবং অবরোধের সময় একটি ফটক প্রহরার দায়িত্বে ছিলেন। বিজয়ের সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

দিমাশ্‌ক বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী 'ফাহল'-এর পথে 'বীসান'-এর দিকে অগ্রসর হয়। প্লাবনের কারণে পথিমধ্যে 'ফাহল'-এ তাদের যাত্রাবিরতি করতে হয়। এ বাহিনীর সাথেও শুরাহ্‌বীল ছিলেন। তারই সতর্কতায় মুসলিম বাহিনী এক মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা পায়। মূলতঃ রোমানরা সমুদ্রের একটি বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে 'ফাহল' ও 'বীসান'-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্লাবনের সৃষ্টি করে। মুসলিম বাহিনী যাত্রাবিরতি করে ফাহল-এ শিবির স্থাপন করে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে শুরাহবীল সারা রাত জেগে শিবির পাহারা দিতেন যাতে রোমানরা অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে। সত্যি সত্যিই রোমানরা একদিন হঠাৎ পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসে কিন্তু শুরাহবীলের দূরদর্শিতা ও সতর্কতার ফলে রোমানরা পরাজিত হয়।

ফাহল-এর পর শুরাহবীল ও 'আমর ইবনুল 'আস 'বীসান'-এর দিকে অগ্রসর হন। বীসান-এর অধিবাসীরা ফাহল-এর পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছিল। তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে কিল্লার দরজা বন্ধ করে দেয়। শুরাহবীল বীসান পৌঁছেই কিল্লা অবরোধ করেন। দীর্ঘদিন এ অবরোধ চলতে থাকে। একদিন কতিপয় লোক কিল্লা থেকে বের হয়ে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করলে তাদের হত্যা করা হয়। অবশেষে তারা দিমাশ্‌কের শর্তাবলীতে সন্ধি করে। এরপর 'তিবরিয়া'-এর অধিবাসীরা শুরাহবীলের নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অতঃপর হযরত শুরাহবীল জর্দান এলাকা ও এর আশেপাশের সকল শহর প্রায় বিনা বাধায় ও বিনা রক্তপাতে ইসলামী শাসনের অধীনে আনেন।

ইয়ারমুক অভিযানে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার সকল অঞ্চল থেকে গুটিয়ে ইয়ারমুকে সমবেত হয়। হযরত শুরাহবীলও আসেন। তিনি ও ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান একই স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। খালিদ ছিলেন এ অভিযানের সিপাহসালার বা প্রধান সেনাপতি। তিনি গোটা সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে ছত্রিশটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি ভাগকে একজন অফিসারের অধীনে ন্যস্ত করেন। ডান ও বাম ভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত 'আমর ইবনুল 'আস ও শুরাহবীল ইবন হাসানার ওপর। এ যুদ্ধে রোমানদের প্রথম আঘাতেই মুসলিম বাহিনীর অবস্থা যখন টলটলায়মান এবং অনেকে ময়দান থেকে ভেগে যায় তখনও শুরাহবীল অটল। এ যুদ্ধে তিনি জীবন বাজি রেখে লড়েন।

হিজরী ১৮ সনে মুসলিম বাহিনী সিরিয়া অভিযানে লিপ্ত। এ সময় ইরাক, সিরিয়া ও মিসরে মহামারি আকারে প্লেগ দেখা দেয়। 'আমর ইবনুল 'আস বললেন, 'এই প্লেগ হচ্ছে আল্লাহর আযাব। সুতরাং তোমরা বিভিন্ন উপত্যকা ও গিরিপথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়।' একথা শুনে শুরাহবীল ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমর ঠিক কথা বলেনি। আমি যখন রাসূলুল্লাহর সংগী তখনও 'আমর তার পরিবারের উটের চেয়েও পথভ্রষ্ট। নিশ্চয় এ প্লেগ তোমাদের নবীদের দু'আ রবের রহমত এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বহু সত্যনিষ্ঠ লোক এতে মৃত্যুবরণ করেছেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৮১) তিনি ছিলেন একান্তভাবে আল্লাহ-নির্ভর ব্যক্তি। তাই রোগের ভয়ে স্থান ত্যাগ করা সমীচীন মনে করেননি। তিনি স্থান ত্যাগ করলেন না। বর্ণিত আছে হযরত মু'য়াজ ইবন জাবাল, আবু উবাইদাহ, শুরাহবীল ইবন হাসানা ও আবু মালিক আল-আশয়ারী (রা) একই দিন প্লেগে আক্রান্ত হন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৮২) 'আমওয়াসের এই প্লেগে অনেকের সাথে হযরত শুরাহবীল ইবন হাসানা ৬৭ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। অবশ্য ইবন ইউনূস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) শুরাহবীলকে মিসরু পাঠান এবং সেখানেই তিনি মারা যান। (আল ইসাবা-২/১৪৩) ইবন ইউনূসের মতটি বিভিন্ন কারণে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে হয়।

হযরত শুরাহবীলের সারাটি জীবন হাবশা প্রবাসে এবং পরবর্তীতে জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত হলেও রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন অংশে পিছিয়ে নন। তিনি বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শিফা বিনতু 'আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গেলাম কিছু সাদকা চাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি সাদকা দানে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন, আর আমিও চাপাচাপি করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে এলো। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে বের হয়ে আমার মেয়ের ঘরে গেলাম। শুরাহবীল ইবন হাসানার স্ত্রী আমার মেয়ে। আমি শুরাহবীলকে ঘরেই পেলাম। আমি তাকে বললাম, নামাযের সময় হয়েছে, আর তুমি ঘরে বসে আছ? আমি তিরস্কার করতে লাগলাম। তখন সে বললো, আমাকে তিরস্কার করবেন না। আমার একখানা মাত্র কাপড়, সেটাও রাসূলুল্লাহ (সা) ধার নিয়েছেন। আমি বললাম, আমার মা-বাবা কুরবান হোক! আজ সারাদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ঝগড়া করছি, অথচ তাঁর এ করুণ অবস্থা আমি মোটেও বুঝতে পারিনি। শুরাহবীল বলেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) একখানা মাত্র কাপড়, আমরা তাতে তালি লাগিয়ে দিয়েছি।' (হায়াতুস সাহাবা-১/৩২৬)।

আবুল 'আস ইবন রাবী' (রা)

আবুল 'আসের প্রকৃত নামের ব্যাপারে ইতিহাসে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। যেমনঃ লাকীত, হাশীম, মিহশাম, ইয়াসির, ইয়াসিম ইত্যাদি। তবে তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম আবুল 'আস'। এ নামেই তিনি ইতিহাসে খ্যাত। তাঁর পিতা 'রাবী' ইবনে 'আবদিল 'উয্যা, মাতা হযরত খাদীজার (রা) সহোদরা হালা বিন্তু খুওয়াইলিদ। তিনি কুরাইশ গোত্রের 'আবদু শামস' শাখার সন্তান হওয়ার কারণে তাঁকে সংক্ষেপে 'আবশামী' বলা হয়। খালা হযরত খাদীজা (রা) ও খালু রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীতে আবুল 'আসের অবাধ যাতায়াত ছিল। তিনি ছিলেন খালা-খালুর অতি স্নেহের পাত্র।

আবুল 'আস ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করেন। তাঁর আকর্ষণীয় চেহারা সকলের মন কেড়ে নেয়। বংশ গৌরব এবং আরবীয় বীরত্ব, প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদি গুণের জন্য তৎকালীন মক্কার যুবকদের মধ্যে তিনি এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। তদুপরি কুরাইশদের যে বিশেষ গুণের কথা কুরআনে ঘোষিত হয়েছে—'রিহ্লাতাশ শিতায়ি ওয়াস সাঈফ—শীতকালে ইয়ামনের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে শামের দিকে তাদের বাণিজ্য কাফিলা চলাচল করে'—আবুল 'আসের মধ্যেও এ গুণটির পুরোপুরি বিকাশ ঘটে। মক্কা ও শামের মধ্যে সব সময় তার বাণিজ্য কাফিলা যাতায়াত করে। সেই কাফিলায় থাকে কমপক্ষে একশো উটসহ দু'শো লোক। তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি, সততা ও আমানতদারীর জন্য মানুষ তাঁর কাছে নিজেদের পণ্যসম্ভার নিশ্চিন্তে সমর্পণ করে। ইবন ইসহাক বলেন, 'অর্থসম্পদ, আমানতদারী ও ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি তখন মক্কার গণ্যমান্য মুষ্টিমেয় লোকদের অন্যতম।' (আল-ইসাবা-৪/১২২)

সময় আপন গতিতে বয়ে চললো। এদিকে মুহাম্মাদের (সা) বড় মেয়ে যয়নাব বেড়ে ওঠেন। মক্কার সম্ভ্রান্ত যুবকরা তাঁকে জীবন সঙ্গীনী হিসেবে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর ব্যাকুল হবেই বা না কেন ? যয়নাব হলেন, মক্কার কুরাইশ গোত্রের সর্বোত্তম শাখার কন্যা। পিতা-মাতার দিক দিয়ে যেমন সর্বাধিক সন্মানিত, তেমনি চরিত্র ও আদব-আখলাকের দিক দিয়েও সবচেয়ে বেশী পূতঃপবিত্র। এমন পাত্রীর আশা করলেই কি সবার ভাগ্যে জোটে ? অবশেষে মক্কার যুবক তাঁরই খালাতো ভাই আবুল 'আস ইবন রাবী' এ গৌরব লাভে ধন্য হন।

আবুল 'আসের সাথে যয়নাবের (রা) বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। সত্য দ্বীন ও হিদায়াত সহকারে তিনি প্রেরিত হন। নিজের নিকট আত্মীয়দের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর নির্দেশ লাভ করেন। হযরত খাদীজা (রা) ও তাঁর কন্যারা যথাঃ যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর ঈমান আনেন। অবশ্য ফাতিমা তখন খুব ছোট।

রাসূলুল্লাহর (সা) জামাই আবুল 'আস স্ত্রী যয়নাবকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সম্মানও করতেন। কিন্তু তিনি পূর্ব পুরুষের ধর্মত্যাগ করে প্রিয়তমা স্ত্রীর নতুন দ্বীন কবুল করতে রাজী হলেন না। এ অবস্থা চলতে লাগলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও কুরাইশদের মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো,

"তোমাদের সর্বনাশ হোক ! তোমরা মুহাম্মাদের মেয়েদের বিয়ে করে তার দুশ্চিন্তা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিচ্ছ। তোমরা যদি এসকল মেয়েকে তার কাছে ফেরৎ পাঠাতে তাহলে সে তোমাদের ছেড়ে তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতো।" তাদের মধ্যে অনেকে এ কথা সমর্থন করে বললো, "এ তো

অতি চমৎকার যুক্তি!" তারা সবাই আবুল 'আসের কাছে যেয়ে বললো, "আবুল 'আস, তুমি তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দাও। তার পরিবর্তে তুমি যে কুরাইশ সুন্দরীকে চাও, আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দেব।" আবুল 'আস বললেন, "আল্লাহর কসম! না, তা হয় না। আমার স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করতে পারিনে। তার পরিবর্তে সকল নারী আমাকে দিলেও আমার তা পছন্দনীয় নয়।"

রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য দুই মেয়ে রুকাইয়া ও উম্মু কলুসুমকে তাদের স্বামীগৃহ থেকে বিদায় দিয়ে পিতার কাছে পাঠিয়ে দিল। কন্যাদের স্বামী পরিত্যাক্তা হয়ে ফিরে আসায় হযরত রাসূলে কারীম (সা) খুব খুশী হলেন। তিনি মনে মনে কামনা করলেন, অন্য দু' জামাইর মত আবুল 'আসও যদি যয়নাবকে বিদায় দিত! যেহেতু আবুল 'আসের হাত থেকে যয়নাবকে ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাসূলুল্লাহর (সা) ছিল না এবং মুশরিকদের (পৌত্তলিক) সাথে মুমিন নারীদের বিয়ে তখনও হারাম ঘোষিত হয়নি, একারণে তিনি চুপ থাকলেন।

সময় দ্রুত বয়ে চললো। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় হিজরাত করলেন। কুরাইশদের সাথে সামরিক সংঘাত শুরু হলো। কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদরে সমবেত হল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও আবুল 'আস কুরাইশদের সাথে বদরে গেলেন। কারণ কুরাইশদের মধ্যে তাঁর যে স্থান তাতে না যেয়ে উপায় ছিলনা। বদরে কুরাইশরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। তাদের বেশ কিছু নেতা নিহত হয় এবং বহু সংখ্যক যোদ্ধা বন্দী হয়। আর অবশিষ্টরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এই বন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) জামাই আবুল 'আসও ছিলেন। ইবন ইসহাক বলেন, বদরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ইবন নু'মান (রা) তাঁকে বন্দী করেন। তবে ওয়াকীদীর মতে হযরত খিরাশ ইবন সাম্মাহর (রা) হাতে তিনি বন্দী হন। (আল-ইসাবা-৪/১২২)

বদরের বন্দীদের ব্যাপারে মুসলমানদের সিদ্ধান্ত হল, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। বন্দীদের সামাজিক মর্যাদা এবং ধনী-দরিদ্র প্রভেদ অনুযায়ী এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারিত হল। বন্দীদের প্রতিনিধিরা ধার্যকৃত মুক্তিপণ নিয়ে মক্কা-মদীনা ছুটাছুটি শুরু করে দিল। নবী দুহিতা হযরত যয়নাব স্বামী আবুল 'আসের মুক্তিপণ দিয়ে মদীনায় দূত পাঠালেন। ওয়াকীদীর মতে আবুল 'আসের মুক্তিপণ নিয়ে মদীনায় এসেছিল তাঁর ভাই 'আমর ইবন রাবী'। হযরত যয়নাব মুক্তিপণ দিরহামের পরিবর্তে একটি হার পাঠালেন। এই হারটি তাঁর জননী হযরত খাদীজা (রা) বিয়ের সময় তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) হারটি দেখেই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং স্বীয় বিষণ্ন মুখ একটা পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললেন। প্রিয়তমা স্ত্রী ও কন্যার স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠলো।

কিছুক্ষণ পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, "যয়নাব তার স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে এই হার পাঠিয়েছে। তোমরা ইচ্ছা করলে তার বন্দীকে ছেড়ে দিতে পার এবং এ হারটিও তাকে ফেরত দিতে পার।" সাহাবীরা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাই করবো।" সাহাবীরা রাজী হয়ে গেলেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) আবুল 'আসকে মুক্তি দেওয়ার আগে তার নিকট থেকে এই অঙ্গীকার নেন যে, সে মক্কায় ফিরে গিয়ে অনতিবিলম্বে যয়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবে।

আবুল 'আস মক্কা ফিরে গিয়েই প্রতিশ্রুতি পালনের তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। তিনি স্ত্রী যয়নাবকে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তিনি যয়নাবকে একথাও বললেন যে, মক্কার অনতিদূরে তোমার পিতার প্রতিনিধিরা তোমাকে নেওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছে। আবুল আস স্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তাঁর ভাই আমর মতান্তরে কিনানাকে ডেকে যয়নাবের সাথে যেতে বললেন এবং তাকে অপেক্ষমান দূতদের হাতে তুলে দিতে বললেন।

ইবন ইসহাক বলেন, সফরের প্রস্তুতি শেষ হলে যয়নাবের দেবর কিনানা ইবন রাবী' একটি উট এনে দাঁড় করালো। যয়নাব উটের পিঠের হাওদায় উঠে বসলেন। আর কিনানা স্বীয় ধনুকটি কাঁধে ঝুলিয়ে তীরের বাণ্ডিলটি হাতে নিয়ে দিনে দুপুরে মক্কা থেকে বের হলো। কুরাইশদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। তারা ধাওয়া করে একটু দূরেই 'যী-তুওয়া' উপত্যকায় তাদের দু'জনকে ধরে ফেললো।

আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে সীরাত গ্রন্থসমূহে নানারকম বর্ণনা পাওয়া যায়। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। কিনানা ইবন রাবী' কুরাইশদের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে কাঁধের ধনুকটি নামিয়ে হাতে নিয়ে তীরের বাণ্ডিলটি সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বললো, "তোমাদের কেউ যয়নাবের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করলে তার বক্ষ হবে আমার তীরের লক্ষ্যস্থল।" কিনানা ছিল একজন দক্ষ তীরন্দায়, তার নিক্ষিপ্ত কোন তীর সচরাচর লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না, কিনানার এ কথা শুনে আবু সুফইয়ান ইবন হারব তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো,

"ভাতীজা, তুমি যে তীরটি আমাদের দিকে তাক করে রেখেছো তা একটু ফিরাও, আমরা তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।" আবু সুফইয়ান বললো,

"তোমার কাজটি ঠিক হয়নি, তুমি প্রকাশ্যে মানুষের সামনে দিয়ে যয়নাবকে নিয়ে বের হয়েছো, আর আমরা বসে বসে তা দেখছি। সমগ্র আরবের অধিবাসী জানে, বদরে আমাদের কী দুর্দশা ঘটেছে এবং এই যয়নাবের বাপ আমাদের কী সর্বনাশটাই না করেছে। তুমি যদি এভাবে প্রকাশ্যে তার মেয়েকে আমাদের নাকের ওপর দিয়ে নিয়ে যাও তাহলে সবাই আমাদেরকে কাপুরুষ ভাববে এবং এ কাজটি সবাই আমাদের জন্য অপমান বলে বিবেচনা করবে। তুমি যয়নাবকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কিছুদিন সে তার স্বামীর ঘরে থাকুক। এদিকে যখন লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করবে যে, আমরা যয়নাবকে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধা দিয়েছি, তখন তুমি তাঁকে গোপনে তার বাপের কাছে পৌঁছে দিও।"

একথায় কিনানা/আমর রাজী হয়ে গেল, যয়নাব মক্কায় ফিরে এল। কিছুদিন পর রাতের অন্ধকারে সে আবার যয়নাবকে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলো এবং ভায়ের নির্দেশমত তাঁকে তাঁর পিতার প্রতিনিধিদের হাতে নির্দিষ্ট স্থানে সমর্পণ করলো।

তাবারানী উরওয়াহ ইবন যুবাইর হতে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি যয়নাব বিনতু রাসূলুল্লাহকে সাথে নিয়ে বের হলো, কুরাইশদের দু'ব্যক্তি পিছু ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলে। তারা যয়নাবের সংগী লোকটিকে কাবু করে তাঁকে উটের পিঠ থেকে ফেলে দেয়। যয়নাব একটি পাথরের ওপর ছিটকে পড়েন। তার শরীর কেটে গিয়ে রক্ত বের হয়ে যায়। এ অবস্থায় তারা যয়নাবকে আবু সুফইয়ানের নিকট নিয়ে যায়। আবু সুফইয়ান তাঁকে বনী হাশিমের মেয়েদের কাছে সোপর্দ করে। পরে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন, উটের পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় যয়নাব যে ব্যথা পান, আমরণ তিনি সে ব্যথা অনুভব করতেন এবং সেই ব্যথায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন। এজন্য লোকে তাঁকে শহীদ মনে করতো। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭১)।

হযরত আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর কন্যা যয়নাব কিনানার সাথে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হলো। মক্কাবাসীরা তাদের পিছু ধাওয়া করলো। হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম যয়নাবকে ধরে ফেললো। সে যয়নাবের উটটি তীরবিদ্ধ করলে যয়নাব পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। সে ছিল সন্তানসম্ভবা। এই আঘাতে তাঁর গর্ভের সন্তানটি নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর বনু হাশিম ও বনু উমাইয়্যা যয়নাবকে নিয়ে বিবাদ শুরু করে দিল। অবশেষে সে হিন্দা বিনতু 'উতবার নিকট অবস্থান করতে লাগলো। হিন্দা প্রায়ই তাকে বলতো, 'তোমার এ বিপদ তোমার পিতার জন্যই হয়েছে।'

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদ ইবন হারিসাকে বললেন, 'তুমি কি যয়নাবকে আনতে পারবে?' যায়িদ রাজী হলো। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যায়িদকে একটি আংটি দিয়ে বললেন, "এটা নিয়ে

যাও। এটা যয়নাবের কাছে পৌঁছাবে।" আংটিটি নিয়ে যায়িদ মক্কার দিকে চললো। মক্কার উপকণ্ঠে সে এক রাখালকে ছাগল চরাতে দেখলো। সে রাখালকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কার রাখাল?' রাখাল বললো, 'আবুল আসের।' আবার জিজ্ঞেস করলো, 'ছাগলগুলি কার?' বললো, 'যয়নাব বিনতু মুহাম্মাদের।' যায়িদ কিছুদূর রাখালের সাথে চললো। তারপর তাকে বললো, "আমি যদি একটি জিনিস তোমাকে দিই, তাকি তুমি যয়নাবের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?" সে রাজী হলো। যায়িদ তাকে আংটিটি দিল, আর রাখাল সেটি যয়নাবের হাতে পৌঁছে দিল।

যয়নাব রাখালকে জিজ্ঞাস করলো, 'এটি তোমাকে কে দিয়েছে?' বললো, 'একটি লোক।' আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তাকে কোথায় ছেড়ে এসেছো?' বললো, 'অমুক স্থানে।' যয়নাব চুপ থাকলো। রাতের আঁধারে যয়নাব চুপে চুপে সেখানে গেল। যায়িদ তাকে বললো, 'তুমি আমার উটের পিঠে উঠে আমার সামনে বস।' যয়নাব অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো, 'না আপনিই আমার সামনে বসুন।' এভাবে যয়নাব যায়িদের পেছনে বসে মদীনায় পৌঁছলো। হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রায়ই বলতেন, 'আমার সর্বোত্তম মেয়েটি আমার জন্যই কষ্ট ভোগ করেছে।' (হায়াতুস সাহাবা—১/৩৭১-৭২)।

স্ত্রী যয়নাব থেকে বিচ্ছেদের পর আবুল 'আস কয়েক বছর মক্কায় কাটালেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন আগে একটা বাণিজ্য কাফিলা নিয়ে তিনি সিরিয়া গেলেন। বাণিজ্য শেষে তিনি মক্কায় ফিরছেন। একশো উট ও প্রায় এক শো সত্তর জন লোকের কাফিলা। যখন তারা মদীনার কাছাকাছি স্থানে তখন মদীনা থেকে যায়িদ বিন হারিসার নেতৃত্বে প্রেরিত একটি ক্ষুদ্র টহলদানকারী বাহিনী তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং উটসহ সকল লোক বন্দী করে মদীনায় নিয়ে যায়। তবে আবুল 'আস পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

অবশ্য মূসা ইবন 'উকবার মতে, আবু বাসীর ও তাঁর বাহিনী আবুল 'আসের কাফিলার ওপর আক্রমণ চালায়। উল্লেখ্য যে, এই আবু বাসীর ও আরো কিছু লোক হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করে। তবে সন্দির শর্তানুযায়ী মদীনাবাসীরা তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ফলে তারা মক্কা থেকে পালিয়ে গিয়ে লোহিত সাগরের উপকূলীয় এলাকায় বসবাস করতে থাকে। তারা মক্কার বাণিজ্য কাফিলায় অতর্কিত হামলা চালাতে থাকে। তাদের ভয়ে কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। মক্কার কুরাইশরা বাধ্য হয়ে তাদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহকে অনুরোধ করে। (আল-ইসাবা—৪/১২২)।

যাই হোক আবুল 'আস পালিয়ে মক্কায় না গিয়ে ভীত সন্ত্রস্তভাবে রাতের অন্ধকারে গোপনে মদীনায় প্রবেশ করেন এবং সোজা যয়নাবের কাছে পৌঁছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। যয়নাব তাঁকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন।

রাত কেটে গেল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন। তিনি মিহরাবে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর তাহরীমা বেঁধেছেন। পেছনের মুক্তাদীরাও তাকবীর তাহরীমা শেষ করেছে। এমন সময় পেছনে মেয়েদের কাতার থেকে যয়নাবের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "জনমণ্ডলী, আমি মুহাম্মাদের কন্যা যয়নাব। আমি 'আবুল আসকে নিরাপত্তা দিয়েছি, আপনারাও তাকে নিরাপত্তা দিন।"

সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যা শুনেছি, তোমরাও কি তা শুনেছো?"

লোকেরা জবাব দিল, "হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ, আমি এ ঘটনার কিছুই জানিনে। সে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে তাকে

নিরাপত্তা দান করেছে।" অতঃপর তিনি বাড়ীতে যেয়ে মেয়েকে বললেন, "আবুল আসের থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা করবে। তবে জেনে রেখ তুমি আর তাঁর জন্য হালাল নও।"

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) সেই বাহিনীর লোকদের ডাকলেন, যারা আবুল 'আসের কাফিলার উট ও লোকদের বন্দী করে নিয়ে এসেছিল। তিনি তাদের বললেন, "আমাদের মধ্যে এই লোকটির (আবুল 'আস) মর্যাদা সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত আছ। তোমরা তার বাণিজ্য সম্ভার কেড়ে নিয়ে এসেছো। তোমরা তার প্রতি সদয় হয়ে তার মালামাল ফেরত দিলে আমি খুশী হব। আর তোমরা রাজী না হলে আমার কোন আপত্তি নেই। আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে তোমরা সেই মাল ভোগ করতে পার। তোমরাই সেই মালের অধিক হকদার।"

তারা সকলে বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তার সমুদয় মাল ফেরত দেব।'

আবুল 'আস চললেন তাদের সাথে মালামাল বুঝে নিতে। তারা আবুল 'আসকে বললো, "শোন আবুল 'আস, কুরাইশদের মধ্যে তুমি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাই। তুমি এক কাজ কর। ইসলাম গ্রহণ করে মক্কাবাসীদের এই মালামালসহ মদীনায় থেকে যাও। বেশ আরামে থাকবে।" আবুল 'আস বললেন, "তোমরা যা বলছো তা খুবই খারাপ কথা। আমি কি আমার নতুন দ্বীনের জীবন শুরু করবো শঠতার মাধ্যমে?"

আবুল 'আস তাঁর কাফিলা ছাড়িয়ে নিয়ে মক্কায় পৌঁছলেন। মক্কায় যার যার মাল তাকে বুঝে দিয়ে তিনি বললেন, "ওহে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! আমার কাছে তোমাদের আর কোন কিছু পাওনা আছে কি?" তারা বললো, "না, আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমরা তোমাকে চমৎকার প্রতিশ্রুতি পালনকারীরূপে পেয়েছি।"

আবুল 'আস আরো বললেন, "আমি তোমাদের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করেছি। এখন আমি ঘোষণা করছি—আশহাদু আনলাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

মদীনায় অবস্থানকালে আমি এ ঘোষণা দিতে পারতাম। কিন্তু তা দিইনি এ জন্য যে, তোমরা ধারণা করতে আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছি। আল্লাহ যখন তোমাদের যার যার মাল ফেরত দেওয়ার তাওফীক আমাকে দিয়েছেন এবং আমি আমার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি, তখনই আমি ইসলামের ঘোষণা দিচ্ছি।

অতঃপর হযরত আবুল 'আস মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহর খিদমতে হাজির হন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সম্মানের সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্ত্রী যয়নাবকেও তাঁর হাতে সোপর্দ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন, "সে আমাকে যা বলেছে, সত্য বলেছে। আমার সাথে ওয়াদা করেছে এবং তা পালনও করেছে।"

হযরত আবুল 'আস (রা) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কোন যুদ্ধে যোগদানের সুযোগ পাননি। হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে হিজরী ১২ সনের জিলহজ্জ মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। তবে ইবন মুন্দাহর মতে, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। (আল-ইসাবা—৪/১২৩, আল-ইসতিয়াব)

হযরত যয়নাব ও আবুল 'আসের মেয়ে উমামাকে রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই স্নেহ করতেন। নামাযের মধ্যে তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন বলে বর্ণিত আছে।

উমাইর ইবন ওয়াহাব (রা)

নাম 'উমাইর, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু উমাইয়্যা। পিতা ওয়াহাব, মাতা উম্মু সাখীলা। কুরাইশদের অন্যতম বীর নেতা। ইসলাম-পূর্ব জীবনে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর (সা) চরম দুশমন। তীক্ষ্ণ ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন প্রখর অনুধাবন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

তিনি বদর যুদ্ধে মককার কুরাইশ বাহিনীর সাথে যোগ দেন এবং যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে কুরাইশ বাহিনী তাকে মুসলিম বাহিনীর শক্তি নিরূপণের দায়িত্ব দেয়। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে মুসলিম বাহিনীর আশে পাশে চক্কর মেরে কুরাইশ ছাউনীতে ফিরে গিয়ে জানান, "তারা তিনশো'র মত হবে। এর কিছু কম বা বেশীও হতে পারে।" তাঁর অনুমান যথাযথ ছিল। কুরাইশরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "পেছনে তাদের কোন সাহায্য আসার সম্ভাবনা আছে কি?" তিনি জবাব দেন, "তেমন কিছু আমি পাইনি। তবে হে কুরাইশ গণ! আমি তাদের উটগুলিকে কঠিন মৃত্যুকে বহন করতে দেখেছি। তরবারিগুলি ছাড়া তাদের আত্মরক্ষার আর কিছু নেই, আশ্রয় নেওয়ারও কোন স্থান নেই। আল্লাহর কসম, আমার মনে হয়েছে, তোমরা তাদের একজনকে হত্যা করলে তোমাদেরও একজন নিহত হবে। যদি তাদেরই সমসংখ্যক তোমাদের নিহত হতে হয় তাহলে আর লাভ কি? এখন তোমরা ভেবে দেখ কি করবে।" যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি কুরাইশদের একথাও বলেন, "মদীনার লোকদের চেহারা সাপের মত, চরম পিপাসায়ও তারা কাতর হয় না। আমাদের সাথে যুদ্ধ করে প্রতিশোধ নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব। তোমাদের মত উজ্জ্বল চেহারার লোকদের তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত নয়।"

কুরাইশ নেতৃবর্গের অনেকেই তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়। তারা প্রায় মককায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বসে। কিন্তু আবু জাহল তাদের সিদ্ধান্তে বাধ সাধে। হিংসা ও যুদ্ধের আগুনে তার অন্তর জ্বলছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় এ যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন হয় আবু জাহল। আর অনেকের সাথে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয় উমাইরের পুত্র ওয়াহাব।

উমাইর ইবন ওয়াহাব স্বীয় পুত্র ওয়াহাবকে মুসলমানদের হাতে বন্দী অবস্থায় ফেলে রেখে বদর থেকে নিজে প্রাণ বাঁচিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল, মক্কায় তিনি রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবীদের ওপর যে অত্যাচার করেছেন হয়তো তাঁর বদলা নেওয়া হবে বন্দী পুত্রের ওপর।

মক্কায় ফিরে এসে একদিন সকাল বেলা ঘর থেকে বেরিয়ে কাবার দিকে গেলেন তাওয়াফ ও মূর্তিকে সিজদার উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাকে কাবার চত্বরে বসা দেখতে পেলেন। তিনি সাফওয়ানের কাছে গিয়ে বললেনঃ

—ওহে কুরাইশদের সরদার, সুপ্রভাত।

—আবু ওয়াহাব, সুপ্রভাত। বস, একটু কথা বলি। কথা বললে সময় একটু কাটবে।

উমাইর সাফওয়ানের পাশে বসলেন। তারা বদরের অবস্থা, বদরে আপতিত মুসীবতের কথা আলোচনা করলেন এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর সংগীদের হাতে বদরে কে কে বন্দী হয়েছে তা গুণলেন। বদরে যেসব কুরাইশ নেতাকে হত্যা করে 'কালীব' কূপে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আবেগ-উত্তেজনায় এক পর্যায়ে সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা বললোঃ আল্লাহর কসম, এভাবে তাদের নিহত হওয়ার পর কোন কিছুই আর ভালো লাগছে না। উমাইর বললেনঃ

—তুমি সত্য বলেছ। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেনঃ কা'বার প্রভুর নামে শপথ করে বলছি, যদি আমার ঘাড়ে ঋণের বোঝা এবং পরিবার পরিজনের দায়-দায়িত্ব না থাকতো, আমি এক্ষুণি মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদের একটা দফা-রফা করে তার সকল অপকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটাতাম। তারপর গলাটি একটু নিচু করে বললেন, "আমার ছেলে ওয়াহাব তো সেখানে তাদের হাতে বন্দী। আমি সেখানে গেলে কেউ কোন রকম সন্দেহ করবে না।"

সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা সুযোগটি হাতছাড়া করলো না। উমাইরের দিকে তাকিয়ে সে বললোঃ

—উমাইর, তোমার সকল ঋণ, তা যতই হোকনা কেন, তার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে তুলে নিলাম। আর আমি যতদিন বেঁচে থাকি এবং তোমার পরিবার পরিজনও যতদিন বেঁচে থাকে, তারা আমার সাথেই থাকবে। আমার অর্থ-সম্পদের কোন অভাব নেই। তারা সুখেই থাকবে।

উমাইর বললেনঃ

—আমাদের এ আলোচনা গোপন থাকুক, কেউ যেন না জানে।

সাফওয়ান বললোঃ

—তাই হবে।

উমাইর কা'বার চত্বর থেকে উঠে বাড়ী গেলেন। মুহাম্মাদের প্রতি প্রতিহিংসার আগুনে তাঁর অন্তর জ্বলছে। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলেন। তাঁর সফর প্রস্তুতির ব্যাপারে কেউ কোন রকম সন্দেহ করলো না। কারণ, বদর-বন্দীদের ছাড়ানোর জন্য মুক্তিপণ নিয়ে প্রতিনিধিদল তখন মক্কা-মদীনা ছুটাছুটি করছে।

উমাইর তরবারিতে ধার দিয়ে তীব্র বিষের মধ্যে চুবিয়ে রাখলেন। সোয়ারী প্রস্তুত করা হলো। তিনি সোয়ার হয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। হিংসা-বিদ্বেষে তখন তাঁর অন্তরটি জ্বলে কয়লা হয়ে যাচ্ছে।

উমাইর মদীনায় পৌঁছে সোজা মসজিদের দিকে চললেন। মসজিদের দরযার কাছে সোয়ারী থেকে নেমে পড়লেন।

এদিকে মসজিদের দরযার কাছে তখন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব ও কয়েকজন সাহাবী বসে বসে বদরের ঘটনাবলী আলোচনা করছিলেন। কুরাইশদের কে কিভাবে নিহত হলো, কে কেমন করে বন্দী হলো এবং মুহাজির ও আনসারদের কে কেমন বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করলো ইত্যাদি বিষয়ে তারা আলাপ জমিয়েছিলেন।

হঠাৎ হযরত উমারের চোখ পড়ে উমাইরের দিকে। তিনি সোয়ারী থেকে নেমে সোজা মসজিদের দিকে আসছেন। কাঁধে তাঁর তরবারি ঝোলানো। উমার সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেনঃ

—"এ তো সেই কুত্তা, আল্লাহর দুশমন উমাইর ইবন ওয়াহাব। আল্লাহর কসম, তার উদ্দেশ্য ভালো নয়। মক্কায় সে আমাদের বিরুদ্ধে সবসময় কাফিরদের উত্তেজিত করতো। বদর যুদ্ধের পূর্বে সে ছিল মক্কার গুপ্তচর।" তিনি সংগীদের দিকে ফিরে বললেনঃ

—তোমরা রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে যাও, তাঁর আশেপাশে থাক। এই পাপাত্মা যেন কোন রকম ধোঁকা দিতে না পারে।

উমার দৌড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে বললেনঃ

—ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই আল্লাহর দুশমন উমাইর এসেছে তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে। আমার মনে হয়, কোন রকম অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া সে আসেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ

—তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

হযরত উমার (রা) উমাইরের দিকে এগিয়ে গিয়ে একহাতে তার গলার কাছে জামা ধরেন এবং

অন্য হাতে তার তরবারির বাঁটের সাথে ঘাড়টি ঠেসে ধরে তাকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির করেন। তার এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) উমারকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। উমার ছেড়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ'র (সা) নির্দেশে উমার তার নিকট থেকেও সরে দাঁড়ালেন। রাসূল (সা) উমাইরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

—উমাইর একটু কাছে এস।

উমাইর একটু কাছে গিয়ে বলেনঃ সুপ্রভাত!

জাহিলী আরবে লোকেরা এভাবে সম্ভাষণ জানাতো।

রাসূল (সা) বললেন, "উমাইর, তোমার সম্ভাষণ অপেক্ষা উত্তম সম্ভাষণ শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন। সালামের মাধ্যমে আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এ সালাম হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসীদের সম্ভাষণ।"

উমাইর বললেন, "আমাদের সম্ভাষণও আপনার কাছে অপরিচিত নয়।"

রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "কি উদ্দেশ্যে এসেছ?"

—আপনাদের হাতে আমার যে বন্দীটি আছে তাকে ছাড়াতে এসেছি। আর যাই হোক আপনিও তো আমাদের একই খান্দানের একই গোত্রের লোক। তার ব্যাপারে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

—তাহলে ঘাড়ে এ ঝুলন্ত তরবারি কেন?

—আল্লাহ এই তরবারির অকল্যাণ করুন। বদরে এই তরবারি আমাদের কোন্ কাজে এসেছে? সোয়ারী থেকে নামার সময় ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলতে ভুলে গেছি। ঐ অবস্থায় রয়ে গেছে।

—"উমাইর, আমার কাছে সত্য কথাটি বল, তুমি কেন এসেছ?"

—আমি শুধু বন্দী-মুক্তির উদ্দেশ্যেই এসেছি। রাসূল (সা) বললেন, "তুমি সাফওয়ানের সাথে কী শর্ত করেছ?"

এই প্রশ্নে উমাইর ভীষণ ভয় পেয়ে যান। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, "কী শর্ত করেছি?"

রাসূল (সা) বললেন, "তুমি ও সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা কা'বার চত্বরে বসে কালীব কূপে নিক্ষিপ্ত নিহত কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে আলোচনা করেছ। তুমি বলেছ, যদি আমার ঘাড়ে ঋণের বোঝা এবং পরিবার পরিজনের দায়িত্ব না থাকতো, আমি মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করতাম। তুমি আমাকে হত্যা করবে—এই শর্তে সাফওয়ান তোমার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তোমার ও তোমার উদ্দেশ্যের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছেন।"

উমাইর কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর একটু সচেতন হয়ে বলে উঠলেনঃ আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ—আমি ঘোষণা করছি, আপনি নিশ্চিত আল্লাহর রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আসমানের যেসব খবর আমাদের কাছে নিয়ে আসতেন, আপনার ওপর যে ওহী নাযিল হতো, আমরা তা অবিশ্বাস করতাম। কিন্তু সাফওয়ানের সাথে আমার যে আলোচনা, তাতো আমি আর সে ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহর কসম, আমার বিশ্বাস জন্মেছে এ খবর একমাত্র আল্লাহই আপনাকে দিয়েছেন। আল-হামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে হিদায়াত দানের জন্য আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন। একথা বলে তিনি আবারো উচ্চারণ করেন, "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্ মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ।"

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সাহাবীদের নির্দেশ দেন, "তোমরা তোমাদের ভাই উমাইরকে দ্বীন শিক্ষা দাও, তাকে কুরআনের তালীম দাও এবং তার বন্দীকে মুক্তি দাও।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত উমাইর ছিলেন কুরাইশদের অন্যতম 'শয়তান' বা নেতা। মুসলমান হওয়ার পর তিনি হলেন ইসলামের এক বিশিষ্ট হাওয়ারী বা সাথী। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, "যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ, উমাইর যখন মদীনায়

আবির্ভূত হয় তখন একটি শুকরও আমার নিকট তার চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। আর আজ সে আমার কোন একটি সন্তানের চেয়েও আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।" (রিজালুন হাওলার রাসূল-৩২৫)

ইসলাম গ্রহণের পর উমাইর ইসলামী শিক্ষা দ্বারা নিজেকে পবিত্র করা এবং কুরআনের নূরের দ্বারা স্বীয় হৃদয়কে পূর্ণ করে তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি মক্কা এবং মক্কায় যাদের রেখে এসেছেন তাদের কথা প্রায় ভুলে গেলেন।

এদিকে সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা প্রতিদিন মনে মনে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে। সে মক্কায় কুরাইশদের বিভিন্ন আড্ডায় গিয়ে বলতে থাকে, শিগগির, একটা মহাসুখবর তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে। তোমরা তাতে বদরের সান্ত্বনা পাবে।

সাফওয়ানের প্রতীক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চললো। প্রথমে সে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো, পরে অস্থির হয়ে পড়লো। মদীনার দিক থেকে আগত প্রতিটি কাফিলা বা আরোহীকে ধরে ধরে সে উমাইর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো। কিন্তু কেউ সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলো না। এমন সময় মদীনা থেকে আগত এক আরোহীকে সে পেল। ঔৎসুক্যের আতিশয্যে সাফওয়ান তাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, "মদীনায় কি নতুন কোন ঘটনা ঘটেনি?" লোকটি জবাব দিল, "হা, বিরাট এক ঘটনা ঘটে গেছে।" সাফওয়ানের মুখমণ্ডল দীপ্তিমান হয়ে ওঠে এবং আনন্দ উল্লাসে তার হৃদয়-মন ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। সাথে সাথে সে আবার প্রশ্ন করে, "কী ঘটেছে আমাকে একটু খুলে বল তো।" লোকটি বললো, "উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেছে। সেখানে সে নতুন দ্বীনের দীক্ষা নিচ্ছে এবং কুরআন শিখছে।" সাফওয়ানের দুনিয়াটা যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। তার মাথায় যেন বাজ পড়লো। তার ধারণা ছিল, দুনিয়ার সব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও উমাইর কক্ষণো ইসলাম গ্রহণ করবে না।

ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এই দ্বীনের প্রতি যে দায়িত্ব তা হযরত উমাইর যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি অনুধাবন করেন, এ দ্বীনের বিরোধিতায় তিনি যে শক্তি ব্যয় করেছেন ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি এর খিদমতে ব্যয় করতে হবে। এ দ্বীনের বিরুদ্ধে যতখানি অপপ্রচার তিনি চালিয়েছেন ঠিক ততখানি এর দিকে আহবান জানাতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে তিনি যে কতখানি মুহাব্বত করেন তা সততা, জিহাদ ও ইতায়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে।

কিছুদিন মদীনায় ইসলামের তালীম ও তারবিয়াত নেওয়ার পর একদিন হযরত উমাইর রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার জীবনের বিরাট এক অংশ আল্লাহর নূর নিভিয়ে দেওয়ার জন্য এবং ইসলামের অনুসারীদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়নে কাটিয়ে দিয়েছি। আমার ইচ্ছা—আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি মক্কায় যাই এবং কুরাইশদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান জানাই। তারা যদি আমার দাওয়াত কবুল করে তাহলে তা হবে অতি উত্তম কাজ। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে, আমি তাদের এমন কষ্ট দেব যেমন ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহর সংগী-সাথীদের দিয়েছি।"

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। একদিন উমাইর তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে মক্কায় ফিরলেন। মক্কায় সর্বপ্রথম সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার সাথে দেখা করে বললেন, —"ওহে সাফওয়ান, তুমি মককার একজন নেতা, কুরাইশদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। এই যে তোমরা পাথরের পূজা কর, মূর্তির নামে জীবজন্তু জবেহ কর—এটা কি কোন দ্বীন বা ধর্ম তুমি মনে কর? তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

সাফওয়ান উমাইরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো। কিন্তু উমাইরের তরবারি তাকে সঠিকভাবে থামিয়ে দিল। ক্ষোভে দুঃখে সাফওয়ান অশ্রাব্য কিছু গালি উমাইরের কানে ছুড়ে দিয়ে পথ ছেড়ে চলে গেল।

এভাবে উমাইর মুসলমান হয়ে মক্কায় ফিরলেন। ক'দিন আগে যিনি মুশরিক অবস্থায় মক্কা ছেড়ে যান, তিনি যখন আবার মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর রূপটি ছিল ঠিক তেমন যেমন রূপ ধারণ করেছিলেন হযরত উমার (রা) ইসলাম গ্রহণের দিন। ইসলাম গ্রহণের পর উমার চিৎকার করে বলেছিলেন, "আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, কুফর অবস্থায় যে যে স্থানে আমি বসেছি, ঈমান অবস্থায় সে সে স্থানে আমি বসবো।"

উমাইর যেন এ ক্ষেত্রে উমারকে (রা) নেতা হিসাবে মানলেন। তিনি রাত-দিন মক্কার অলি-গলিতে দাওয়াত দিয়ে চললেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উমাইরের হাতে বিপুল সংখ্যক লোক ঈমান আনলেন। উহুদ যুদ্ধের পূর্বে মুমিনদের এই দলটি সংগে করে তিনি আবার মদীনায় চলে যান। উহুদ, খন্দক ও মক্কা বিজয়সহ সকল অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।

মক্কা বিজয়ের আনন্দের দিন উমাইর তাঁর বন্ধু ও সাথী সাফওয়ানকে ভুলে যাননি। রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা পৌঁছার পর সাফওয়ান প্রাণভয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়ামনের পথে জিদ্দা পৌঁছে। উমাইর (রা) এ খবর পেয়ে ভীষণ ব্যথিত হন। সাফওয়ানকে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হন। দৌড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে বলেন,

"হে আল্লাহর নবী! সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা তার সম্প্রদায়ের একজন নেতা। সে আপনার ভয়ে মক্কা থেকে পালিয়েছে। নিজেকে সে সাগরে নিক্ষেপ করবে। আপনি তাকে আমান বা নিরাপত্তা দিন।" রাসূল (সা) বললেন, "সে নিরাপদ।" উমাইর বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এমন একটি নিদর্শন দিন যা দ্বারা বুঝা যায় আপনি তাকে আমান দিয়েছেন।" রাসূল (সা) যে চাদরটি মাথায় দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন সেটি তাঁকে দান করেন।

উমাইর ইবন যুবাইর বর্ণনা করেনঃ

"চাদরটি নিয়ে উমাইর বের হলেন। তিনি যখন সাফওয়ানের কাছে পৌঁছলেন তখন সে সাগর পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি বললেনঃ "সাফওয়ান, আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক! এভাবে তুমি নিজেকে ধ্বংস করো না। এই তোমার জন্য রাসূলুল্লাহর আমান নিয়ে এসেছি।"

সাফওয়ান বললোঃ

—"তোমার ধ্বংস হোক। আমার কাছ থেকে সরে যাও। আমার সাথে কথা বলো না।" উমাইর বললেনঃ

"সাফওয়ান! আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বোত্তম মানুষ। সর্বাধিক নেক্‌কার ও ধৈর্যশীল মানুষও তিনিই। তাঁর ইজ্জত তোমারই মর্যাদা।" সাফওয়ান বললোঃ

—'আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি।' উমাইর বললেনঃ "তিনি তার থেকেও সহনশীল ও সম্মানিত।"

উমাইর (রা) সাফওয়ানকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। সাফওয়ান বললোঃ

—এ ব্যক্তির ধারণা আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ সে সত্যই বলেছে।

সাফওয়ান বললোঃ আমাকে দু'মাসের সময় দিন।

রাসূল (সা) বললেনঃ তোমাকে চার মাসের সময় দেওয়া হলো।

অল্প দিনের মধ্যেই হযরত সাফওয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল ৩২৫, হায়াতুস সাহাবা-১)

হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে হযরত উমাইর (রা) সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে খলীফাকে সহযোগিতা করেন। হযরত উমারের খিলাফতকালে আমর ইবনুল 'আস (রা) মিসর অভিযান পরিচালনা করেন। ইস্‌কান্দারিয়া বিজয়ে যখন তাঁর বিলম্ব ঘটছিল তখন হযরত 'উমার (রা) তাঁর সাহায্যার্থে মদীনা থেকে চারজন জাঁদরেল সেনা কমাণ্ডারের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্য পাঠান। এই চার কমাণ্ডারের একজন ছিলেন হযরত 'উমাইর ইবন ওয়াহাব।

হযরত উমার এ চার কমাণ্ডার সম্পর্কে 'আমর ইবনুল 'আসকে হিদায়াত দেন যে, আক্রমণের সময় তাদেরকে অগ্রভাগে রাখবে। তাঁদের প্রচেষ্টায় ইসকান্দারিয়া অভিযান সফল হয়। ইসকান্দারিয়া বিজয়ের পর আমরের নির্দেশে তিনি মিসরের বহু এলাকা পদানত করেন। হযরত উমারের (রা) খিলাফতের শেষ দিকে তিনি ইনতিকাল করেন।

সালামা ইবনুল আকও'য়া (রা)

নাম সিনান, পিতা 'আম'র ইবনুল আকও'য়া। কুনিয়াত বা ডাকনামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। যথাঃ আবু মুসলিম, আবু ইয়াস, আবু 'আমের ইত্যাদি। তবে পুত্র ইয়াসের নাম অনুসারে 'আবু ইয়াস' ডাকনামটি অধিক প্রসিদ্ধ। (আল-ইসতিয়াব)

সীরাত বিশেষজ্ঞরা সালামার ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে নীরব। তবে এতটুকু ঐতিহাসিক সত্য যে, হিজরী ৬ষ্ঠ সনের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায়ও হিজরত করেন। অধিকাংশ মুহাজির পরিবার-পরিজনসহ হিজরাত করেন ; কিন্তু হযরত সালামা আল্লাহর রাস্তায় স্ত্রী ও সন্তানদের ত্যাগ করেই হিজরাত করেন।

মদীনায় আসার পর তিনি প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপটে 'বাইয়াতে রিদওয়ান' বা 'বাইয়াতে শাজারা'-এর ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার ঘটনাকালে হযরত রাসূলে পাক (সা) যখন মক্কার কাফিরদের হাতে হযরত 'উসমানের শাহাদাতের খবর শুনেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হুদাইবিয়ায় আগত মুসলমানদের নিকট থেকে মৃত্যুর বাইয়াত বা শপথ নেন, তখন হযরত সালামা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তিনবার বাইয়াত করেন। তিনি বলছেনঃ "হুদাইবিয়ার গাছের নীচে আমি রাসূলুল্লাহর হাতে (সা) মৃত্যুর বাইয়াত করলাম। তারপর একপাশে চলে গেলাম। লোকের ভিড় কিছুটা কমে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দেখে বললেনঃ সালামা তোমার কী হল, তুমি যে বাইয়াত করলে না? বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো বাইয়াত করেছি। বললেনঃ তাতে কি হয়েছে, আর একবার কর। আমি আবারো বাইয়াত করলাম।" এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে একটি ঢাল উপহার দেন। এরপর আবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নজরে পড়েন। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ সালামা, বাইয়াত করবে না? সালামা আরজ করেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো দু'বার বাইয়াত করেছি। বললেনঃ আবারো একবার কর। সালামা তৃতীয়বার বাইয়াত করেন। এবার রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেনঃ সালামা, ঢালটি কি করেছ? তিনি বললেনঃ আমার চাচা একেবারে খালি হাতে ছিলেন, আমি সেটা তাঁকে দিয়েছি। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) হেসে উঠে বলেনঃ তোমার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে দু'আ করে, হে আল্লাহ আমাকে তুমি এমন বন্ধু দান কর যে আমার নিজের জীবন অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হবে।

হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত চলছে, এর মধ্যে মক্কাবাসীদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি হয়ে গেল। মুসলমানরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করতে লাগলো। হযরত সালামা নিশ্চিন্তে একটি গাছের তলায় শুয়েছিলেন। এমন সময় চারজন মুশরিক (অংশীবাদী) তার পাশে এসে বসে। তারা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে এমনসব আলাপ-আলোচনা করতে শুরু করে যা তাঁর শুনতে ইচ্ছা হলো না। তিনি উঠে অন্য একটি গাছের নীচে গিয়ে বসলেন। তাঁর সরে যাওয়ার পর এই চার মুশরিক নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র পাশে রেখে শুয়ে পড়ে। এমন সময় কেউ একজন চেঁচিয়ে বলে ওঠেঃ 'মুহাজিরগণ, ছুটে এস, ইবন যানীমকে হত্যা করা হয়েছে।' এ আওয়ায কানে যেতেই সালামা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে ঐ চার মুশরিকের দিকে ছুটে যান। তারা তখনও শুয়ে ছিল। সালামা তাদের অস্ত্র নিজ দখলে নিয়ে বলেন, 'যদি ভালো চাও সোজা আমার সাথে চলো। আল্লাহর কসম, কেউ মাথা উঁচু করলে তাঁর চোখ ফুটো করে ফেলবো!' তিনি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। সালামার চাচাও প্রায় ৭০/৭১ জন

মুশরিককে বন্দী করে নিয়ে আসেন। হযরত নবী কারীম (সা) তাদের সকলকে ছেড়ে দেন। এ ঘটনারই প্রেক্ষাপটে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

"আর সেই আল্লাহ, তিনিই তো মক্কার মাটিতে কাফিরদের ওপর তোমাদেরকে বিজয় দানের পর তাদের হাতকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের থেকে বিরত রেখেছেন।" (সূরা আল-ফাতহ/৩)

মুসলমানদের কাফিলা মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে একটি পাহাড়ের নিকট তাঁবু স্থাপন করে। মুশরিকদের মনে কিছু অসৎ উদ্দেশ্য কাজ করে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তা অবগত হন। তিনি তাঁবু পাহারার প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি সেই ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন যে সেই পাহাড়ের ওপর বসে পাহারা দেবে। এই সৌভাগ্য হযরত সালামা অর্জন করেন। তিনি রাতভর বার বার পাহাড়ের ওপর উঠে শত্রুর পদধ্বনি শোনার চেষ্টা করেন।

হযরত রাসূলে কারীমের কিছু উট 'জী-কারাদ' বা 'জী-কারওয়া'-র চারণক্ষেত্রে চরতো। একদিন বনু গাতফান মতান্তরে বনু ফাযারার লোকেরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে রাখালকে হত্যা করে উটগুলি লুট করে নিয়ে যায়। হযরত সালামা ইবন আকওয়া ঘটনাস্থলের পাশেই ছিলেন। শেষরাতে তিনি বের হয়েছেন, আবদুর রহমান ইবন আউফের দাস তাঁকে খবর দিল, রাসূলুল্লাহর উটগুলি লুট হয়ে গেছে। সালামা আবদুর রহমানের দাসকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহকে (সা) খবর দেওয়ার জন্য। আর তিনি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে "ইয়া সাবাহাহ্" (শত্রুর আক্রমণের সতর্ক ধ্বনি) বলে এমন জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন যে, সে আওয়ায মদীনার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি একাকী ডাকাত দলের পিছু ধাওয়া করেন। ডাকাতরা পানি তালাশ করছিল, এমন সময় তিনি সেখানে পৌঁছে যান। তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দায। নির্ভুল তাক করে তীর ছাড়ছিলেন, আর মুখে গুণগুণ করে আওড়াচ্ছিলেনঃ

"আনা ইবনুল আকও'য়া
আল-য়াউম য়াউমুর রুদ্দায়ি।"

অর্থাৎ আমি আকও'য়ার ছেলে—আজকের দিনটি নীচ প্রকৃতির লোকদের ধ্বংস সাধনের দিন।

তিনি এমনভাবে আক্রমণ করেন যে, ডাকাতরা উট ফেলে পালিয়ে যায়। তারা দিশেহারা হয়ে তাদের চাদরও ফেলে যায়। এর মধ্যে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আরও লোকজন সংগে করে সেখানে উপস্থিত হন। সালামা আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাদের পানি পান করতে দিইনি। এখনই পিছু ধাওয়া করলে তাদের ধরা যাবে।' রাসূল (সা) বলেন, 'পরাজিত করার পর ক্ষমা কর।' (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতু জী-কারওয়াহ, সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৮১-৮২, হায়াতুস সাহাবা ১/৫৫৯-৬১) ঘটনাটি বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

খাইবার যুদ্ধে তিনি চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। খাইবার বিজয়ের পর হযরত রাসূলে কারীমের হাতে হাত দিয়ে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

খাইবারের পর তিনি সাকীফ ও হাওয়াযিনের যুদ্ধে যোগদান করেন। এই অভিযানের সময় এক ব্যক্তি উটে আরোহণ করে মুসলিম সেনা ছাউনীতে আসে এবং উটটি বেঁধে আস্তে করে মুসলিম সৈনিকদের সাথে নাশতায় শরীক হয়ে যায়। তারপর চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে মুসলমানদের শক্তি আঁচ করে আবার উটে চড়ে দ্রুত কেটে পড়ে। এভাবে এসে আবার চলে যাওয়ায় গুপ্তচর বলে মুসলমানদের বিশ্বাস হয়। এক ব্যক্তি তার পিছু ধাওয়া করে। সালামাও তাঁকে অনুসরণ করেন এবং দৌড়ে আগে গিয়ে লোকটিকে পাকড়াও করার পর তরবারির এক আঘাতে তাকে হত্যা করেন। তারপর নিহত ব্যক্তিটির বাহনটি নিয়ে ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেনঃ লোকটিকে কে হত্যা করেছে? লোকেরা বললোঃ সালামা। রাসূল (সা) ঘোষণা করেনঃ নিহত ব্যক্তির যাবতীয় জিনিস সে-ই পাবে।

হিজরী ৭ম সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু বকরের নেতৃত্বে বনী কিলাবের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠালেন। সেই বাহিনীতে সালামাও ছিলেন। তিনি এই অভিযানে একাই সাত জনকে হত্যা করেন। যারা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের অনেক নারীকে তিনি বন্দী করে নিয়ে আসেন। এই বন্দীদের মধ্যে একটি সুন্দরী মেয়েও ছিল। হযরত আবু বকর মেয়েটিকে হযরত সালামার দায়িত্বে অর্পণ করেন। হযরত সালামা মেয়েটিকে মদীনায় নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ মেয়েটিকে আমার জিম্মায় ছেড়ে দাও। সালামা মেয়েটিকে রাসূলুল্লাহর (সা) জিম্মায় দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এ মেয়েটির বিনিময়ে কাফিরদের হাতে বন্দী মুসলমানদের মুক্ত করেন।

হযরত সালামা ইবনুল আকও'য়া (রা) ইসলাম গ্রহণের পর কাফিরদের সাথে সংঘটিত প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে তিনি মোট চৌদ্দটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সাতটি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথী হিসাবে, আর অবশিষ্ট সাতটি রাসূলুল্লাহ (সা) প্রেরিত বিভিন্ন অভিযান। মুসতাদরিকের একটি বর্ণনা মতে তাঁর অংশগ্রহণ করা যুদ্ধের সংখ্যা মোট ষোল। একবার তিনি বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহর সাথে সাতটি এবং যায়িদ ইবন হারিসার সাথে নয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।' (রিজালুন হাওলার রাসূল-৫৫৫)

পদাতিক বাহিনীর যারা তীর-বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করতো, তাদের মধ্যে সালামা ছিলেন অন্যতম দক্ষ ব্যক্তি। শত্রু সৈন্যরা যখন আক্রমণ চালাতো তিনি পিছু হটে যেতেন। আবার শত্রুরা যখন পিছু হটে যেত বা বিশ্রাম নিত, তিনি অতর্কিত আক্রমণ চালাতেন। এই ছিল তাঁর যুদ্ধ কৌশল। এই কৌশল অবলম্বন করে তিনি একাই মদীনার উপকণ্ঠে 'জী কারাদ' যুদ্ধে 'উয়াইনা ইবন হিসন আল-ফিযারীর' নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। তিনি একাই তাদের পিছু ধাওয়া করেন, তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। এভাবে মদীনা থেকে বহু দূর পর্যন্ত তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যান।

বীরত্ব ও সাহসিকতায় বিশেষতঃ দ্রুত দৌড়ানোর ক্ষেত্রে সাহাবা সমাজের মধ্যে সালামা ছিলেন বিশেষ স্থানের অধিকারী। আল-ইসাবা গ্রন্থকার লিখছেনঃ তিনি ছিলেন অন্যতম বীর এবং অশ্বের চেয়ে দ্রুতগামী। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মতান্তরে 'জী কারাদ' অভিযানের সময় রাসূলে কারীম (সা) তাঁর প্রশংসায় মন্তব্য করেনঃ "খায়রু রাজ্জালীনা সালামা ইবনুল আকও'য়া—সালামা ইবন আকও'য়া আমাদের পদাতিকদের মধ্যে সর্বোত্তম।" (রিজালুন হাওলার রাসূল—৫৫৫)

হযরত সালামা ছিলেন অত্যন্ত শক্ত মানুষ। দুঃখ-বেদনা কি জিনিস তা যেন তিনি জানতেন না। তবে খাইবার যুদ্ধে তাঁর ভাই মতান্তরে চাচা হযরত 'আমের ইবন আকও'য়ার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে একটি বিষাদ ভরা গান গুণগুণ করে গেয়েছিলেন। যার শেষ চরণটি ছিল এমনঃ "(হে আল্লাহ) আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করুন, শত্রুর মুখোমুখি আমাদের পদসমূহ দৃঢ়মূল করুন।"

এই খাইবার যুদ্ধে তাঁর ভাই 'আমের তরবারি দিয়ে সজোরে একজন মুশরিককে আঘাত হানেন। কিন্তু আঘাতটি ফসকে গিয়ে নিজের দেহে লাগে এবং তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এ ঘটনার পর মুসলমানদের কেউ কেউ মন্তব্য করলোঃ "হতভাগা 'আমের—শাহাদাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলো।" শুধু এই দিন, যখন অন্যদের মত সালামার মনেও এই ধারণা জন্মালো যে, তাঁর ভাই জিহাদ ও শাহাদাতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তখন ভীষণ ব্যথিত ও বিমর্ষ হলেন। তিনি দৌড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেনঃ

—ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'আমেরের সকল নেক 'আমল ব্যর্থ হয়ে গেছে—একথা কি ঠিক?

রাসূল (সা) বললেনঃ

—সে মুজাহিদ হিসেবে নিহত হয়েছে। তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। এখন সে জান্নাতের নদীসমূহে সাঁতার কাটছে। (রিজালুন হাওলার রাসূল—৫৫৫-৫৫৬)

হযরত সালামা (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর থেকে হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাত পর্যন্ত মদীনায় ছিলেন। হযরত 'উসমানের (রা) হত্যার পর এই বীর মুজাহিদ বুঝতে পারলেন, মুসলিম জাতির মধ্যে ফিতনা বা আত্মকলহের দ্বার খুলে গেছে। যে ব্যক্তি তার ভাইদের সঙ্গে করে সারাটি জীবন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, এখন তার পক্ষে সেই ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা শোভন নয়। মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে দক্ষতার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা কুড়িয়েছেন, একজন মুমিনের বিরুদ্ধে সেই দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করা অথবা সেই দক্ষতা কাজে লাগিয়ে একজন মুসলমানকে হত্যা করা কোনভাবেই সঙ্গত নয়।

এ উপলব্ধির পর তিনি নিজের জিনিসপত্র উটের পিঠে চাপিয়ে মদীনা ছেড়ে সোজা 'রাবজা' চলে যান। সেখানেই আমরণ বসবাস করতে থাকেন। এই রাবজাতেই ইতিপূর্বে হযরত আবুযার আল-গিফারী (রা) চলে এসেছিলেন মদীনা ছেড়ে এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

হযরত সালামা (রা) বাকী জীবনটা এই রাবজায় কাটিয়ে দেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে হঠাৎ তাঁর মনে মদীনায় যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জাগে। তিনি মদীনা যান। সেখানে দুই দিন কাটানোর পর তৃতীয় দিন আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে তাঁর হাবীবের পবিত্র ভূমিতে শহীদ ও সত্যনিষ্ঠ বন্ধুদের পাশেই তিনি সমাহিত হন। (রিজালুন হাওলার রাসূল—৫৫৬-৫৭)

তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য আছে। সঠিক মত অনুযায়ী তিনি হিজরী ৭৪ সনে মৃত্যুবরণ করেন। অন্য একটি মতে তাঁর মৃত্যু সন হিঃ ৬৪। ওয়াকিদী ও তাঁর অনুসারীদের ধারণা তিনি আশি বছর জীবিত ছিলেন। ইবন হাজার বলেন, মৃত্যুসন সম্পর্কে প্রথম মতানুযায়ী ওয়াকিদীর এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, তাতে হুদাইবিয়ার বাইয়াতের সময় তাঁর বয়স দাঁড়ায় দশের কাছাকাছি। আর এ বয়সে কেউ মৃত্যুর বাইয়াত করতে পারে না। তাছাড়া আমি ইবন সা'দে দেখেছি, তিনি হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালের শেষ দিকে ইনতিকাল করেন। বালাযুরীও এমনটি উল্লেখ করেছেন। (আল-ইসাবা-২/৬৭)

হযরত সালামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। বহু অভিযানে রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার গৌরবও অর্জন করেছিলেন। এই সুযোগ তিনি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাছাড়া আবু বকর, 'উমার, 'উসমান ও তালহা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সাতাত্তর (৭৭)। তার মধ্যে ষোলটি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত। পাঁচটি বুখারী ও নয়টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। (তাহজীবুল কামাল-১৪৮) আর তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন—ইয়াস ইবন সালামা, ইয়াযীদ ইবন উবাইদ, আবদুর রহমান ইবন আবদিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যাহ প্রমুখ।

আল্লাহর রাস্তায় খরচের ব্যাপারে হযরত সালামা ছিলেন দরাযহস্ত। কেউ কিছু আল্লাহর ওয়াস্তে চাইলে তিনি খালি হাতে ফিরাতেন না। তিনি বলতেন, যে আল্লাহর ওয়াস্তে দেয় না সে কোথায় দেবে? তবে আল্লাহর ওয়াস্তে চাওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না।

তিনি নিজের জন্য সাদাকার মাল হারাম মনে করতেন। যদি কোন জিনিস সাদাকার বলে সন্দেহ হত, তিনি তা থেকে হাত গুটিয়ে নিতেন। এ কারণে নিজের সাদাকা করা কোন জিনিস দ্বিতীয়বার অর্থের বিনিময়ে খরিদ করাও পছন্দ করতেন না।

তিনি হারাম ও হালালের ব্যাপারে এতই সতর্ক ছিলেন যে, জুয়ার সাথে সাদৃশ্য দেখায় এমন কোন খেলাও তিনি বাচ্চাদের খেলতে দিতেন না।

মদীনায় যে সকল সাহাবী ফাতওয়া দান করতেন সালামা (রা) ছিলেন তাঁদেরই একজন। ইবন সা'দ যিয়াদ ইবন মীনা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেনঃ ইবন 'আব্বাস, ইবন 'উমার, আবু সাঈদ

আল-খুদরী, আবু হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস, জাবির ইবন আবদিল্লাহ, রাফে' ইবন খাদীজ, সালামা ইবন আকওয়া প্রমুখ সাহাবী মদীনায় ফাতওয়া দিতেন। (হায়াতুস সাহাবা—৩/২৫৪-৫৫),

ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (পৃঃ ১৪৪) গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবন রাযীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমরা রাবজা দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের বলা হলো, এখানে সালামা ইবন আকওয়া আছেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে সালাম জানালাম। তিনি নিজের দু'টি হাত বের করে আমাদেরকে দেখিয়ে বললেনঃ আমি এই দু'টি হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেছি। তিনি তাঁর একটি পাঞ্জা বের করলেন। পাঞ্জাটি যেন উটের পাঞ্জার মত বৃহদাকৃতির। (হায়াতুস সাহাবা—২/৪৯৮-৯৯)

হযরত সালামাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হুদাইবিয়ার দিনে আপনারা কোন্ কথার ওপর রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন? বলেছিলেনঃ মাওত অর্থাৎ মৃত্যুর ওপর। (আল-ইসতিয়াব, হায়াতুস সাহাবা-১/২৪৯)

হযরত সালামার (রা) পুত্র 'ইয়াস' একটিমাত্র কথায় পিতার ফজীলাত ও বৈশিষ্ট্য চমৎকার রূপে তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেনঃ 'মা কাজাবা আবী কাত্তু—আমার আববা কক্ষণো মিথ্যা বলেননি।' (রিজালুন হাওলার রাসূল—৫৫৪)

সত্যনিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান লাভের জন্য একজন মানুষের জীবনে এই একটিমাত্র গুণই যথেষ্ট। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এই সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

"আল-ইসতিয়াব ফী আসমায়িল আসহাব" গ্রন্থের লেখক আবু 'উমার ইউসুফ আল কুরতুবী ইবন ইসহাকের সূত্রে হযরত সালামা সম্পর্কে একটি অভিনব কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। ইবন ইসহাক বলেন, 'আমি শুনেছি নেকড়ে বাঘ যার সংগে কথা বলেছে, সালামা সেই ব্যক্তি। সালামা বলেছেন, আমি একটি নেকড়েকে একটি হরিণ শিকার করতে দেখলাম। আমি তাকে তাড়া করে তার মুখ থেকে হরিণটি বের করে আনলাম। তখন নেকড়েটি বললো, 'তোমার কি হল, আল্লাহ আমাকে যে রিযিক দিয়েছেন আমি তো তা-ই খেতে চাচ্ছি। আর তা তোমারও সম্পদ নয় যে, তুমি আমার মুখ থেকে কেড়ে নেবে।' সালামা বলেন, আমি বললাম, 'ওহে আল্লাহর বান্দারা, এই দেখ অভিনব ঘটনা। নেকড়ে কথা বলছে, আমার কথা শুনে নেকড়েটি বললো, 'এর থেকেও আশ্চর্য ঘটনা হল, আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহবান জানাচ্ছেন, আর তোমরা তা অস্বীকার করে মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত হচ্ছো।' সালামা বলেন, 'অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করি। আল্লাহই ভালো জানেন, কে এই নেকড়ে।' (আল-ইসতিয়াব)

আবু সালামা ইবন আবদিল আসাদ (রা)

নাম আবদুল্লাহ, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু সালামা। পিতা আবদুল আসাদ, মাতা বার্‌রাহ বিনতু 'আবদিল মুত্তালিব। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই। তাছাড়া সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহর (সা) দুধভাই। আবু লাহাবের দাসী 'সুওয়াইবা' রাসূলুল্লাহ (সা), হামযা ও আবু সালামাকে দুধ পান করান। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯৬)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে অবস্থান নেওয়ার পূর্বে তিনি মুমিনদের দলে শামিল হন। হযরত আবু বকর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম উসমান ইবন 'আফফান, তালহা ইবন 'উবাইদিল্লাহ, যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তাদের সকলকে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে নিয়ে আসেন। তারা সকলে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের দিন তিনি উসমান ইবন মাজউন, আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, আবদুর রহমান ইবন আউফ, আবু সালামা ও আল আরকাম ইবন আবিল আরকামকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে যান। তাঁরাও একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল-বিদায়াহ-৩/২৯) তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মু সালামাও তাঁকে অনুসরণ করেন। (উসুদুল গাবা-৫/২৮১)

হাবশায় হিজরাতকারী প্রথম দলটির সাথে তিনি ও স্ত্রী উম্মু সালামা হিজরাত করেন। এই হাবশার মাটিতে তাদের কন্যা যায়নাব বিনতু আবী সালামা জন্মগ্রহণ করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩২২, ৩২৬) কিছুদিন পর তিনি হাবশা থেকে চলে আসেন এবং আবু তালিব ইবন আবদিল মুত্তালিবের নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেন। বনু মাখযূমের কিছু লোক আবু তালিবের নিকট এসে অভিযোগের সুরে বলেঃ ওহে আবু তালিব, আপনি আপনার ভাতিজা মুহাম্মাদকে আমাদের হাত থেকে হিফাজতে রেখেছেন। এখন আবার আমাদেরই এক লোককে নিরাপত্তা দিচ্ছেন? আবু তালিব বললেনঃ 'সে আমার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছে। তাছাড়া সে আমার বোনের ছেলে। যদি বোনের ছেলেকে নিরাপত্তা দিতে না পারি তাহলে ভায়ের ছেলেকেও আমি নিরাপত্তা দিতে পারিনে।' এক পর্যায়ে আবু লাহাব উঠে দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'কুরাইশ বংশের লোকেরা! তোমরা এই বৃদ্ধের সাথে বেশী বাড়াবাড়ি করছো। যদি এটা বন্ধ না কর, আমরা এই বৃদ্ধের পাশে এসে দাঁড়াবো।' আবু লাহাবের এ কথায় বনী মাখযূমের লোকেরা সরে পড়ে। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৬৯, ৩৭১) দ্বিতীয়বারও তিনি সস্ত্রীক হাবশায় হিজরাত করেন। শেষবার হাবশা থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করে কিছুদিন পর আবার মদীনায় চলে যান।

আবু সালামার স্ত্রী হযরত উম্মু সালামা তাঁদের মদীনায় হিজরাত সম্পর্কে বলেনঃ আবু সালামা মদীনায় হিজরাতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাঁর উটটি প্রস্তুত করলেন। আমাকে উটের পিঠে বসিয়ে আমার ছেলে সালামাকে আমার কোলে দিলেন। তারপর উটের লাগাম ধরে তিনি টেনে নিয়ে চললেন। আমার পিতৃ-গোত্র বনু মুগীরার লোকেরা তাঁর পথ আগলে ধরে বললোঃ তোমার নিজের ব্যাপারে তুমি যা খুশী করতে পার। কিন্তু আমাদের এ মেয়েকে তোমার সাথে বিদেশ যেতে দেবনা। তারা আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এতে আবু সালামার গোত্র বনু আবদিল আসাদ ক্ষেপে গেল। তারা বললোঃ তোমরা যখন তোমাদের মেয়েকে কেড়ে নিয়ে গেছ, তখন আমরা আমাদের সন্তানকে অর্থাৎ সালামাকে তার মায়ের কাছে থাকতে দেব না। তারা আমার ছেলেটি নিয়ে গেল। আমি বন্দী আমার পিতৃগোত্র বনু মুগীরার হাতে, আমার কোলের বাচ্চা সালামা তার পিতৃগোত্র বনু

'আবদিল আসাদে, আর আমার স্বামী আবু সালামা মদীনায়। এভাবে তারা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল।

আমি প্রতিদিন মক্কার 'আবতাহ' উপত্যকায় গিয়ে বসে বসে শুধু কাঁদতাম। প্রায় এক বছর আমি চোখের পানি ফেললাম। অবশেষে একদিন আমার পিতৃগোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে এ অবস্থায় দেখে তার অন্তরে দয়া হলো। সে বনু মুগীরাকে বললোঃ তোমরা কি এ হতভাগিনীকে মক্কা ছাড়তে দেবে না? এভাবে স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? তখন বনু মুগীরা আমাকে বললোঃ তুমি ইচ্ছা করলে তোমার স্বামীর কাছে যেতে পার। বনু 'আবদিল আসাদও আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিল। আমি উটে চড়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে মদীনার পথ ধরলাম। আমার সাথে আল্লাহর আর কোন বান্দা ছিল না। আমি যখন তানয়ীমে পৌঁছলাম তখন উসমান ইবন তালহার সাথে আমার দেখা। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলোঃ আবু উমাইয়্যার মেয়ে, কোথায় যাবে? বললামঃ মদীনায় আমার স্বামীর কাছে। জিজ্ঞেস করলোঃ সাথে আর কেউ নেই? বললামঃ এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। সে আমার উটের লাগাম ধরে হাঁটতে লাগলো এবং আমাকে মদীনার উপকণ্ঠে কুবার বনী 'আমর ইবন আউফের পল্লী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললোঃ তোমার স্বামী এখানেই থাকে। এ কথা বলে সে আবার মক্কার পথ ধরলো। এখানে আমার স্বামীর সাথে মিলিত হলাম। এই উসমান ইবন তালহা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করে। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৫৮-৫৯)

হযরত আবু সালামা ইয়াসরিববাসীদের আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে শপথের এক বছর পূর্বে মদীনায় হিজরাত করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৬৮) বুখারীর একটি বর্ণনা মতে তিনিই মদীনায় গমনকারী প্রথম মুহাজির। কিন্তু অন্য একটি বর্ণনায় মুসয়াব ইবন উমাইরকে মদীনার প্রথম মুহাজির বলা হয়েছে। আল্লামা ইবন হাজার (রহ) এই দুই বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেনঃ 'আবু সালামা হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে এলে মক্কার মুশরিকরা তাঁর ওপর পুনরায় অত্যাচার শুরু করে। তিনি তখন মদীনা যান—কুরাইশদের ভয়ে, সেখানে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে নয়। অপরদিকে মুসয়াব ইবন উমাইর মদীনায় যান হিজরাতের নির্দেশ আসার পর। এই হিসাবে দুই বর্ণনার মধ্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নেই। (ফাতহুল বারী-৭/২০৩) আবু সালামার মদীনায় উপস্থিতির দিনটি ছিল মুহাররম মাসের ১০ তারিখ। 'আমর ইবন আউফের খান্দান পুরো দুই মাস তাকে আতিথ্য দান করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে হযরত খুসাইমা আনসারী ও তাঁর মাঝে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং পৃথক বসবাসের জন্য একখণ্ড জমিও দান করেন।

বদর ও উহুদ যুদ্ধে তিনি সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উহুদ যুদ্ধে আবু উসামা জাশামীর একটি তীর তাঁর বাহুতে বিদ্ধ হয়। দীর্ঘ একমাস চিকিৎসা গ্রহণের পর বাহ্যিকভাবে সেরে উঠলেও ভেতরে ভেতরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় তাঁর ওপর 'কাতান' অভিযানের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

'কাতান' একটি পাহাড়ের নাম। এখানে বনু আসাদের বসতি ছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) খবর পেলেন, তুলাইহা ও আসাদ ইবন খুওয়াইলিদ নিজ গোত্র এবং তাদের প্রভাবিত অন্যান্য গোত্রকে মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলছে। রাসূলে কারীম (সা) এমন কার্যকলাপ বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি মুহাজির ও আনসারদের সম্মিলিত দেড়শো মুজাহিদীনের একটি বাহিনী গঠন করে আবু সালামার নেতৃত্বে হিজরী ৪ সনের মুহাররম/সফর মাসে 'কাতান' অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবু সালামার হাতে ঝাণ্ডা দিতে গিয়ে বলেনঃ 'রওয়ানা হয়ে যাও। বনু আসাদ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগেই তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দাও।'

হযরত আবু সালামা অপ্রসিদ্ধ পথ ধরে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ বনু আসাদের জনপদে গিয়ে হাজির হন। তারা এই আকস্মিক আক্রমণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালাতে শুরু করে। আবু সালামা তাঁর বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তাদের পিছু ধাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁরা বহু দূর পর্যন্ত তাদেরকে

তাড়িয়ে নিয়ে যান এবং প্রচুর পরিমাণে উট ও ছাগল-বকরী গানীমাত হিসাবে লাভ করেন। সকল গানীমাতই মদীনায় রাসূলুল্লাহর খেদমতে হাজির করেন।

হযরত আবু সালামা 'কাতান' অভিযান থেকে মদীনায় ফিরলেন। এদিকে ওহুদ যুদ্ধে তীরবিদ্ধ ক্ষতস্থানে আবার বিষক্রিয়া শুরু হল। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর হিজরী ৪ সনের মতান্তরে ৩ সনের জামাদিউল আখার মাসের ৩ তারিখ ইনতিকাল করেন। ঘটনাক্রমে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে দেখার জন্য উপস্থিত হন। তাঁর রূহটি বেরিয়ে যাওয়ার পর রাসূল (সা) নিজের পবিত্র হাতে তাঁর খোলা চোখ দু'টি বন্ধ করে দিয়ে বলেনঃ মানুষের রূহ যখন উঠিয়ে নেওয়া হয় তখন তার দু'টি চোখ তাকে দেখার জন্য খোলা থাকে।" (তাবাকাতু ইবন সা'দ-৩/১৭২)

একদিকে পর্দার অন্তরালে মহিলারা মাতম শুরু করে দেয়। রাসূল (সা) তাদের নিবৃত্ত করে বলেনঃ এখন দু'আর সময়। কারণ, যে সকল ফিরিশতা আসমান থেকে মৃতের কাছে আসে তারাও এই দু'আকারীদের দু'আর সাথে 'আমীন' বলে। তারপর রাসূল (সা) তাঁর জন্য এভাবে দু'আ করেনঃ "হে আল্লাহ, তাঁর কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত করে দাও। তাঁর গুনাহ-খাতা মাফ করে দাও এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত জামায়াতের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও।" (ইবন সা'দ ৩/১৭২)

হযরত আবু সালামা মদীনার উপকণ্ঠে 'আলীয়াহ' নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কুবা থেকে এসে এখানেই বসতি স্থাপন করেন। বনী উমাইয়্যা ইবন যায়িদের কূপ 'ইয়াসীরা'-র পানি দিয়ে তাঁকে গোসল দেওয়া হয় এবং মদীনার পবিত্র মাটিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু সালামা (রা) বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রায়ই তাঁকে দেখতে যেতেন।

হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেনঃ একদিন আবু সালামা খুব উৎফুল্লভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে ঘরে ফেরেন। তারপর বলতে থাকেন, "আজ রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণী আমাকে খুবই খুশী করেছে। তিনি বলেছেনঃ কোন বিপদগ্রস্ত মুসলমান তার বিপদের মধ্যে যদি আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে বলেঃ 'হে আল্লাহ, আমাকে এই বিপদে সাহায্য কর এবং আমাকে এর উত্তম প্রতিদান দাও'—তাহলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন।" সুতরাং আবু সালামার মৃত্যুতে আমি যখন ভীষণ দুঃখ পেলাম, তখন আমিও ঐ দু'আ করলাম। কিন্তু তক্ষুণি আমার মনে হল, আবু সালামার উত্তম বিনিময় আর কে হতে পারে? আমার ইদ্দৎ অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন খোদ রাসূল (সা) বিয়ের পয়গাম পাঠান তখন আমি বুঝলাম আল্লাহ উত্তম বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ ইবন হাম্বল-৪/১২৭) এভাবে উম্মু সালামা হলেন উম্মুল মুমিনীন।

হযরত আবু সালামা দুই ছেলে সালামা ও উমার এবং দুই মেয়ে যয়নাব ও দুররাহ্ রেখে যান।

খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে যখন প্রত্যেকের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন তখন মুহাজির ও আনসার যাঁরা বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সন্তানদের জন্য দু'হাজার করার নির্দেশ দেন। যখন আবু সালামার ছেলে 'উমারের ব্যাপারটি এলো, তখন বললেন, তাকে এক হাজার বেশী দাও। মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ—যাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ, যিনি উহুদে শহীদ হন, প্রতিবাদ করে বলেনঃ তার পিতার আমাদের পিতাদের অপেক্ষা বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। খলীফা বললেনঃ তার পিতা আবু সালামার জন্য তাকে দু'হাজার, আর তার মা উম্মু সালামার জন্য অতিরিক্ত এক হাজার। তার মার মত তোমার একজন মা থাকলে তোমাকেও এক হাজার বেশী দিতাম। (হায়াতুস সাহাবা—১/২১৬-১৭)

'আকীল ইবন আবী তালিব (রা)

নাম 'আকীল, ডাকনাম আবু ইয়াযীদ। পিতা আবু তালিব ইবন 'আবদিল মুত্তালিব, মাতা ফাতিমা। কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর সংভাই এবং আলী অপেক্ষা বিশ বছর বড়।

'আকীল পিতা আবু তালিবের কাছে প্রতিপালিত হন। রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে একবার মক্কায় দারুণ অভাব দেখা দেয়। কুরাইশদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আব্বাসের অবস্থা তুলনামূলকভাবে একটু ভালো ছিল। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আব্বাসকে বললেন ঃ 'চাচা, আপনার ভাই আবু তালিবের অবস্থা তো আপনার জানা। তাঁর সন্তান-সংখ্যা বেশী। চলুন না আমরা তাঁর কিছু সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে নিই।' তাঁরা দু'জন আবু তালিবের কাছে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। আবু তালিব বললেন, 'আকীল ছাড়া আর যাকে খুশী তোমরা নিয়ে যেতে পার।' রাসূলুল্লাহ (সা) আলীকে এবং আব্বাস জাফরকে নিয়ে গেলেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৩০)।

'আকীলের অন্তর প্রথম থেকেই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি দুর্বল ছিল। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করতে পারেননি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরদার-মুশরিকদের সাথে বদর যুদ্ধে যোগদান করেন এবং আরও অনেকের সাথে তিনিও মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় খান্দানের কে কে বন্দী হয়েছে তা দেখার জন্য আলীকে নির্দেশ দেন। আলী খোঁজ-খবর নিয়ে বলেন ঃ নাওফিল, আব্বাস ও 'আকীল বন্দী হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই তাঁদের দেখতে যান এবং 'আকীলের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আবু জাহল নিহত হয়েছে। আকীল বললেন ঃ এখন তিহামা অঞ্চলে মুসলমানদের আর কোন প্রতিপক্ষ নেই। 'আকীল ছিলেন রিক্তহস্ত। আব্বাস তাঁর মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাঁকে ছাড়িয়ে নেন। বদরে তিনি হযরত উবাইদ ইবন আউসের হাতে বন্দী হন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৮৭)

বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি মক্কায় ফিরে যান। মক্কা বিজয়ের বছর মতান্তরে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করে অষ্টম হিজরী সনের প্রথম দিকে মদীনায় হিজরাত করেন। (আল-ইসাবা-২/৪৯৪) মূতা অভিযানে অংশগ্রহণের পর আবার মক্কায় ফিরে যান এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ কারণে মক্কা বিজয়, তায়েফ ও হুনাইন অভিযানে শরিক হতে পারেননি। (উসুদুল গাবা-৩/৪২২) তবে কোন কোন বর্ণনা মতে তিনি হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে প্রথমদিকে যখন মুসলিম বাহিনীর পরাজয় হতে চলেছিল, এমনকি মুহাজির ও আনসাররাও পালাতে শুরু করেছিল, তখন যাঁরা দৃঢ়পদ ছিলেন তাঁদের একজন তিনি (আল ইসাবা-২/৪৯৪)।

ইবন হিশাম বলেন ঃ 'আকীল ইবন আবী তালিব হুনাইন যুদ্ধের দিন রক্তমাখা তরবারি হাতে স্ত্রী ফাতিমা বিনতু শাইবা ইবন রাবীয়ার তাঁবুতে প্রবেশ করেন। স্ত্রী বলেন ঃ আমি বুঝেছি তুমি যুদ্ধ করেছ। তবে কী গনীমত (যুদ্ধলব্ধ জিনিস) আমার জন্য নিয়ে এসেছ? 'আকীল বললেন ঃ এই নাও একটি সূঁচ, কাপড় সেলাই করবে। তিনি সূঁচটি স্ত্রীর হাতে দিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহর (সা) ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি ঘোষণা করছেন ঃ কেউ কোন জিনিস নিয়ে থাকলে ফেরত দিয়ে যাও। এমনকি কেউ একটি সূঁচ-সূতো নিয়ে থাকলে তাও ফেরত দিয়ে যাও। আকীল স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমার সূঁচটিও চলে গেল। এই বলে তিনি স্ত্রীর হাত থেকে সূঁচটি নিয়ে গনীমতের সম্পদের স্তূপে ফেলে দিলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৯২)।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল তথা হুনাইন যুদ্ধের পর থেকে খলীফা উসমানের খিলাফতের শেষ পর্যন্ত হযরত আকীলের ভূমিকা ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে হযরত উমারের খিলাফতকালে বাইতুলমালে যখন প্রচুর অর্থ জমা হতে থাকে তখন তিনি এই অর্থের ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। হযরত আলী (রা) সকল অর্থ জনগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। হযরত উসমান বললেনঃ-প্রচুর অর্থ, সকলে পাবে। তবে কে পেল, আর কে পেল না তা হিসেব না রাখলে বিষয়টি বিশৃংখলার রূপ নেবে। তখন ওয়ালীদ ইবন হিশাম ইবন মুগীরা বললেনঃ আমীরুল মুমিমীন! আমি শামে গিয়েছি। সেখানে রাজাদের দেখেছি, তাঁরা দিওয়ান তৈরী করে সবকিছু পৃথকভাবে লিখে রাখেন। তাঁর পরামর্শটি খলীফার পছন্দ হলো। তিনি আকীল, মাখরামা ও জুবাইর ইবন মুতয়িমকে নির্দেশ দিলেন মর্যাদা অনুযায়ী নাগরিকদের তালিকা তৈরীর জন্য। এ তিনজন ছিলেন কুরাইশদের বিশিষ্ট বংশবিদ্যা বিশারদ। তাঁরা তালিকা তৈরী করে দেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/২২০)।

হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) বিরোধের সময় হযরত আকীলকে আবার ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়। যদিও তিনি আলীর (রা) ভাই, তথাপি নিজের প্রয়োজনে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আলী-মুয়াবিয়া বিরোধের সময় তিনি মদীনা ছেড়ে শামে মুয়াবিয়ার কাছে চলে যান। এর কারণ ইতিহাসে এভাবে উল্লেখ হয়েছে যে, আকীল ছিলেন ঋণগ্রস্ত অভাবী মানুষ, তাঁর ছিল অর্থের প্রয়োজন। আর আমীর মুয়াবিয়ার (রা) খাযানা ছিল উন্মুক্ত। দারিদ্র ও অভাব তাঁকে হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষাবলম্বনে বাধ্য করে।

হযরত মুয়াবিয়ার (রা) সাথে হযরত আলীর (রা) বিরোধ যখন তুঙ্গে তখন আকীল একবার ঋণ পরিশোধের আশায় হযরত আলীর (রা) কাছে যান। আলী তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করেন। তিনি পুত্র হাসানকে তাঁর সেবার দায়িত্ব দেন। হাসান অত্যন্ত যত্নের সাথে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। রাতে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবারের জন্য ডাকা হলো। আকীল এসে দেখলেন, দস্তরখানে কিছু শুকনো রুটি, লবণ ও সামান্য কিছু তরকারি সাজানো। আকীল বললেনঃ খাবার শুধু এই? আলী বললেনঃ হ্যাঁ। এবার আকীল নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বললেনঃ আমার ঋণসমূহ তুমি পরিশোধ করে দাও। আলী জিজ্ঞেস করলেনঃ কি পরিমাণ হবে? বললেনঃ চল্লিশ হাজার দিরহাম। আলী বললেনঃ এত অর্থ আমি কোথায় পাব? একটু অপেক্ষা করুন, আমার ভাতা চার হাজার হলে আপনাকে দিতে পারবো। আকীল বললেনঃ তোমার অসুবিধা কোথায়? বাইতুল মাল তো তোমার হাতে। তোমার ভাতা বৃদ্ধির অপেক্ষায় আমাকে কতদিন ঝুলিয়ে রাখবে? আলী বললেনঃ আমি তো মুসলমানদের অর্থের একজন আমানতদার মাত্র। আপনি কি চান, আমি সেই অর্থ আপনাকে দিয়ে খিয়ানত করি? এ উত্তর শুনে আকীল সোজা শামে আমীর মুয়াবিয়ার কাছে চলে যান। মুয়াবিয়া (রা) আকীলকে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি আলী ও তাঁর সাথীদের কেমন দেখলে? আকীল বললেনঃ তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সঠিক সাহাবী। শুধু এতটুকু অভাব যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের মাঝে নেই। আর তুমি ও তোমার সংগী-সাথীরা ঠিক আবু সুফইয়ানের সংগী সাথীদের মত। এমন তুলনা দেওয়ার পরও আমীর মুয়াবিয়া (রা) পরের দিন আকীলকে ডেকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম তাঁর হাতে তুলে দেন। (উসুদুল গাবা-৩/৪২৩)।

হযরত আকীলের শামে উপস্থিতির পর হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে বলতেনঃ আমি যদি সত্যের ওপর না হতাম তাহলে আকীল তাঁর ভাই আলীকে ছেড়ে আমার পক্ষাবলম্বন করলেন কিভাবে? একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আকীলের (রা) উপস্থিতিতে মানুষের সামনে এমন যুক্তি উপস্থাপন করলে আকীল প্রতিবাদ করে বললেনঃ আমার ভাই দ্বীনের জন্য ভাল, আর তুমি দুনিয়ার জন্য। এটা ভিন্ন কথা যে, আমি দুনিয়াকে দ্বীনের ওপর প্রাধান্য

দিয়েছি। আর আখিরাতের ব্যাপার—তা তার উত্তম সমাপ্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করি (উসুদুল গাবা-৩/৪২৩)।

হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালের শেষ দিকে অথবা ইয়াযীদের শাসনকালের প্রথম দিকে হযরত আকীল ইনতিকাল করেন। (আল ইসাবা-২/৪৯৪)।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দীর্ঘ সাহচর্য লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) একান্ত আপন ও প্রিয়জন হওয়া সত্বেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর যে পারদর্শিতা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। তথাপি হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত দু'চারটি হাদীস পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ, হাসান বসরী, 'আতা প্রমুখ তাবেয়ী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াও তিনি জাহিলী যুগের বিভিন্ন জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। ইলমুল আনসাব, আইয়্যামুল আরব—বংশবিদ্যা, প্রাচীন আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ। এসব বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষ তাঁর নিকট আসতো। তিনি মসজিদে নববীতে নামাযের পর এসব বিষয়ের আলোচনা করতেন এবং লোকেরা তা বসে বসে শুনতো।

হিশাম আল কালবী বলেনঃ আকীল, মাখরামা, হুয়াইতিব ও আবু জাহম—কুরাইশদের এ চার ব্যক্তির নিকট মানুষ তাদের ঝগড়া-বিবাদ ফায়সালার জন্য যেত। (আল ইসাবা-২/৪৯৪)।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনি বলতেনঃ আবু যায়িদ, তোমার প্রতি আমার দ্বিগুণ ভালোবাসা। একটা আত্মীয়তা এবং অন্যটা আমার চাচা তোমাকে ভালোবাসতেন—এই দুই কারণে।

সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় হযরত আকীল (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের যথাযথ অনুসারী ছিলেন। একবার তিনি নতুন বিয়ে করেছেন। সকাল বেলা পাড়া প্রতিবেশীরা তাঁকে স্বাগতম জানাতে এলো। তারা জাহিলী যুগে প্রচলিত দু'টি শব্দ উচ্চারণ করে স্বাগতম জানালো। শব্দ দু'টিতে ইসলাম বিরোধী কোন ভাবও ছিল না। তবে যেহেতু স্বাগতমের ইসলামী ভাষা বিদ্যমান ছিল তাই তিনি তাদের ভুল শুধরে দিয়ে বললেনঃ এমনটি নয় বরং একথা বলোঃ 'বারাকাল্লাহু লাকুম ওয়া বারাকাল্লাহু আলাইকুম।' আমাদেরকে এভাবে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর জীবিকার জন্য খাইবারের উৎপন্ন শস্য থেকে বাৎসরিক ১৪০ ওয়াসক নির্ধারণ করে দিয়ে যান। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৫০)।

হাকীম ইবন হাযাম (রা)

নাম হাকীম, ডাক নাম আবু খালিদ। পিতা হাযাম ইবনে খুওয়াইলিদ, মাতা যয়নাব মতান্তরে স্যাফিয়্যা। হাকীম নিজেই বলছেনঃ আমি 'আমুল ফীল' (হস্তী বৎসর) অর্থাৎ আবরাহার কা'বা আক্রমণের তের বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করি।' ওয়াকিদী বলেনঃ হাকীমের জন্ম রাসূলুল্লাহর (সা) জন্মের পাঁচ বছর পূর্বে। তাঁর পিতা হাযাম ফিজার যুদ্ধে মারা যায়। তিনি নিজেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুবাইর ইবন বাক্কার বলেনঃ হাকীম কা'বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা-১/৩৪৯)।

ইতিহাস বলছে, তিনি আরবের একমাত্র সন্তান যে কা'বার অভ্যন্তরে ভূমিষ্ট হয়েছে। তাঁর মা কয়েকজন বান্ধবীসহ কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। সেদিন কোন এক বিশেষ উপলক্ষে কা'বার দরযা খোলা ছিল। সে সময় তাঁর মা ছিলেন গর্ভবতী। আল্লাহর ইচ্ছায় সেখানে তাঁর প্রসব বেদনা ওঠে, তিনি বের হওয়ার সময় পেলেন না। একটি চামড়া বিছিয়ে দেওয়া হলো। তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তার নাম রাখা হয় হাকীম ইবন হাযাম। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ তাঁর ফুফু।

হাকীম মক্কার এক সম্পদশালী অভিজাত পরিবারে বেড়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন অতিশয় ভদ্র ও বুদ্ধিমান। কুরাইশরা তাঁকে নেতা হিসাবে বরণ করে নেয়। জাহিলী আরবে যারা মক্কায় আগত হাজীদের দেখা-শুনা করতো, আহার করাতো, তাদের বলা হতো 'মুতয়িম' অর্থাৎ যে আহার করায়— হাকীমও ছিলেন মক্কার এক অন্যতম 'মুতয়িম'। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৬৪-৬৫) জাহিলী যুগে যারা আল্লাহর ঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে দুর্দশায় পড়তো তিনি নিজের অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তরঙ্গ বন্ধু। বয়সে রাসূলুল্লাহর (সা) বড় হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসতেন, তাঁর সাহচর্যকে মূল্যবান মনে করতেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহও তাঁকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে সঙ্গ দিতেন।

অতঃপর হযরত খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ে হয় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হাকীমের আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে তাঁদের পুরাতন সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। তবে খুব বিস্ময়ের ব্যাপার যে, দু'জনের মধ্যে এত গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মককা বিজয়ের পূর্ব দিন পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহর(সা) ওপর ঈমান আনেননি। তিনি যখন ঈমান আনেন তখন রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতের বিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'লা হাকীমকে যে জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মীয়তা দান করেন তাতে এটাই সঙ্গত ছিল যে, তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ঈমান আনবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তা হয়নি। এ ব্যাপারে আমরা যেমন বিস্মিত হই, তেমনি তিনি নিজেও নিজের আচরণে বিস্মিত হয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পর আমরণ তিনি তাঁর বিগত জীবনের কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর পুত্র একদিন তাঁকে দেখলেন, তিনি বসে বসে কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ

—আব্বা, কাঁদছেন কেন?

—বেটা আমার কান্নার কারণ অনেকগুলি।

প্রথমতঃ আমি বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। ফলে বহু বড় বড় নেক কাজ থেকে পিছিয়ে পড়েছি। এখন যদি সমগ্র পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণও আমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করি তবুও আমি

তার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবো না।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ আমাকে বদর ও উহুদে প্রাণে বাঁচান। তখন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, আমি আর কক্ষণও রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করবো না এবং মক্কা থেকেও আর বের হব না। কিন্তু তার পরই আবার কুরাইশদের সাহায্য করার দুঃসাহস দেখিয়েছি।

তৃতীয়তঃ যখনই আমি ইসলাম গ্রহণের কথা ভেবেছি তখনই বয়স্ক সম্মানিত কুরাইশ নেতাদের প্রতি লক্ষ্য করেছি। তারা তাদের জাহেলী আচার-আচরণ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। আমিও তাদের অনুসরণ করেছি। আফসুস! আমি যদি তাদের অনুসরণ না করতাম! বাপ-দাদা ও নেতৃবৃন্দের অনুসরণই আমাকে ধ্বংস করেছে। বেটা, এখন আমি কেন কাঁদবো না?

হাকীমের এত বিলম্বে ইসলাম গ্রহণে যেমন আমরা এবং তিনি নিজেও বিস্মিত হয়েছেন, তেমনি খোদ রাসূলুল্লাহও (সা) কম বিস্মিত হননি। তাঁর মত অন্যান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা দ্রুত ইসলামে শামিল হোক রাসূল (সা) এটাই কামনা করতেন।

মক্কা বিজয়ের পূর্বরাত্রি রাসূল (সা) সাহাবীদের বললেন, মক্কার চার ব্যক্তির মুশরিক থাকা আমি পছন্দ করিনি। তারা ইসলাম গ্রহণ করুক এটাই আমি কামনা করেছি।

প্রশ্ন করা হলো, তারা কে কে? বললেন, আত্তাব ইবন উসাইদ, জুবাইর ইবন মুতয়িম, হাকীম ইবন হাযাম ও সুহাইল ইবন আমর। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁর সংগী-সাথীসহ মক্কার শিয়াবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ তখন মুশরিক বা পৌত্তলিক থাকা সত্ত্বেও হাকীম তাঁর ফুফু খাদীজাকে গোপনে খাদ্য সামগ্রী পাঠাতেন। একদিন গম নিয়ে যেতে নরাধম আবু জাহলের নজরে পড়ে যান। আবু জাহল বাধা দেয়। আবুল বাখতারী ইবন হিশাম কাছেই ছিল। সে এগিয়ে এসে আবু জাহলকে বলেঃ সে তার ফুফুর জন্য সামান্য কিছু খাদ্য পাঠাচ্ছে। তুমি তাতে বাধা দিচ্ছ? শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বেশ মারপিট হয়। (সীরাতু ইবন হিশাম ১/৩৫৩-৫৪)।

কুরাইশদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও যখন মক্কার ভেতরে ও বাইরে রাসূলের (সা) সাহায্যকারীর সংখ্যা বেড়ে গেল তখন কুরাইশরা বেশী বিচলিত হয়ে পড়লো। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মক্কার 'দারুন্ নাদওয়া' গৃহে সমবেত হলো। এ বৈঠকে অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে হাকীমও উপস্থিত ছিলেন। একজন নাজদী বৃদ্ধের বেশে ইবলিসও এ বৈঠকে উপস্থিত ছিল। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৮০-৮১)।

কুরাইশরা বদরে অবতরণের পর তাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহর (সা) কূপ থেকে পানি পান করার জন্য এগিয়ে এলো। তাদের মধ্যে হাকীমও ছিলেন। রাসূল (সা) তাদের পানি পানে বাধা দিতে নিষেধ করলেন। যারা সেই পানি পান করেছে, একমাত্র হাকীম ছাড়া তাদের সকলে বদরে নিহত হয়েছিল। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬২২)।

কুরাইশরা বদরে শিবির স্থাপনের পর উমাইর ইবন ওয়াহাবকে পাঠালো মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নিরুপনের জন্য। উমাইর মুসলিম শিবিরের আশেপাশে ঘুরে এসে বললেনঃ তারা তিনশো বা তার কিছু কম-বেশী হতে পারে। উমাইর কুরাইশদের যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্য মত প্রকাশ করেন। তাঁর কথা শুনে হাকীম ইবন হাযাম জনতার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে 'উতবা ইবন রাবী'য়ার কাছে এসে বললেনঃ আবুল ওয়ালীদ! তুমি কুরাইশদের নেতা ও সরদার। তুমি কুরাইশদের মান্যগণ্য ব্যক্তি। চিরদিন তাদের মধ্যে তোমার সুকীর্তি স্মরণ করা হোক তা কি তুমি চাও না? উতবা বললোঃ হাকীম, একথা কেন? হাকীম বললেনঃ তুমি লোকদের মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। উতবা হাকীমের সাথে একমত হয়। লোকদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণও দেয়। উতবা হাকীমকে আবু জাহলের নিকট পাঠায়। হাকীম বলেন, আমি আবু জাহলের

কাছে গিয়ে দেখলাম সে তার ঢালে তেল লাগাচ্ছে। আমি বললাম ঃ আবুল হাকাম! আমাকে উতবা তোমার নিকট এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে। আবু জাহল বললো ঃ আল্লাহর কসম! সে মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের দেখে কাপুরুষ হয়ে গেছে।

মুহাম্মাদ ও আমাদের মধ্যে আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ফিরবো না। আর উতবা তো এমন কথা বলবেই। তার ছেলে তো রয়েছে তাদের সাথে। এজন্য সে তোমাদের ভয় দিচ্ছে। এভাবে হাকীম ও উতবা সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন, আবু জাহলের গোয়ার্তুমীতে তা ভণ্ডুল হয়ে যায়। আল্লাহর ইচ্ছায় বদরের প্রথম শিকার সেই আবু জাহল। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬২২-২৪)।

বদরের পরাজয় সম্পর্কে হাকীম পরবর্তীকালে বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা একটি শব্দ শুনলাম, যেন আকাশ থেকে মাটিতে এসে পড়লো। শব্দটি ছিল একটি থালার ওপর পাথর পড়ার মত। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই পাথরটি নিক্ষেপ করেছিলেন। আমরা পরাজিত হয়েছিলাম। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৫০)।

মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) 'মাররাজ জাহরানে' পৌঁছে শিবির স্থাপন করেছেন। কুরাইশদের পক্ষ থেকে গোপনে খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আবু সুফইয়ান ইবন হারব, হাকীম ইবন হাযাম ও বুদাইল ইবন ওয়ারকা মক্কা থেকে বের হন। মক্কার অদূরে 'আরাক' নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা উট, ঘোড়া ও মানুষের শোরগোল শুনতে পান। তাঁরা আরও এগিয়ে রাতের অন্ধকারে এক সময় মুসলিম এলাকায় ঢুকে পড়েন। মুসলিম প্রহরীরা তাঁদের ধরে ফেলে। আবু সুফইয়ানের ঘাড়ে উমার (রা) কয়েকটি ঘুষি বসিয়ে দেন। আবু সুফইয়ান ভয়ে চেঁচিয়ে আব্বাসের সাহায্য কামনা করেন। আব্বাস ছুটে এসে তাঁকে উমারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। এদিকে হাকীম ও বুদাইলকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত করা হলে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু সুফইয়ানও ইসলাম গ্রহণ করেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/১৬৩, ১৭০-৭২, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪০০)

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করছেন। তিনি হাকীম ইবন হাযামকে সম্মান প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। তিনি এক ঘোষণা দানের নির্দেশ দেন ঃ

১· আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল— যারা এ সাক্ষ্য দিবে তারা নিরাপদ।

২· যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলে কা'বার চত্বরে বসে পড়বে সে নিরাপদ।

৩· যারা নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তারা নিরাপদ।

৪· যে আবু সুফইয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ।

৫· যে হাকীম ইবন হাযামের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে সেও নিরাপদ।

হাকীম ইবন হাযামের বাড়ীটি ছিল মক্কার নিম্নভূমিতে এবং আবু সুফইয়ানের বাড়ীটি উচ্চ ভূমিতে।

হাকীম ইবন হাযাম অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন যে, ইসলাম-পূর্ব জীবনে ইসলাম ও রাসূলের (সা) শত্রুতায় যে ভূমিকা ও যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন ঠিক তেমন ভূমিকা ও সেই পরিমাণ অর্থ তিনি ইসলামী জীবনে পালন ও ব্যয় করবেন।

মক্কার 'দারুন্ নাদওয়া' ছিল একটি বাড়ী। কুরাইশরা সেখানে সমবেত হয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। কুরাইশ বংশের ঊর্ধতন পুরুষ কুসাঈ এ বাড়ীটি নির্মাণ করে। হাত বদল হয়ে ইসলাম-পূর্ব যুগে হাকীম বাড়ীটির মালিক হন। ইসলাম গ্রহণের পর মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে তিনি বাড়ীটি এক লাখ দিরহামে বিক্রি করেন। মুয়াবিয়া তাঁকে তিরস্কার করে বলেন ঃ তুমি বাপ-দাদার

মর্যাদা ও কৌলিন্য বিক্রি করে দিলে? হাকীম বললেনঃ এক তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতি ছাড়া সব সম্মান, সব কৌলিন্য বিলীন হয়ে গেছে। জাহিলী যুগে একপাত্র মদের বিনিময়ে বাড়ীটি আমি কিনেছিলাম। আর আজ এক লাখ দিরহামে বিক্রি করলাম। তোমাকে আরও জানাচ্ছি, এ অর্থের সবই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হবে। সুতরাং ক্ষতিটি কোথায়? (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১২৫)

ইসলাম গ্রহণের পর হাকীম ইবন হাযাম একবার হজ্জ আদায় করলেন। মূল্যবান কাপড়ে সজ্জিত উত্তম জাতের একশো উট তাঁর আগে আগে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলেন। সবগুলিই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কুরবানী করলেন।

আর একবার তিনি হজ্জ করলেন। যখন তিনি আরাফাতে অবস্থান করছেন তখন তাঁর সাথে একশো দাস। প্রত্যেকের কণ্ঠে একটি করে রূপোর প্লেট ঝুলছে, আর তাতে লেখা আছেঃ 'হাকীম ইবন হাযামের পক্ষ থেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস।' তাদের সকলকে তিনি মুক্তি দেন।

অন্য একটি হজ্জে তিনি এক হাজার ছাগল-বকরী সংগে নিয়ে যান। সবগুলি মিনায় কুরবানী করেন এবং সেই গোশত দিয়ে মুসলমান গরীব-মিসকিনদের আহার করান।

হুনাইন যুদ্ধের পর হাকীম ইবন হাযাম রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গনীমতের সম্পদ থেকে চাইলেন। রাসূল (সা) তাঁকে কিছু দান করলেন। তিনি আবার চাইলেন। রাসূল (সা) তাঁকে আবারও দান করলেন। এভাবে সেদিন তিনি একাই একশো উট লাভ করলেন। তখন তিনি নওমুসলিম। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৯৩)। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকে লক্ষ্য করেন বলেনঃ

'ওহে হাকীম, এই সম্পদ অতি মিষ্টি ও অতি প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মতৃপ্তির সাথে গ্রহণ করে, তাতে বরকত দেওয়া হয়। আর যে তা লোভাতুর অবস্থায় গ্রহণ করে তাতে বরকত দেওয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির মত যে আহার করে; কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাতটি নীচের হাত অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। অর্থাৎ দাতা হাতটি গ্রহীতা হাত অপেক্ষা উত্তম।'

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে এ বাণী শুনে হাকীম বললেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার নামে শপথ, আজকের পর জীবনে আর কোন দিন কারও কাছে কিছুই চাইব না। কারও কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না।' হাকীম তাঁর শপথ যথাযথভাবে পালন করেন।

হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে 'বাইতুল মাল' থেকে হাকীমের ভাতা গ্রহণের জন্য খলীফা তাঁকে একাধিকবার আহবান জানান। হাকীম বার বার তা প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত 'উমার (রা) খলীফা হলেন। তিনিও বার বার হাকীমকে আহবান জানাতে লাগলেন তাঁর অংশ গ্রহণের জন্য। শেষ পর্যন্ত হযরত উমার (রা) জনগণকে সাক্ষী রেখে বললেনঃ 'ওহে মুসলিম জনমণ্ডলী! তোমরা শুনে রাখ, আমি হাকীমকে তার অংশ গ্রহণের আহবান জানিয়েছি, আর সে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে।' এভাবে হাকীম আমরণ আর কারও কাছে হাত পেতে আর কিছুই গ্রহণ করেননি। উমার (রা) প্রায়ই বলতেন,

'হে আল্লাহ, আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি হাকীমকে তার অংশ গ্রহণের জন্য ডেকেছি, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করেছে।' (হায়াতুস সাহাবা-২/২৫০-৫১)।

একবার হাকীম ইবন হাযাম মুশরিক অর্থাৎ পৌত্তলিক অবস্থায় ইয়ামনে যান। সেখান থেকে ইয়ামনের 'যু-ইয়াযন' রাজার একটি চাদর খরীদ করে মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) উপহার দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমি মুশরিকের কোন হাদিয়া গ্রহণ করিনে।' হাকীম চাদরটি বিক্রি করলে রাসূল (সা) ক্রয় করেন এবং গায়ে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন। হাকীম বলেন, এই পোশাকে এত সুন্দর আর কাউকে আমি আর কক্ষণও দেখিনি। রাসূলুল্লাহকে (সা) যেন পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের মত দেখাচ্ছিল। অচেতনভাবে তখন আমার মুখ থেকে

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসায় একটি কবিতা বেরিয়ে আসে। (হায়াতুস সাহাবা-২/২৪৩-৪৪)

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর ছাগল ক্রয়ের জন্য একটি দীনার দিয়ে হাকীমকে বাজারে পাঠালেন। তিনি বাজারে এক দীনারে একটি ছাগল ক্রয় করে আবার তা দুই দীনারে বিক্রি করেন। অতঃপর এক দীনার দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করে অন্য দীনারটিসহ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর রিযিকের বরকতের জন্য দু'আ করলেন এবং লাভের দীনারটি সাদকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৫)।

হযরত হাকীমের মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম বুখারী তাঁর 'তারিখে' উল্লেখ করেছেন, তিনি হিজরী ৬০ (ষাট) সনে একশো বিশ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তবে উরওয়ার মতে, তিনি খলীফা হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফতের দশম বছরে মৃত্যুবরণ করেন।

নাওফিল ইবন হারেস (রা)

নাম নাওফিল, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু হারেস। পিতা হারেস ইবন আবদিল মুত্তালিব, মাতা গাযিয়্যা। কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) দাওয়াতী কাজ শুরু করতেই নিকটতম আত্মীয়রাও তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগে যায়। তবে নাওফিলের অন্তরে সব সময় ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা বিদ্যমান ছিল। এ কারণে পৌত্তলিক থাকা অবস্থায়ও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বিরোধিতা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। মক্কার মুশরিকদের চাপে বাধ্য হয়ে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বদরে যান। কিন্তু তখন তাঁর মুখে এই পংক্তিটি বারবার উচ্চারিত হচ্ছিলঃ

"আহমাদের সাথে যুদ্ধ করা আমার জন্য হারাম, আহামাদকে আমি আমার নিকট আত্মীয় মনে করি।"

বদরে মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর পরাজয় হলে অন্যদের সাথে তিনিও বন্দী হন। এই বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেনঃ নাওফিল, ফিদিয়া বা মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়ে যাও। নাওফিল বললেনঃ মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ আমার নেই। রাসূল (সা) বললেনঃ তাহলে জিদ্দায় রেখে আসা তোমার তীরগুলি মুক্তিপণ হিসেবে দান কর। নাওফিল বলে উঠলেনঃ আল্লাহর কসম, এক আল্লাহ ছাড়া জিদ্দার তীরগুলির কথা আর কেউ জানে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। জিদ্দায় তাঁর এক হাজার তীর ছিল। অবশ্য অন্য একটি মতে তিনি খন্দক যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় চলে যান। (টীকাঃ সীরাতু ইবন হিশাম ২/৩, আল-ইসাবা-৩/৫৭৭)

নাওফিল ছিলেন একজন ভালো কবি। ইসলাম গ্রহণের পর স্বীয় অনুভূতি অনেক কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপঃ

"দূরে যাও, দূরে যাও, আমি আর তোমাদের নই।
কুরাইশ নেতাদের দ্বীনের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।
আমি সাক্ষ্য দিয়েছি, মুহাম্মাদ নিশ্চয়ই নবী।
তিনি তাঁর প্রভুর কাছ থেকে হিদায়াত ও দিব্যজ্ঞান নিয়ে এসেছেন।
তিনি আল্লাহর রাসূল—তাকওয়ার দিকে আহবান জানান,
আল্লাহর রাসূল কোন কবি নন।
এই বিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো।
কবরেও আমি এই বিশ্বাসের ওপর শুয়ে থাকবো।
আবার কিয়ামতের দিন এই বিশ্বাস নিয়ে ওঠবো।"

খন্দক অথবা মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে হযরত আব্বাসের (রা) সাথে আবার তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আবওয়া পৌঁছে রাবীয়া ইবন হারেস ইবন আবদিল মুত্তালিব আবার মক্কায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। নাওফিল তাঁকে বলেনঃ যে স্থানের মানুষ আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে, যেখানের অধিবাসীরা তাঁকে অস্বীকার করে— সেই পৌত্তলিক ভূমিতে তুমি কোথায় ফিরে যাবে? এখন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সম্মান দান করেছেন, তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তুমি আমাদের সাথেই চলো। অতঃপর কাফিলাটি হিজরাত করে মদীনায় পৌঁছে।

ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই নাওফিল ও আব্বাসের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। এ কারণে রাসূল (সা) তাঁদের দু'জনের মধ্যে দ্বীনী ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং দু'জনের বসবাসের জন্য দু'টি বাড়ীও বরাদ্দ করেন। বাড়ী দু'টির একটি ছিল মসজিদে নববী সংলগ্ন 'রাহবাতুল কাদা' নামক স্থানে এবং অন্যটি ছিল বাজারে— 'সানিয়্যাতুল বিদা'র রাস্তায়।

মদীনায় আসার পর সর্বপ্রথম মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। তায়েফ ও হুনাইনসহ বিভিন্ন অভিযানে যোগ দিয়ে বিশেষ যোগ্যতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বিশেষতঃ হুনাইনে তিনি চরম সাহসিকতা দেখান। মুসলিম বাহিনী যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় তখনও তিনি শত্রুর মুকাবিলায় পাহাড়ের মত অটল থাকেন। এই যুদ্ধে তিনি মুসলিম বাহিনীকে প্রভূত সাহায্য করেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিন হাজার নিযা তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন। রাসূল (সা) মন্তব্য করেনঃ 'আমি যেন দেখছি, তোমার তীরগুলি মুশরিকদের পিঠসমূহ বিদ্ধ করছে।' (টিকাঃ সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩)

হযরত নাওফিল (রা) হিজরী ১৫ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন এবং খলীফা হযরত উমার তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। মদীনার 'বাকী' গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সব সময় নাওফিলের খোঁজ খবর নিতেন, মদীনার এক মহিলার সাথে রাসূল (সা) তাঁর বিয়ে দেন। তখন তাঁর ঘরে কোন খাবার নেই। রাসূল (সা) স্বীয় বর্মটি আবু রাফে' ও আবু আইউবের হাতে দিয়ে এক ইয়াহুদীর নিকট পাঠান। তারা বর্মটি সেই ইয়াহুদীর নিকট বন্দক রেখে বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ত্রিশ সা' যব খরীদ করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে আসেন। তিনি তা নাওফিলকে দান করেন।

আবু রাফে' (রা)

হযরত আবু রাফে'র (রা) প্রকৃত নামের ব্যাপারে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। যেমনঃ ইবরাহীম, আসলাম, সিনান, ইয়াসার, সালেহ, আবদুর রহমান, কারমান, ইয়াযীদ, সাবেত, হুরমুয ইত্যাদি। এর মধ্যে আসলাম নামটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (আল ইসাবা-৪/৬৭) আবু রাফে' তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম। বংশ কৌলিন্যের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খিদমত করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে স্বীয় পরিবারের মধ্যে শামিল করে নেন। এর বেশী খান্দানী শরাফত কোন মানুষের জন্য আর হতে পারে না। আসলে তিনি ছিলেন একজন হাবশী দাস।

হযরত আবু রাফে' প্রথম হযরত 'আব্বাসের (রা) দাস ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) হিবা বা দান করেন। পরে হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত 'আব্বাসের (রা) ইসলাম গ্রহণের খুশীতে আবু রাফে'কে আযাদ করে দেন।

তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, হযরত রাসূলে পাকের (সা) পবিত্র মুখমণ্ডলের দীপ্তি দেখে যাঁরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন, আবু রাফে' তাদের অন্যতম। এ সম্পর্কে আবু রাফে' নিজেই বলছেনঃ একবার কুরাইশরা আমাকে তাদের কোন একটি কাজে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠায়। রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখামাত্র আমার অন্তর ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আর ফিরে যাব না। তিনি বললেন, 'আমি কাসেদ বা দূতকে ঠেকিয়ে রাখি না এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না। এখন তুমি ফিরে যাও। এভাবে যদি কিছু দিন তোমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আবেগ বিদ্যমান থাকে তাহলে চলে এসো।' তখনকার মত তো তিনি ফিরে গেলেন এবং কিছুদিন পর আবার ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আবু রাফে' অত্যাচারী কুরাইশ শক্তির ভয়ে বদর যুদ্ধ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। বদর যুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। এমন সময় একদিন তিনি কাবার পাশে যমযম কুয়োর ঘরে বসে তীর তৈরী করছেন। হযরত আব্বাসের স্ত্রী তাঁর পাশেই বসা। এ সময় নরাধম আবু লাহাব সেখানে এসে বসে। কিছুক্ষণ পর আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিস ইবন 'আবদিল মুত্তালিবও এসে বসে। আবু লাহাব তার কাছে বদর যুদ্ধের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। উল্লেখ্য যে, আবু লাহাব বদর যুদ্ধে নিজে যোগদান না করে প্রতিনিধি হিসাবে 'আস ইবন হিশামকে পাঠায়। আবু লাহাবের জিজ্ঞাসার জবাবে আবু সুফইয়ান বললোঃ তুমি কী জিজ্ঞেস করছো, মুসলমানরা আমাদের সকল শক্তি চুরমার করে দিয়েছে, অনেককে হত্যা ও বহু লোককে বন্দী করেছে। এ প্রসঙ্গে এক অভিনব কাহিনী বলা হয় যে, ভূমি থেকে আকাশ পর্যন্ত সাদা-কালো পোশাকের অশ্বারোহীতে পরিপূর্ণ ছিল। তার একথা শুনে আবু রাফে' অকস্মাৎ বলে ওঠেন, তারা ফিরিশতা। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফইয়ান আবু রাফে'র গালে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। আবু রাফে' আঘাতটা সামলে নিয়ে রুখে দাঁড়ান; কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল। আবু লাহাব তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং বুকের উপর উঠে বসে আচ্ছা মত মার দেয়। হযরত আব্বাসের স্ত্রী এ অত্যাচার দেখে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি একটি খুঁটি তুলে নিয়ে নরপশু আবু লাহাবের মাথায় কষে মারলেন এক বাড়ি। পাপাচারী আবু লাহাবের মাথা কেটে গেল। হযরত আব্বাসের স্ত্রী তখন বলতে লাগলেন, আবু রাফে'র মনিবের অনুপস্থিতির সুযোগে তাকে দুর্বল মনে করে মারছো? এ ঘটনার এক সপ্তাহ পর 'আদাসী' (বসন্ত) নামক রোগে আবু লাহারের মৃত্যু হয়। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৩০-৩১)

তাবারানী ইবন 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পঞ্চম বছরে আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হই। সেটা ছিল আহযাব যুদ্ধের সময়। আমি ছিলাম আমার ভাই ফদল ইবন আব্বাসের সাথে। আমাদের সাথে আমাদের গোলাম আবু রাফে'ও ছিল। মদীনায় পৌঁছে আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) খন্দকের মধ্যে পেলাম। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আবু রাফে হিজরী ৫ম সনে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। (হায়াতুস সাহাবা ১/৩৭৩) তবে ইবন হিশাম হযরত আয়িশার (রা) একটি বর্ণনা নকল করেছেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাতের কিছুদিন পর একটু স্থির হয়ে আমাদেরকে নেওয়ার জন্য যায়িদ ইবন হারিসা ও আবু রাফেকে মদীনা থেকে মক্কায় পাঠান। (সীরাতু ইবন হিশাম)

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় আবু রাফে' ৫ম হিজরীর পূর্বেই মদীনায় পৌঁছেন। মদীনায় তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে বসবাস করতে থাকেন।

একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। খাইবারের যুদ্ধ সম্পর্কে আবু রাফে' বর্ণনা করেনঃ আমরা 'আলীর নেতৃত্বে খাইবারে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় পতাকা 'আলীর হাতে দিয়ে খাইবারে পাঠান। আমরা দুর্গের কাছাকাছি গেলে দুর্গবাসীরা বের হয়ে এসে আমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করলো। আলী দুর্গের একটি দরযা ছিঁড়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সেটা তাঁর হাতে ছিল। তারপর ফেলে দেন। আমরা আট জন প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেটা উল্টাতে সক্ষম হইনি। (হায়াতুস সাহাবা-১/৫৪৬)

হিজরী সপ্তম সনে রাসূলুল্লাহ (সা) হুদাইবিয়ার সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী মক্কায় গিয়ে 'উমরাতুল কাদা' আদায় করেন। আবু রাফে' এই সফরেও রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। এই সফরে মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত মায়মুনার শাদী মুবারক অনুষ্ঠিত হয়। মক্কায় অবস্থানের মিয়াদ শেষ হলে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু রাফেকে মক্কায় রেখে 'সারফে' চলে যান। পরে আবু রাফে' হযরত মায়মুনাকে (রা) নিয়ে 'সারফে' পৌঁছেন এবং সেখানেই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। তারপর সকলে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৭২)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আলীর (রা) নেতৃত্বে যে বাহিনীটি ইয়ামনে পাঠান তাতে আবু রাফে'ও ছিলেন। হযরত আলী (রা) নিজের অনুপস্থিতিতে আবু রাফে'কে বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন।

ইসলাম দাস তথা দুর্বল শ্রেণীর লোকদের উন্নতির যে সুযোগ দান করেছে, আবু রাফে' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি দাস ছিলেন, তবে মর্যাদা ও যোগ্যতায় ছিলেন আযাদ লোকদের সমকক্ষ। হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত ৬৮টি হাদীস পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি ইমাম বুখারী ও তিনটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

দাসত্ব থেকে মুক্তির পরও তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খিদমতের গৌরব হাতছাড়া করেননি। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ ও অভ্যাস সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল অনেক। বিশিষ্ট সাহাবীরা এ বিষয়ে তাঁর কাছে জানার জন্য ভিড় করতেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) একজন সেক্রেটারী সংগে করে তাঁর কাছে আসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অমুক অমুক দিন কি কি কাজ করতেন? আবু রাফে' বলতেন আর সেক্রেটারী তা লিখে নিতেন। (আল-ইসাবা-৪/৯২)

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আযাদ করে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে আবদ্ধ থাকেন। রাসূল (সা) যখন তাঁকে মুক্তি দেন, তখন আবু রাফের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। লোকেরা তাঁকে বলে, দাসত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছ, এতে কান্নার কি আছে! তিনি

বললেন, আজ একটি সোয়াব আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এরপর থেকে যদিও তিনি আইনগত ভাবে মুক্ত বা স্বাধীন হয়ে যান, তবে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতের মর্যাদা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকেন। সফরের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁবু তিনিই তৈরী করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর এই গোলামীর সম্পর্কটা এত মধুর ও প্রিয় ছিল যে, আমরণ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) গোলাম বা দাস বলে নিজের পরিচয় দিতেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) এক সাহাবী নাওফিল ইবন হারিসকে এক মহিলার সাথে বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর খাওয়ার মত কোন কিছু তার কাছে চাইলেন; কিন্তু পেলেন না। তখন রাসূল (সা) স্বীয় বর্মটি আবু রাফে' ও আবু আইউবের হাতে দিয়ে বিক্রীর জন্য পাঠালেন। তাঁরা বর্মটি এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রেখে তিরিশ সা' যব নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলেন। রাসূল (সা) যবগুলি নাওফিলের হাতে তুলে দিলেন। নাওফিল বলেন, আমরা সেই যবগুলি অর্ধ বছর খেয়েছিলাম। তারপর ওজন করে দেখলাম তা মোটেই কমেনি, পূর্বের মতই আছে। একথা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললে তিনি মন্তব্য করলেন, যদি ওজন না করতে তাহলে সারা জীবন খেতে পারতে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৩০)

হযরত আবু রাফে' জীবনের এক পর্যায়ে দারুণ অভাব ও অর্থকষ্টে পড়েন। এমনকি মানুষের কাছে হাত পেতে সাদকা ও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তবে কক্ষনো প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করেননি। তাঁর জীবনের এ পর্যায় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আবু রাফে' বলছেন, একদিন রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে আবু রাফে', যখন তুমি দরিদ্র হয়ে যাবে তখন কেমন হবে?" আবু রাফে' বললেন, 'আমি কি সে অবস্থায় সাদকা গ্রহণ করবো?' রাসূল (সা) বললেন, 'হাঁ।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার দারিদ্র্য কখন আসবে?' বললেন, 'আমার মৃত্যুর পরে।' বর্ণনাকারী আবু সুলাইম বলেন, আমি তাঁকে দরিদ্র অবস্থায় দেখেছি। পথের ধারে বসে তিনি বলতেন, এই অন্ধ বৃদ্ধকে কে সাদকা করতে চায়, কে সেই ব্যক্তিকে দান করতে চায় যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলে গেছেন যে, সে ভবিষ্যতে দরিদ্র হবে? তিনি আরও বলে গেছেন, ধনী ব্যক্তির জন্য সাদকা গ্রহণ বৈধ নয় এবং বৈধ নয় সুস্থ্য ব্যক্তির জন্যও। আবু সুলাইম বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে আবু রাফে'কে চারটি দিরহাম দান করলো; কিন্তু তিনি একটি দিরহাম ফেরত দিলেন। লোকটি বললো, আবদুল্লাহ, আমার দান আপনি ফেরত দেবেন না। আবু রাফে' বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে অতিরিক্ত সম্পদ জমা করতে নিষেধ করেছেন। আবু সুলাইম আরও বলেন, আমি শেষ পর্যন্ত আবু রাফে'কে ধনী ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছি, আফসুস, আবু রাফে' যদি দরিদ্র অবস্থায় মারা যেত! (হায়াতুস সাহাবা-২/২৫৩-৫৪)

ওয়াকিদীর মতে হযরত আবু রাফে' খলীফা 'উসমানের (রা) মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে বা পরে, আর ইবন হিব্বানের মতে হযরত আলীর খিলাফত কালে মদীনায় ইনতিকাল করেন। (আল ইসাবা-৪/৬৭)

উবাইদাহ ইবনুল হারিস (রা)

নাম 'উবাইদাহ, কুনিয়াত আবুল হারিস বা আবু মু'য়াবিয়া। পিতা আল হারিস এবং মাতা সুখাইলা। দাদা আবদুল মুত্তালিব ইবন আবদে মান্নাফ। কুরাইশ গোত্রের সন্তান।

'উবাইদাহ ইবনুল হারিস, আবু সালামা ইবনে আবদিল আসাদ, আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম এবং উসমান ইবন মাজউন হযরত আবু বকরের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে একসাথে ঈমান আনেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তখন আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নেননি। হযরত উবাইদাহ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি বনী 'আবদে মান্নাফের একজন নেতা। মক্কায় হযরত বিলালকে তিনি দ্বীনী ভাই হিসাবে গ্রহণ করেন।

মদীনায় হিজরাতের নির্দেশ হলো। হযরত উবাইদাহ তাঁর দুই ভাই তুফাইল, হুসাইন এবং মিসতাহ ইবন উসাসাহকে সাথে করে মদীনায় রওয়ানা হলেন। পথে মিসতাহকে অকস্মাৎ বিচ্ছুতে দংশন করে। তিনি কাফিলা থেকে পেছনে পড়ে গেলেন। মিসতাহ হাঁটা-চলা করতে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়লেন। অগ্রগামী কাফিলার লোকেরা খবর পেয়ে ফিরে এসে তাঁকে উঠিয়ে মদীনায় নিয়ে যান। মদীনায় হযরত আবদুর রহমান 'আজলানী (রা) তাদের স্বাগত জানান এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে তাঁদের আতিথেয়তা করেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আগমনের পর পর হযরত 'উমাইর ইবন হুমাম আল আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথকভাবে বসবাসের জন্য রাসূল (সা) তাঁকে একখণ্ড জমিও দান করেন। তাঁর পুরো খান্দান সেখানে বসতি স্থাপন করে।

মক্কার মুশরিকদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য হিজরাতের আট মাস পরে ৬০ জন মুহাজিরের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে রাসূল (সা) তাঁকে রাবেগের দিকে পাঠান। ইসলামের ইতিহাসে এটা ছিল দ্বিতীয় অভিযান। রাসূলুল্লাহ (সা) এ বাহিনীর ঝাণ্ডা উবাইদার হাতে অর্পণ করেন। তাঁরা রাবেগের নিকটে পৌঁছলে আবু সুফইয়ানের নেতৃত্বে দু'শো মুশরিকের একটি বাহিনীর সাথে তাঁদের সামান্য সংঘর্ষ হয়। ব্যাপারটি যুদ্ধ ও রক্তপাত পর্যন্ত না গড়িয়ে কিছু তীর ও বর্শা ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

এ ঘটনার পর তিনি হক ও বাতিলের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কাতারবন্দী হওয়ার পর মুশরিকদের পক্ষ থেকে উতবা, শাইবা ও ওয়ালীদ বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলতে থাকে— আমাদের সাথে লড়বার কেউ আছে কি? ইসলামী ফৌজ থেকে কয়েকজন নওজোয়ান আনসারী এগিয়ে গেলেন। তখন তারা চেঁচিয়ে বললো, "মুহাম্মাদ, আমরা অসম লোকদের সাথে লড়তে পারিনে। আমাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের পাঠাও।" রাসূল (সা) আলী, হামযা ও উবাইদাহকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা এ আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। এ তিন বীর আদেশ পাওয়া মাত্র আপন আপন নিযা দোলাতে দোলাতে তিন প্রতিপক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হযরত উবাইদাহ ও ওয়ালীদের মধ্যে দীর্ঘ সময় লড়াই চললো। তাঁরা দু'জনই মারাত্মক যখম হলেন। তবে আলী ও হামযা উভয়েই প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে ফেলেছিলেন। তারা একসাথে ওয়ালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন এবং হযরত উবাইদাহকে রণাঙ্গন থেকে আহত অবস্থায় তুলে নিয়ে আসেন।

হযরত উবাইদাহর একটি পা হাঁটুর নীচ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি আপাদমস্তক রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাঁর হাঁটুর ওপর স্বীয় মাথাটি রেখে দেন।

এ অবস্থায় উবাইদাহ বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ সময় আবু তালিব জীবিত থেকে আমার এ অবস্থা দেখলে তাঁর প্রত্যয় হতো যে, তাঁর একথা বলার অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি আমি। এই বলে তিনি আবু তালিবের একটি কবিতার এই পংক্তি আবৃত্তি করেন, "আমরা মুহাম্মাদের হিফাজত করবো। এমনকি তার চারপাশে মরে পড়ে থাকবো এবং আমাদের সন্তান ও স্ত্রীদের আমরা ভুলে যাব।" (সীরাতু ইবন হিশাম-২)

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সাথে করে মদীনার দিকে রওয়ানা হন। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। পথে 'সাফরা' নামক স্থানে ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। সাফরার বালুর মধ্যে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত রাসূলে কারীমের কাছে তাঁর উঁচু মর্যাদা ছিল। রাসূল (সা) তাঁকে অত্যন্ত সম্মান দেখাতেন। একবার রাসূল (সা) 'সাফরায়' তাঁর কবরের কাছে তাঁবু স্থাপন করেন। সাহাবীরা 'আরজ করেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ এখান থেকে মিশকের ঘ্রাণ আসছে। তিনি বললেন, "এখানে তো আবু মুয়াবিয়ার কবর ছিল। সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কি আছে।"

হযরত উবাইদার (রা) মৃত্যুতে হিন্দা বিনতু উসাসা ও কা'বসহ বহু কবি শোকগাথা রচনা করেছিলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৪, ২৫, ৪১)

'উকাশা ইবন মিহসান (রা)

নাম 'উকাশা বা 'উক্‌কাশা, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু মিহসান। পিতা মিহসান ইবন হুরসান। জাহিলী যুগে বনী আবদে শামসের হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন।

হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অন্যদের সাথে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যান। (উসুদুল গাবা-৪/২)।

বদর যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য দারুণ নাম করেন। এ যুদ্ধে তাঁর হাতের তরবারিটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে একটি খেজুরের ছড়ি দান করেন এবং তা দিয়েই তিনি সূচালো ছুরির মত শত্রুর ওপর আক্রমণ চালান। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিনি এ ছড়ি দিয়েই লড়ে যান। (ইসতীয়াব) ইবন সাদ যায়িদ ইবন আসলাম ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করছেন ঃ বদরের দিন 'উকাশা ইবন মিহসানের অসিটি ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে একটি কাঠের লাঠি দেন। সেটি তাঁর হাতে স্বচ্ছ ঝকমকে কঠিন লোহার তীক্ষ্ণ অসিতে পরিণত হয়। (হায়াতুস সাহাবা—৩/৬৫৮)

উহুদ, খন্দকসহ সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি চরম বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। হিজরী সপ্তম সনের রাবীউল আউয়াল মাসে বনী আসাদের মূলোৎপাটনের জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মদীনার পথে 'গামার' কূপের আশেপাশে ছিল এই বনী আসাদের বসতি। তিনি চল্লিশ জনের একটি বাহিনী নিয়ে দ্রুত সেখানে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু বনী আসাদের লোকেরা ভয়ে আগেভাগেই সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যায়। 'উকাশা কাউকে না পেয়ে তাদের পরিত্যাক্ত দু'শো উট ও কিছু ছাগল-বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

হিজরী ১২ সনে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে ভণ্ডনবী তুলাইহা আসাদীর বিদ্রোহ নির্মূলের নির্দেশ দেন। হযরত 'উকাশা ও হযরত সাবিত ইবন আকরাম ছিলেন হযরত খালিদের বাহিনীর দু'জন অগ্রসৈনিক। তাঁরা বাহিনীর আগে আগে চলছিলেন। হঠাৎ শত্রু সৈন্যের সাথে তাঁদের সংঘর্ষ ঘটে। এই শত্রু সৈনিকদের মধ্যে তুলাইহা নিজে ও তাঁর ভাই সালামাও ছিল। তুলাইহা আক্রমণ করে 'উকাশাকে, আর সালামা ঝাঁপিয়ে পড়ে সাবিতের ওপর। সাবিত শাহাদত বরণ করেন। এমন সময় তুলাইহা চেঁচিয়ে ওঠে "সালামা শিগগির আমাকে সাহায্য কর। আমাকে মেরে ফেললো।" সালামার কাজ তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে তুলাইহার সাহায্যে এগিয়ে যায় এবং দুই ভাই একসাথে 'উকাশাকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করে ফেলে। এভাবে 'উকাশা শহীদ হন।

ইসলামী ফৌজ এই দুই শহীদের লাশের কাছে পৌঁছে ভীষণ শোকাতুর হয়ে পড়ে। হযরত 'উকাশার দেহে মারাত্মক যখমের চিহ্ন ছিল। তাঁর সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। বাহিনী প্রধান হযরত খালিদ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাহিনীর যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন। অতঃপর শহীদ দু'য়ের রক্তভেজা কাপড়েই কাফন দিয়ে সেই মরুভূমির বালুতে দাফন করেন।

মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। (উসুদুল গাবা-৪/৩) হযরত রাসূলে কারীম (সা) একবার বলেন, সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 'উকাশা প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ? বললেন, তুমিও তাদের মধ্যে। অতঃপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'উকাশা তোমার থেকে এগিয়ে গেছে। এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহর (সা) এই বাক্যটি একটি প্রবাদে পরিণত হয়। কেউ কোন ব্যাপারে কাউকে ছাড়িয়ে গেলে বলা হয়, অমুক 'উকাশার মত এগিয়ে গেছে।

শাম্মাস ইবন 'উসমান (রা)

নাম শাম্মাস, পিতার নাম 'উসমান এবং মাতার নাম সাফিয়্যাহ্। কুরাইশ গোত্রের বনু মাখযুম শাখার সন্তান।

হিশাম কালবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'উসমান। শাম্মাস নামকরণের কারণ এই যে, একবার জাহিলী যুগে পরম সুন্দর এক খৃষ্টান পুরুষ মক্কায় আসে। তার চেহারা থেকে যেন সূর্যের কিরণ চমকাচ্ছিল। তার এ অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য দেখে মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। হযরত শাম্মাসের মামা 'উতবা ইবন রাবী'য়া এ সময় দাবী করলো যে, তার কাছে এর থেকেও বেশী সূর্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে এমন মানুষ আছে। আর সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হযরত শাম্মাসকে উপস্থাপন করে। সেদিন থেকে 'উসমান শাম্মাসে পরিণত হন। শাম্মাস অর্থ অতিরিক্ত সূর্য কিরণ বিচ্ছুরণকারী। (উসুদুল গাবা-৩/৩৭৫) যুবাইর ইবন বাক্কার বলেনঃ তিনি ছিলেন মক্কার অন্যতম সুদর্শন ব্যক্তি। (আল-ইসাবা১/১৫৫)

হযরত শাম্মাস ও তাঁর মা হযরত সাফিয়্যা বিনতু রাবী'য়া প্রথম পর্বেই রাসূলুল্লাহর (সা) দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুশরিকদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। সংগে মা সাফিয়্যাকেও নিয়ে যান। সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আবার মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় হযরত মুবাশ্‌শির ইবন আল-মুনজিরের অতিথি হন। হযরত হানজালা ইবন আবী 'আমের আল-আনসারীর সাথে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বদর ও উহুদ যুদ্ধে হযরত শাম্মাস বীরত্বের সাথে জীবন বাজি রেখে লড়াই করেন। উহুদের যুদ্ধে হঠাৎ করে যখন মুসলমানদের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয় এবং মাত্র গুটি কয়েক জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদ ছাড়া আর সকলে ময়দান ছেড়ে দেয়, সেই চরম মুহূর্তে যে ক'জন রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে থেকে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করেন তাঁদের মধ্যে শাম্মাস একজন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেনঃ এক ঢাল ছাড়া আমি শাম্মাসের আর কোন উপমা পাইনা। রাসূল (সা) সেদিন ডানে-বাঁয়ে যেদিকে তাকান কেবল শাম্মাসই দৃষ্টিতে পড়েন। তিনি নিজেকে সেদিন রাসূলুল্লাহর ঢালে পরিণত করেন। তাঁর সারাটি দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল প্রাণ স্পন্দন কোন রকম অবশিষ্ট আছে। এ অবস্থায় মদীনায় আনা হলো। হযরত উম্মু সালামাকে তাঁর সেবার দায়িত্ব দেওয়া হলো। কিন্তু তখন তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়। একদিন পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর রক্তমাখা জামা-কাপড়েই জানাযার নামায ছাড়াই উহুদের শহীদদের কবরস্থানে দাফন করার নির্দেশ দেন। তাঁকে আবার উহুদে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়। তবে ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেনঃ তাঁকে মদীনার বাকী' গোরস্তানে দাফন করা হয়। তিনি ছাড়া উহুদে শাহাদাত প্রাপ্ত আর কেউ বাকী' গোরস্তানে সমাহিত হননি। (আল ইসাবা-২/১৫৫) হযরত হাস্‌সান (রা) তাঁর মৃত্যুতে শোক গাঁথা রচনা করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র চৌত্রিশ বছর।

শুজা' ইবন ওয়াহাব (রা)

নাম শুজা', কুনিয়াত আবু ওয়াহাব এবং পিতা ওয়াহাব। জাহিলী যুগে তাঁর খান্দান বনী 'আবদে শামস-এর হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ ছিল। (উসুদুলগাবা-২/৩৮৬)

যাঁরা ইসলামের সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন, হযরত শুজা' তাঁদেরই একজন। মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে হাবশা হিজরাতকারী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশা যান। (আল-ইসাবা-৩/১৩৮) তাঁদের হাবশা অবস্থান কালে যখন সেখানে এ গুজব রটে যে মক্কার সকল বাসিন্দা রাসূলুল্লাহর (সা) আনুগত্য মেনে নিয়েছে, তখন স্বদেশের ভালোবাসা অনেকের মত তাঁকেও মক্কায় টেনে নিয়ে আসে। মক্কায় এসে দেখেন খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিছুদিন মক্কায় অবস্থানের পর নিরাপদে মদীনায় হিজরাত করেন। এখানে হযরত আউসের সাথে তার দ্বীনি ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বদর, উহুদ সহ সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। হিজরী ৮ম সনের রবীউল আউয়াল মাসে বনী হাওয়াযিনের একটি দলকে নির্মূলের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। এই বনী হাওয়াযিন মদীনা থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে 'রস্‌সী' নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেছিল। হযরত শুজা' চব্বিশ জন দুঃসাহসী মুজাহিদকে সংগে করে দিনের বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে এবং রাতের বেলা সদম্ভে ভ্রমণ করতে করতে একদিন হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের বিপুল সংখ্যক উট, ভেড়া-বকরী ছিনিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন। গানীমতের মালের পরিমাণ এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, প্রত্যেক মুজাহিদের ভাগে অন্যান্য জিনিসপত্র ছাড়াও পনরটি উট পড়েছিল।

হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল (সা) তৎকালীন বিশ্বের অধিকাংশ রাজা-বাদশাদের নিকট পত্রসহ দূত পাঠান। রাসূল (সা) হযরত শুজা'কে একটি পত্র সহ হারেস ইবন আবী শিম্‌র আল-গাস্‌সানী মতান্তরে মুনজির ইবন হারেস ইবন আবী শিম্‌র আল-গাস্‌সানীর নিকট পাঠান। হায়াতুসসাহাবা—১/১২৭) এই হারেস ছিল দিমাশকের নিকটবর্তী 'গুতা' স্থানের শাসক। রাসূল (সা) তাঁকে যে পত্রটি লেখেন তার প্রথম কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপঃ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হারেস ইবন আবী শিমরের প্রতি। যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে, ঈমান আনে এবং সত্য বলে জানে তাদের উপর সালাম। আমি আপনাকে সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছি যিনি এক, যার কোন শরিক নেই। এমতাবস্থায় আপনার রাজত্ব বহাল থাকবে।"

হারেস এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। তবে তার উযীর 'মুরাই' ইসলাম গ্রহণ করেন এবং গোপনে হযরত শুজা'র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে সালাম পেশ করেন।

ইমাম যুহরী বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায়, শুজা' ইবন ওয়াহাব ছিলেন পারস্যের কিসরার দরবারে প্রেরিত রাসূলুল্লাহর (সা) দূত। রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠিটি তিনিই কিসরার হাতে অর্পন করেন। (হায়াতুস সাহাবা—১/১৩৬)

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে ভণ্ড নবী মুসাইলামা আল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে ইয়ামামার প্রান্তরে হযরত শুজা' শাহাদাত বরণ করেন। (আল-ইসাবা-২/১৩৮) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছরের কিছু বেশী।

মিহরায ইবন নাদলা (রা)

নাম মিহরায, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু ফাদলাহ্। তবে প্রধানতঃ 'আখরাম আল-আসাদী' উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তিনি কখন কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তিনি প্রথম পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন বলে সীরাত বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করার পর আবদুল আশহাল গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন এবং হযরত 'আম্মার ইবন হাযামের (রা) সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূসা ইবন 'উকবা, ইবন ইসহাক ও অন্যরা তাঁকে বদরী সাহাবীদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদী আয়্যুব ইবন নু'মান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ বদরে মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের ভাই আবু 'আযীয ইবন 'উমাইর বন্দী হয়। তাকে মিহরায ইবন নাদলার হিফাজতে দেওয়া হয়। মুসয়াব মুহরিযকে বলেনঃ 'ওর হাতটি একটু কষে বাঁধ। মক্কায় ওর একজন সম্পদশালী মা আছে।' আবু আযীয বলেঃ ভাই, আমার প্রতি আপনার এমন নির্দেশ? মুসয়াব বললেনঃ তোমার স্থলে মুহরিয আমার ভাই।' আবু আযীযের মুক্তির জন্য তার মা চার হাজার দিরহাম পাঠায়। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩১৫)

উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধেও তিনি জীবন বাজি রেখে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ ও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হলো 'জী কারাদের' যুদ্ধ। হিজরী ৬ষ্ঠ সনে বনু ফাযারাহ মদীনার উপকণ্ঠে একটি চারণক্ষেত্রে হামলা চালায় এবং রাখালদের হত্যা করে রাসূলুল্লাহর (সা) উটগুলি লুট করে নিয়ে যায়। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া ঘটনাস্থলের নিকটেই ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দাস রাবাহকে, মতান্তরে আবদুর রহমান ইবন 'আউফের একটি দাসকে মদীনায় পাঠান খবর দেওয়ার জন্য। আর এ দিকে তিনি নিজে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে 'ইয়া সাবাহাহ' (বিপদের সর্তক ধ্বনি) বলে এমন জোরে ধ্বনি দেন যে, মদীনার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দীর্ঘক্ষণ একাকী তীর ও পাথরের সাহায্যে এই ডাকাত দলের মুকাবিলা করতে থাকেন। এর মধ্যে গাছের ফাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) বাহিনী ছুটে আসতে দেখা গেল। সেই বাহিনীর পুরোভাগে ছিলেন হযরত মুহরিয ইবন নাদলা। আর তাঁর পেছনে ছিলেন হযরত আবু কাতাদাহ আল-আনসারী ও মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)। হযরত সালামা ইবন আকওয়া হযরত আখরাম বা মিহরাযের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললেনঃ "আখরাম, আগে অগ্রসর হবে না। আমার ভয় হচ্ছে, ডাকাতরা তোমাকে ঘিরে ফেলবে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে তোমাকে মিলিত হতে দেবে না।" তিনি জবাব দিলেনঃ 'সালামা, তুমি যদি আল্লাহ এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, আর তোমার যদি একথা জানা থাকে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, তাহলে আমার শাহাদাত লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়ো না। কথাটি তিনি এমন আবেগের সাথে উচ্চারণ করেন যে, হযরত সালামা (রা) তাঁর ঘোড়ার লাগামটি ছেড়ে দেন। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে আবদুর রহমান ইবন ফাযারীর সামনে গিয়ে পথ রুখে দাঁড়ান। তিনি আবদুর রহমানের উপর তরবারির এমন শক্ত আঘাত হানেন যে, তার ঘোড়াটি কেটে দু'টুকরো হয়ে যায়। এদিকে আবদুর রহমানের নিক্ষিপ্ত বর্শাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। হযরত মিহরাযের শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আর আবদুর রহমান লাফিয়ে মিহরাযের ঘোড়ার উপর চড়ে বসে। পেছনেই ছিলেন হযরত আবু কাতাদাহ। তিনি সাথে সাথে আব্দুর

রহমানের উপর তীব্র আঘাত হানেন। এভাবে আবু কাতাদাহ (রা) আবদুর রহমানকে জাহান্নামে পাঠিয়ে বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেন। শাহাদাতের সময় হযরত মিহরাযের বয়স হয়েছিল ৩৭ অথবা ৩৮ বছর।

উপরে উল্লেখিত ঘটনা তাঁর ঈমানী দৃঢ়তা ও শাহাদাতের তীব্র আকাংখার স্পষ্ট প্রমাণ। শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, আকাশের দরযাসমূহ তাঁর জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি সর্বোচ্চ জগতে ভ্রমণ করতে করতে সিদরাতুল মুন্‌তাহা পৌঁছে গেছেন। সেখানে তাঁকে বলা হয়, এটাই তোমার আবাসস্থল।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন স্বপ্নের তাবীর বা তাৎপর্য ব্যাখার ক্ষেত্রে সুবিজ্ঞ। হযরত মিহরায পরের দিন তাঁর নিকট স্বপ্নটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ 'আখরাম, তোমার শাহাদাতের সুসংবাদ।' এ ঘটনার কিছুদিন পর 'জী কারাদ' অভিযানে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় এবং তিনি তাঁর স্থায়ী আবাসস্থল 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা' পৌঁছে যান।

শুকরান সালেহ (রা)

নাম সালেহ, লকব বা উপাধি 'শুকরান'। পিতার নাম আদী। হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফের (রা) হাবশী বংশজাত দাস। তবে এই দাসত্বের মধ্যেও নেতৃত্বদান তাঁর ভাগ্যে ছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) নিজের কাজের জন্য তাঁকে নির্বাচন করেন। অর্থের বিনিময়ে তাঁকে আবদুর রহমানের নিকট থেকে খরীদ করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত আবদুর রহমান কোন রকম অর্থ বিনিময় ছাড়াই তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকূলে হিবা করেন।

তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তিনি কখন কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন সে সম্পর্কেও তেমন কোন তথ্য সীরাতের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না।

অধিকাংশ যুদ্ধে হযরত শুকরান যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও কয়েদীদের হিফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত হতেন। এ কারণে যুদ্ধে তিনি একদিকে গানীমতের অংশ পেতেন, আবার অন্যদিকে যাঁদের কয়েদীদের দেখা-শুনার দায়িত্ব পালন করতেন তাদের নিকট থেকে পারিশ্রমিক পেতেন। আবু মা'শার বলেন, তিনি দাস হিসাবে বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। এ কারণে বদরের গানীমতের অংশ তাঁকে দেওয়া হয়নি। তবে বদরে বন্দীদের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রত্যেকেই কিছু কিছু অর্থ তাঁকে দান করে। এতে যাঁরা গানীমতের অংশ পেয়েছিলেন তাঁদের থেকেও তিনি বেশী পেয়ে যান। বদর যুদ্ধে তাঁর দায়িত্ব পালনে সতর্কতা ও দক্ষতা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) এতই মুগ্ধ হন যে, তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করেন।

'মাররে ইয়া'সী' যুদ্ধে পরাজিত শত্রু বাহিনীর পরিত্যাক্ত অর্থ সম্পদ অস্ত্র-শস্ত্র, ছাগল-বকরী ও তাদের অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী জমা করার দায়িত্বে তাঁকে নিয়োজিত করা হয়।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর প্রতি এত প্রসন্ন ছিলেন যে, ইনতিকালের সময় তাঁর প্রতি সদাচরণের জন্য অসীয়াত করে যান। হযরত শুকরান (রা) আহলে বাইত বা রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবার-পরিজনদের সাথে তাঁর দাফন-কাফনে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইবন ইসহাক আলী ইবনুল হুসাইনের সূত্রে বর্ণনা করেন, আলী ইবন আবু তালিব, ফাদল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস, শুকরান মাওলা রাসূলিল্লাহ ও আউস ইবন খাওলা কবরে নেমে রাসূলুল্লাহকে কবরে শায়িত করেন। (আল-ইসাবা ২/১৫৩, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬৪)।

হযরত রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত শুকরান (রা) মদীনায় থাকেন না বসরায় বসতি স্থাপন করেন—এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কারণ, বসরায় তাঁর একটি বাড়ী ছিল। তাঁর মৃত্যুর সন ও স্থান সম্পর্কেও সঠিকভাবে জানা যায় না। ইতিহাসে তিনি শুকরান মাওলা রাসূলিল্লাহ—রাসূলুল্লাহর আযাদকৃত দাস শুকরান নামে প্রসিদ্ধ।

উমাইর ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা)

নাম 'উমাইর, পিতা আবু ওয়াককাস, মাতা হামনা বিনতু সুফইয়ান। ইরান বিজয়ী হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াককাসের সহোদর।

হযরত 'উমাইরের বড় ভাই হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াককাস ইসলামের সূচনা পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন হযরত 'উমাইরের বয়স যদিও কম তথাপি তিনি বড় ভাই-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে হিজরাত করে মদীনায় পৌঁছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার 'আবদুল আশহাল গোত্রের সরদার হযরত সা'দ ইবন মুয়াজের ছোট ভাই হযরত 'আমর ইবন মু'য়াজের সাথে তাঁর দ্বীনি ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। তাঁরা দু'জনই প্রায় সমবয়সী ছিলেন।

হিজরী ২য় সনে বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সৈনিক নির্বাচন করছেন। হযরত 'উমাইরও সমাবেশে হাজির হয়েছেন। তাঁর ভাই সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস দেখলেন, 'উমাইর তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে অস্থির হয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে। তিনি ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ উমাইর, কি হয়েছে তোমার ? তিনি জবাব দিলেন ঃ ভাই, আমিও যুদ্ধে শরিক হতে চাই। হতে পারে, আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দান করবেন। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমাকে ছোট মনে করে রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরিয়ে না দেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে যখন সকলে একের পর এক হাজির হলেন তখন 'উমাইরের আশংকা সত্যে পরিণত হলো। তিনি 'উমাইরের বয়সের দিক লক্ষ্য করে বললেনঃ 'তুমি ফিরে যাও। একথা শুনে হযরত 'উমাইর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর এ কান্না, জিহাদের আগ্রহ ও শাহাদাতের তীব্র বাসনা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) মুগ্ধ হন। 'উমাইর যুদ্ধে শরিক হওয়ার অনুমতি লাভ করেন। রাসূল (সা) নিজ হাতে তাঁর তরবারিটি ঝুলিয়ে দেন।

হযরত 'উমাইর (রা) তখন ষোল বছরের এক কিশোর। 'ভালোমত অস্ত্র-শস্ত্রও ধরতে জানেন না। তাঁর বড় ভাই তরবারি ধরা শিখিয়ে দিলেন। শাহাদাতের প্রবল আবেগ উৎসাহে তিনি কাফিরদের ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ চরম বীরত্বের সাথে লড়লেন। এ অবস্থায় আমর ইবন আবদে উদ্দের অসির প্রচণ্ড আঘাত তাঁর শাহাদাতের বাসনা পূর্ণ করে দেয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। (হায়াতুস সাহাবা—১/৫৯৯) খন্দকের যুদ্ধে হযরত আলী (রা) ঘাতক 'আমরইবন 'আবদে উদ্দকে হত্যা করেন। (আল ইসাবা—৩/৭০)

আবু সুফইয়ান ইবন হারেস (রা)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু সুফইয়ান ইবন হারেসের মধ্যে যতখানি গভীর ও শক্ত সম্পর্ক ছিল তা খুব কম লোকের সাথেই ছিল। তাঁরা দু'জন একই পরিবারে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা দু'জন পরস্পর চাচাতো ভাই। আবু সুফইয়ানের পিতা হারেস ইবন 'আবদুল মুত্তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) বড় চাচা। তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগে মারা যান। (টীকাঃ সীরাতু ইবন হিশাম- ১/১৬৩) রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু সুফইয়ান পরস্পর দুধ-ভাই! হযরত হালীমা আস-সা'দিয়্যাহ তাঁদের দু'জনকে দুধ পান করান! রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের দু'জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। দু'জনের চেহারার মধ্যেও যথেষ্ট মিল ছিল। ইবনুল মুবারক, ইবরাহীম ইবন মুনজির প্রমুখের মতে আবু সুফইয়ানের নাম মুগীরা এবং কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু সুফইয়ান। (আল-ইসাবা- ৪/৯০, সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৬৪৭)

নানাদিক দিয়ে দু'জনের মধ্যে এত গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সূচনালগ্নেই আবু সুফইয়ান তাঁর ওপর ঈমান আনবেন ও তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেবেন। কিন্তু যা স্বাভাবিক ছিল তা না হয়ে ঘটলো তার বিপরীত। মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করতেই আবু সুফইয়ানের সব বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও অবাধ্যতার রূপ নিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন দাওয়াত দিতে শুরু করেন আবু সুফইয়ান তখন কুরাইশদের একজন নামযাদা অশ্বারোহী বীর এবং একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি তাঁর জিহবা ও তীর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর দাওয়াতের বিরোধিতায় নিয়োজিত করেন। ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতায় তিনি তাঁর সকল শক্তি একীভূত করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে কুরাইশরা যত যুদ্ধের পরিকল্পনা করে আবু সুফইয়ান তাতে ইন্ধন যোগায়। কুরাইশদের হাতে মুসলমানরা যত রকমের কষ্টভোগ করে তাতে তাঁর বিরাট অবদান ছিল। তিনি তাঁর কাব্য শক্তি রাসূলুল্লাহর হিজা বা নিন্দায় নিয়োজিত করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে তিনি একটি অশালীন কবিতাও রচনা করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) কবি হযরত হাস্সান ইবন সাবিত (রা) তাঁর একটি বিখ্যাত কাসীদার একটি লাইনে বলেনঃ "তুমি নিন্দা করেছ মুহাম্মাদের, আমি জবাব দিয়েছি, এর প্রতিদান আল্লাহর কাছে।" মূলতঃ এ লাইনটি আবু সুফইয়ানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। (আল-ইসাবা- ৪/৯০)

হযরত রাসূলে কারীমের সাথে আবু সুফইয়ানের এ শত্রুতা দীর্ঘ বিশ বছর চলে। এ দীর্ঘ সময়ে আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যতরকম ষড়যন্ত্র করা যেতে পারে সবই তিনি করেন। বদর যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ বর্ণনা সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। হযরত আবু রা'ফে বর্ণনা করেন। আমি বদর যুদ্ধের পর মক্কায় যমযম কূপের নিকট বসে তীর বানাচ্ছি, এমন সময় আবু লাহাব এসে আমার পাশে বসলো। সে কোন কারণবশতঃ বদরে অংশগ্রহণ না করে অন্য একজনকে নিজের পরিবর্তে পাঠিয়েছিল। তারপর আবু সুফইয়ান ইবন হারেস ইবন 'আবদুল মুত্তালিব এলো। আবু লাহাব তাকে কাছে বসিয়ে তার কাছে বদরের ঘটনা বিস্তারিত জানতে চায়। আবু সুফইয়ান বলেঃ আল্লাহর কসম, তারা ছিল এমন একটি দল যাদের কাছে আমরা আমাদের কাঁধ সমর্পণ করেছিলাম। তারা তাদের ইচ্ছা মত আমাদের পরিচালিত করে, ইচ্ছামত আমাদের বন্দী করে। আল্লাহর কসম, এত কিছু সত্ত্বেও আমি আমাদের লোকদের তিরস্কার করিনা। কারণ, আমরা

আসমান ও যমীনের মাঝে সাদা-কালো উড়ন্ত অশ্বের ওপর কিছু সাদা ধবধবে আরোহী দেখতে পেয়েছি। আল্লাহর কসম, কোন কিছুই তাদের মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। আবু রাফে সাথে সাথে বলে ওঠেন ; আল্লাহর কসম, তারা ফিরিশতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আবু লাহাব আবু রা'ফের গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়।
(সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৬৪৬-৪৭, হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৩০)

অবশেষে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলামের সাথে আবু সুফইয়ানের শত্রুতার সমাপ্তি ঘটে। ইতিহাসে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবু সুফইয়ান বলেন, ইসলাম যখন সবল হয়ে উঠলো এবং এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, রাসূল (সা) মক্কা জয়ের জন্য এগিয়ে আসছেন, তখন আমি চারদিকে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। আমি আপন মনে বলতে লাগলাম, এখন কোথায় যাব, কার সাথে যাব এবং কোথায় কার সাথে থাকবো?

এসব চিন্তা-ভাবনার পর আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের কাছে গিয়ে বললাম, মক্কা থেকে বের হওয়ার জন্য তৈরী হও। মুহাম্মাদের মক্কায় প্রবেশের সময় ঘনিয়ে এসেছে। মুসলমানরা আমাকে হাতে পেলেই হত্যা করবে।

তারা আমাকে বললো, 'আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন আরব-অনারব সকলেই মুহাম্মাদের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর দ্বীন কবুল করছে। আর আপনি এখনও তার শত্রুতার জেদ ধরে বসে আছেন? অথচ আপনারই সর্বপ্রথম তাঁর সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এভাবে তারা আমাকে মুহাম্মাদের দ্বীনের প্রতি উৎসাহী ও আকৃষ্ট করে তুলতে লাগলো। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তর দুয়ার উন্মুক্ত করে দিলেন।

আমি তক্ষুণি উঠে আমার দাস মাজকূরকে একটি উট ও একটি ঘোড়া প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলাম। আমার পুত্র জাফরকেও আমি সংগে নিলাম। আমরা খুব দ্রুত মক্কা-মদীনার মাঝখানে "আবওয়া"র দিকে চললাম। আমি আগেই জেনেছিলাম মুহাম্মাদ সেখানে পৌঁচেছেন।

আমি 'আবওয়া'র কাছাকাছি পৌঁছে ছদ্মবেশ ধারণ করলাম, যাতে কেউ আমাকে চিনে ফেলে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির হয়ে ইসলামের ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে মেরে না ফেলে। আমি প্রায় এক মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে এগুতে লাগলাম। আর দেখতে লাগলাম মুসলমানদের অগ্রগামী দলগুলি একটির পর একটি মক্কার দিকে চলছে। কেউ আমাকে চিনতে পারে এই ভয় ও আশংকায় আমি তাদের পথ থেকে একটু দূর দিয়ে এগুতে লাগলাম। এই জনস্রোতের মধ্যে হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নজরে পড়লেন। আমি খুব ত্বরিৎ গতিতে তাঁর সামনে হাজির হয়ে আমার মুখাবরণ খুলে ফেললাম। তিনি আমাকে চিনতে পেরেই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি ঘুরে আবার তাঁর সামনে গেলাম। তিনি আবারও মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এভাবে কয়েকবার করলেন।

আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত খুশী হবেন। কিন্তু মুসলমানরা যখন দেখলো রাসূলুল্লাহ (সা) আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন তারাও মুখ কালো করে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আবু বকর আমাকে দেখে অত্যন্ত কঠিনভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি অত্যন্ত অসহায়ভাবে উমার ইবনুল খাত্তাবের দিকে তাকালাম। তিনিও তাঁর সাথী অপেক্ষা অধিক কঠোরতার সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি বরং একজন আনসারীকে আমার বিরুদ্ধে উসকে দিলেন। সেই আনসারী আমাকে লক্ষ্য করে বললোঃ 'ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের কষ্ট দিয়েছিস। রাসূলের সাথে দুশমনির ক্ষেত্রে তুই পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিস। উক্ত আনসারী উচ্চ কণ্ঠে আমাকে ভর্ৎসনা ও গালি-গালাজ করছে, আর মুসলমানরা আমার পাশে ভিড় করে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তা শুনে উপভোগ করছে।

এমন সময় আমি আমার চাচা আব্বাসকে দেখলাম। আমি তাঁর দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে

বললাম, চাচা, আমার আশা ছিল, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার আত্মীয়তা এবং আমার কাওমের মধ্যে আমার মর্যাদার কারণে তিনি আমার ইসলাম গ্রহণে খুশী হবেন। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার ব্যাপারে কথা বলে তাঁকে একটু রাজী করান। তিনি বললেন; তোমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন এ দৃশ্য দেখার পর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তোমার প্রসঙ্গে একটি কথাও বলতে পারবো না। তবে, যদি কখনও সুযোগ আসে বলবো। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহকে যেমন সম্মান করি তেমন ভয়ও করি।

আমি বললাম, চাচা, আমাকে তাহলে কার দায়িত্বে ছেড়ে দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, এইমাত্র তুমি যা শুনলে তাঁর অতিরিক্ত আমি কিছুই করতে পারবো না।

দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় আমার অন্তর ভরে গেল। হঠাৎ আমি আমার চাচাতো ভাই আলী ইবন আবু তালিবকে দেখলাম। বিষয়টি আমি তাঁকে বললাম। তিনিও চাচা আব্বাসের মত জবাব দিলেন, আমি আবার চাচা আব্বাসের কাছে গিয়ে বললাম, চাচা, যদি আপনি আমার প্রতি রাসূলুল্লাহর অন্তর নরম করতে না পারেন, তাহলে এতটুকু অন্ততঃ করুন, যে লোকটি আমাকে নিন্দা করছে ও গালি দিচ্ছে এবং মানুষকে আমার প্রতি ক্ষেপিয়ে তুলছে, তাকে একটু ঠেকান। তিনি বললেন, লোকটি কেমন— একটু বর্ণনা দাওতো। আমি বর্ণনা দিলাম। তিনি বললেন, সে তো নুয়াইমান ইবনুল হারেস আন নাজ্জারী। তিনি নুয়াইমানের কাছে গিয়ে বললেন, শোন নুয়াইমান! আবু সুফইয়ান হচ্ছে রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই এবং আমার ভাতিজা। যদিও আজ রাসূলুল্লাহ তাঁর প্রতি নারাজ, তবে একদিন তিনি রাজী হয়ে যাবেন। সুতরাং তাকে এভাবে লাঞ্ছিত করো না। এভাবে বার বার তাঁকে বুঝালেন। অবশেষে, নুয়াইমান রাজী হয়ে গেলেন এবং বললেন, এই মুহূর্তের পর থেকে আমি আর তাঁকে কটু কথা বলব্যে না।

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা-মদীনার পথে 'জাহফাহ্' নামক স্থানে অবতরণ করলেন। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁবুর দরযায় গিয়ে বসলাম, আর আমার ছেলে জা'ফর আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বের হওয়ার সময় আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি কিন্তু এতেও হতাশ হলাম না। এভাবে তিনি যখন যেখানে অবতরণ করতে লাগলেন আমি আমার ছেলেকে নিয়ে তাঁর তাঁবুর দরযায় গিয়ে বসতে লাগলাম। আর রাসূলুল্লাহও (সা) একই আচরণ করে যেতে লাগলেন। এভাবে কিছুকাল চললো। আমি খুব কষ্ট পেতে লাগলাম। দুনিয়াটা আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়লো।

ইবন ইসহাক বলেনঃ আবু সুফইয়ান হারেস ও আবদুল্লাহ ইবন আবী উমাইয়্যা 'নীকুল উকাব' নামক স্থানে (মক্কা মদীনার পথে) আবার রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আবেদন জানালেন। হযরত উম্মু সালামা তাদের সম্পর্কে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার চাচাতো ভাই ও ফুফাতো ভাই দু'জন এসেছে সাক্ষাত করতে। রাসূল (সা) বললেনঃ তাদের আর কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমার চাচাতো ভাই আমার সম্মান নষ্ট করেছে, আর ফুফাতো ভাই— সে আমাকে মক্কায় যা বলার বলেছে। আবু সুফইয়ানের সাথে তার পুত্র জা'ফরও ছিল। যখন রাসূলুল্লাহর (সা) একথা তার কানে পৌঁছলো, আবু সুফইয়ান বললেনঃ আল্লাহর কসম, হয় তিনি আমাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেবেন, নয়তো আমি আমার এ ছেলের হাত ধরে যমীনের যে দিকে ইচ্ছা চলে যাব এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করবো। একথা যখন রাসূলুল্লাহ শুনলেন, তিনি একটু নরম হলেন এবং তাদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছে ইসলামের ঘোষণা দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪০০-৪০১)

আবু সুফইয়ান বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় প্রবেশ করেন এবং আমি ও তাঁর কাফিলার সাথে মক্কায় প্রবেশ করলাম। তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হলেন, আমি তাঁর সাথে সাথে চললাম। মুহূর্তের জন্যও তাঁর কিছু ছাড়লাম না।

অতঃপর হুনাইন অভিযানের সময় ঘনিয়ে এলো। সমগ্র আরববাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। এবার তারা ইসলাম ও মুসলমানদের একটা কিছু করেই ছাড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলার জন্য বের হলেন। আমিও চললাম। আমি কাফিরদের বিশাল বাহিনী দেখে মনে মনে বললামঃ আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহর প্রতি অতীতের সকল শত্রুতার প্রতিদান আজ আমি দেব ঃ আজ আমি আমার কাজের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলকে (সা) খুশী করবো।

দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো। কাফিরদের তীব্র আক্রমণে মুসলমানরা টিকতে না পেরে ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। আমি তখন দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) ময়দানের মাঝখানে তাঁর 'শাহবা' খচ্চরের উপর পাহাড়ের মত অটল আছেন। তিনি প্রচণ্ড বেগে তরবারি চালিয়ে নিজেকে ও আশে-পাশের সংগীদের রক্ষা করছেন। তখন তাঁকে সিংহের মত সাহসী মনে হচ্ছিল।

এ দৃশ্য দেখে আমি আমার ঘোড়ার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে উন্মুক্ত তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে ছুটলাম। আল্লাহই জানেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে মৃত্যুর আশা করছিলাম। আমার চাচা আব্বাস রাসূলুল্লাহর (সা) খচ্চরের লাগাম ধরে তাঁর এক পাশে, আর আমি অন্য পাশে দাঁড়ালাম। আমি বাঁ হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) বাহন এবং ডান হাতে তরবারি ধরে তীব্র আক্রমণ চালালাম। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) চাচা আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এ কে ? চাচা বললেন ঃ আপনার ভাই, আপনার চাচার ছেলে— আবু সুফইয়ান ইবন হারেস। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার প্রতি তাঁর সকল শত্রুতা আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) পায়ে চুমু খেলাম। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন ঃ আমার ভাই, সামনে এগিয়ে যাও, আক্রমণ কর। রাসূলুল্লাহর (সা) এই কথায় আমার সাহস বেড়ে গেল। আমি তীব্র আক্রমণ চালিয়ে প্রতিপক্ষ বাহিনীকে তাদের স্থান থেকে হটিয়ে দিলাম। আমার সাথে অন্য মুসলিমরাও আক্রমণ চালালো। আমরা তাদের ছত্রভঙ্গ করে প্রায় এক ফারসাখ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম।"

আবু সুফইয়ান ইবন হারেস এই হুনাইনের ময়দান থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তুষ্টি ও সাহচর্য লাভে ধন্য হন। তবে জীবনে আর কখনো রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি চোখ উঁচু করে তাকিয়ে দেখেননি। অতীত আচরণের কথা মনে করে লজ্জা ও অনুশোচনায় রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহস পাননি।

ইসলাম গ্রহণের পর আবু সুফইয়ান তাঁর অতীত জাহিলী জীবনের কাজ ও আচরণ এবং আল্লাহর কিতাব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা চিন্তা করে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে রাত-দিন শুধু কুরআন তিলাওয়াত, কুরআনের বিধি-বিধান ও উপদেশাবলী অনুধাবনে অতিবাহিত করতেন। তিনি দুনিয়ার সকল সুখ সম্পদ হতে দূরে থেকে নিজের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একীভূত করে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়ে পড়েন। একদিন তিনি মসজিদে ঢুকছেন। রাসূল (সা) তাঁকে দেখে হযরত আয়িশাকে ডেকে বলেন ঃ আয়িশা, এ লোকটি কে, তুমি চেন ? আয়িশা বললেন ঃ না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এ হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই আবু সুফইয়ান ইবন হারেস। দেখ, সে সবার আগে মসজিদে ঢোকে, আর সবার পরে মসজিদ থেকে বের হয়। তার জুতোর ফিতে থেকে তাঁর দৃষ্টি কখনও অন্যদিকে যায় না।

হযরত রাসূলে কারীমের ইনতিকালের পর আবু সুফইয়ান সন্তান হারা মায়ের মত ভীষণ কান্নাকাটি করেন। একটি কাসীদায় তাঁর সেই বিয়োগ ব্যথা অতি চমৎকার রূপে ফুটিয়ে তোলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর আবু সুফইয়ান তখনকার স্বীয় অনুভূতি ব্যক্ত ও ক্ষমা প্রার্থনা করে একটি

স্বরচিত কাসীদা রাসূলুল্লাহকে (সা) পাঠকরে শোনান। কাসীদার একটি লাইনে তিনি যখন বলেনঃ "তিনি আমাকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন যাঁকে আমি বিতাড়িত করেছিলাম" তখন রাসূল (সা) তাঁর বুকে থাপ্পড় মেরে বলে ওঠেনঃ 'তুমিই আমাকে বিতাড়িত করেছিলেন।"
(সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪০০—৪০১)

হযরত উমারের খিলাফতকালে আবু সুফইয়ান অনুভব করেন, তাঁর জীবন— সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। তিনি একদিন নিজ হাতে একটি কবর খোঁড়েন। এর তিনদিন পর তিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। মৃত্যুর সাথে তাঁর যেন একটি চুক্তি ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের লোকদের বলেনঃ 'তোমরা আমার জন্য কেঁদোনা। আল্লাহর কসম, ইসলাম গ্রহণের পর আমি কোন পাপ কাজ করিনি।' এতটুকু বলার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খলীফা উমার তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ১৫, মতান্তরে হিঃ ২০।

হিশাম ইবন উরওয়াহ্-পিতা 'উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেন, 'আবু সুফইয়ান জান্নাতের অধিবাসী যুবকদের নেতা।' (আল-ইসাবা—৪/৯০)।

বুরাইদাহ্ ইবনুল হুসাইব (রা)

নাম বুরাইদাহ, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু আবদিল্লাহ। পিতার নাম হুসাইব ইবন আবদিল্লাহ। বনু আসলাম গোত্রের সরদার। রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের সময় বুরাইদাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে 'গামীম' নামক স্থানে পৌঁছলে বুরাইদাহ্ রাসূলুল্লাহর খিদমতে হাজির হন। রাসূল (সা) তাঁর সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে তা কবুল করেন। উল্লেখ্য যে, এই 'গামীম' মক্কা থেকে দুই মনযিল দূরে অবস্থিত। এখানে তাঁর সাথে বনু আসলামের আরও আশি ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সা) সেখানে 'ইশার নামায আদায় করেন এবং বুরাইদাহ ও তাঁর সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহর (সা) পেছনে ইকতিদা করে নামায আদায় করেন। (হায়াতুস সাহাবা- ১/৩) ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজ গোত্রে অবস্থান করতে থাকেন এবং বদর ও উহুদ যুদ্ধের পর মদীনায় আসেন। অবশ্য তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও মদীনায় আসার সময়কাল সম্পর্কে ইতিহাসে ভিন্নমতও লক্ষ্য করা যায়।

হিজরী ষষ্ঠ সনের পূর্বে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন এবং সর্বপ্রথম হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করে 'বাই'য়াতে রিদওয়ানের' সৌভাগ্য অর্জন করেন। হিজরী ৭ম সনে খাইবার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেন ঃ আমরা খাইবার অবরোধ করলাম। প্রথম দিন ঝাণ্ডা নিলেন আবু বকর ; কিন্তু জয় হলো না। দ্বিতীয় দিনও একই অবস্থা। লোকেরা হতাশ হয়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন ঃ আগামী দিন আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব—যে কিনা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অতি প্রিয়। আগামী কালই বিষয়টির ফায়সালা হবে একথা চিন্তা করে লোকেরা খুব খুশী হলো। পরদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায আদায়ের পর ঝাণ্ডা আনার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা ছিল কাতারবন্দী। তিনি আলীকে ডাকলেন এবং তাঁর হাতে ঝাণ্ডাটি তুলে দিলেন। এইদিন আলীর হাতে খাইবার জয় হয়।

হিজরী ৮ম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কা অভিযানে বুরাইদাহ সংগী ছিলেন এবং একটি বাহিনীর পতাকা হাতে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। (হায়াতুস সাহাবা- ১/১৬৭) এ প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি এক ওজুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের যুদ্ধে যোগদানে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন গোত্রের নিকট লোক পাঠান। এ সময় তিনি বুরাইদাকে আসলাম গোত্রের নিকট পাঠান এবং তাঁকে নির্দেশ দেন তিনি যেন মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থান 'ফুরআ' নামক স্থানে উপস্থিত হন। (তারীখে ইবন আসাকির- ১/১১০)

মক্কা বিজয়ের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী ইয়ামনে পাঠান। বুরাইদাহ্ও এ বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন। পরে হযরত 'আলীর নেতৃত্বে অন্য একটি বাহিনী সেখানে পাঠানো হয় এবং গোটা বাহিনীর নেতৃত্ব 'আলীর (রা) হাতে অর্পণ করা হয়। যুদ্ধ শেষে হযরত আলী (রা) গণীমতের মাল থেকে একটি দাসী নিজে গ্রহণ করেন। বুরাইদাহ্ এটা মেনে নিতে পারেননি। মদীনায় ফিরে বিষয়টি তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উত্থাপন করেন। সবকিছু শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বুরাইদাহ, তোমার কি আলীর প্রতি কোন বিদ্বেষ আছে? বুরাইদাহ্ অস্বীকার করেন। তখন হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেন ঃ আলীর প্রতি মনে কোন রকম হিংসা রেখ না। গণীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে সে এরচেয়েও বেশী পায়। (সহীহুল বুখারী—বাবু বা'সু 'আলী ইলাল ইয়ামন)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, বুরাইদাহর বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারকের রং পাল্টে যায়। তিনি বলেন ঃ বুরাইদাহ, মুমিনদের ওপর তাদের নিজ সত্তা অপেক্ষাও কি আমার অধিকার বেশী নয়? বুরাইদাহ জবাব দিলেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল (স) বললেন ঃ আমি যার

মাওলা (মনিব/দাস) আলীও তার মাওলা। বুরাইদাহ্ বলেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র যবান থেকে এ বাণী শোনার পর আলীর প্রতি আমার সকল অভিযোগ দূর হয়ে যায়। আর সেইদিন থেকে তার প্রতি আমার অন্তরে যে গভীর মুহাব্বতের সৃষ্টি হয় তা আর কারও প্রতি কখনো হয়নি। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) জীবনের শেষ অধ্যায়ে উসামাকে সিরিয়ায় একটি অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। এ বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন বুরাইদাহ। উসামা মদীনা থেকে বের হয়ে মদীনার উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করে যাত্রার তোড়জোড় করছেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তিম অবস্থার খবর পেলেন। তিনি যাত্রা স্থগিত করে ছুটে এলেন রাসূলুল্লাহর (সা) শয্যা পাশে। অন্যদের সাথে বুরাইদাহ্ও ঝাণ্ডা হাতে মদীনায় ফিরে এলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরের দরজার সামনে তা গেড়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) তিরোধানের পর হযরত আবুবকর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। বুরাইদাহ্ খলীফার নির্দেশে আবার ঝাণ্ডা তুলে নিয়ে সিরিয়া যান এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে ঝাণ্ডা হাতে আবার মদীনায় ফিরে এলেন এবং উসামার বাড়ীর সামনে ঝাণ্ডাটি গেড়ে দিলেন। উসামার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঝাণ্ডাটি সেখানে ছিল। (হায়াতুস সাহাবা-১/৪২৫-২৬)

হযরত বুরাইদাহ ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যতগুলি যুদ্ধ হয়েছে সবগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। সহীহাইনে তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মোট ১৬টি (ষোল) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা-১/১৪৬, তাবাকাতে ইবন সা'দ—মাগাযী অধ্যায়-১৩৬)

হযরত রাসূলে কারীমের জীবদ্দশায় বুরাইদাহ মদীনার বাসিন্দা ছিলেন। খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফতকালে বসরা শহরের পত্তন হলে তিনি সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

হযরত বুরাইদাহর শিরা-উপশিরায় জিহাদের খুন টগবগ করতো। লোকদের তিনি বলতেনঃ 'জীবনের মজা তো ঘোড়া দাবড়ানোর মধ্যেই'। এই আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কারণে খলীফাদের যুগেও তিনি বিভিন্ন অভিযানে সৈনিক হিসাবে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে খুরাসান অভিযানে অংশ নিয়ে মারভে চলে যান এবং সেখানেই থেকে যান।

হযরত বুরাইদাহ একজন বীর মুজাহিদ হওয়া সত্ত্বেও খলীফাদের যুগে মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়ায় তাঁর তরবারি সবসময় কোষবদ্ধ থাকে। তাঁর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলীফার যুগে যত গৃহযুদ্ধ হয়েছে তার একটিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেননি। এমনকি অত্যধিক সতর্কতার কারণে দু'পক্ষের যাঁরা সেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন তাদের সম্পর্কেও কোন মতামত ব্যক্ত করতেন না। এ প্রসঙ্গে বনী বকর ইবন ওয়ায়িলের এক ব্যক্তি বলেনঃ একবার আমি বুরাইদাহ্ আল-আসলামীর সাথে সিজিস্তানে ছিলাম। একদিন আমি তাঁর কাছে আলী, উসমান, তালহা ও যুবাইর সম্পর্কে তাঁর মতামত জানার জন্য তাঁদের প্রসঙ্গ উঠালাম। বুরাইদাহ্ সংগে সংগে কিবলার দিকে মুখ করে বসে দু'হাত তুলে দু'আ করতে শুরু করেনঃ হে আল্লাহ, তুমি 'উসমানকে ক্ষমা করে দাও। তুমি আলী, তালহা এবং যুবাইরকেও মাফ করে দাও। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর তিনি আমার দিকে ফিরে বলেন, তুমি কি আমার হত্যাকারী হতে চাও? আমি বললামঃ আমি আপনার হত্যাকারী হতে যাব কেন? তবে আপনার কাছে এমনটি চেয়েছি। বুরাইদাহ্ বললেনঃ তাঁরা ছিলেন এমন একদল লোক যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্বেই স্থির হয়ে আছে। তিনি চাইলে তাঁদের ক্ষমা করে দিতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। তাঁদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহর।

(ইবন সা'দ-৪/১৭৬, হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৮৮)

একবার তিনি হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) কাছে যান। মুয়াবিয়া (রা) তখন একজন লোকের সাথে বসে কথা বলছিলেন। বুরাইদাহ্ বললেনঃ 'মুয়াবিয়া, আমাকেও একটু কথা বলার সুযোগ

দেবেন?' মুয়াবিয়া বললেনঃ 'হাঁ, তিনি মনে করেছিলেন বুরাইদাহ্ হয়ত অন্যদের মতই কিছু বলবেন। কিন্তু বুরাইদাহ বললেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিঃ 'আমি আশা করি, আমি কিয়ামতের দিন জগতের সকল গাছ, পাথর ও বালুর সমপরিমাণ মানুষের জন্য সুফারিশ করবো। মুয়াবিয়া, আপনি এ সুফারিশের আশা করেন, আর আলী তার আশা করতে পারে না? (মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৪/৩৪৭, হায়াতুস সাহাবা-৩/৪৯) সম্ভবতঃ প্রথম ব্যক্তি হযরত আলীর সমালোচনা করছিল এবং মুয়াবিয়া (রা) বুরাইদাহ্র মুখ থেকে তাই শোনার আশা করছিলেন। সত্য বলা ছিল তাঁর বিশেষ গুণ। এ ব্যাপারে তিনি বিরাট ব্যক্তিত্বকেও ভয় করতেন না।

সাহাবা সমাজের মধ্যে বুরাইদাহ্র ছিল বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বহু হাদীস স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় ১৬৪। তারমধ্যে একটি মুত্তাফাক আলাইহি, দু'টি বুখারী ও ১১টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলির সবই সরাসরি রাসূলুল্লাহর (সা) যবানীতে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পুত্র আবদুল্লাহ ও সুলাইমান, এবং অন্যদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন খাযায়ী, শা'বী ও মালীহ ইবন উসামা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর সাথে অত্যন্ত সহজ ও সাধারণভাবে মিশতেন। একবার বুরাইদাহ কোথাও যাচ্ছেন, পথে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা। রাসূলুল্লাহ (সা) বুরাইদাহ্র হাতে হাত রেখে হাঁটতে শুরু করেন।

বুরাইদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বসে ছিলাম, এমন সময় কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি আসলো। রাসূল (সা) তাকে ডেকে কাছে বসালেন। লোকটি যখন যাওয়ার জন্য উঠলো, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেনঃ 'বুরাইদাহ, তুমি কি এ লোকটিকে চেন? বললামঃ হাঁ, বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সে কুরাইশদের মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর। তবে সে সর্বাধিক অর্থ-সম্পদের অধিকারী। কথাটি আমি তিনবার বললাম। তারপর আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, তার সম্পর্কে আমার যা জানা আছে তাই আপনাকে জানালাম। তবে আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন। রাসূল (সা) বললেনঃ কিয়ামতের দিন তার এই বৈশিষ্ট আল্লাহর কাছে কোন গুরুত্ববহ হবে না।

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে তিনি একবার যা শুনতেন তা হুবহু পালন করার চেষ্টা করতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বসে ছিলেন। রাসূল (সা) বললেনঃ আমার উম্মাতকে ঢালের ন্যায় চওড়া ও ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট জাতির লোকেরা তিনবার তাড়াবে। এমনকি তাদেরকে তাড়াতে তাড়াতে 'জাযীরাতুল আরবের' মধ্যে ঘিরে ফেলবে। তাদের প্রথম আক্রমণে যারা পালাবে তারা বেঁচে যাবে। দ্বিতীয় আক্রমণে কিছু বাঁচবে, কিছু মারা পড়বে। কিন্তু তৃতীয় আক্রমণে সবাই মারা পড়বে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? বললেনঃ তুর্কী। তিনি আরও বললেনঃ সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! সেই লোকেরা তাদের ঘোড়াসমূহ মুসলমানদের মসজিদের খুঁটির সাথে বাঁধবে।

এই ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণীর পর বুরাইদাহ সর্বদা দুই তিনটি উট, সফরের পাথেয় ও পানি পান করার একটি পাত্র প্রস্তুত রাখতেন। যাতে যখনই এ সময় আসুক, এ আযাব থেকে পালাতে পারেন। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৫/৩৪৭)

হযরত বুরাইদাহ্ ছিলেন আসলাম গোত্রের সরদার। হযরত রাবী'য়া আল-আসলামী ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) এক সহায় সম্বলহীন খাদেম। তিনি বিয়ে করলে, রাসূলুল্লাহ (সা) বুরাইদাহকে নির্দেশ দিলেন তার মোহর আদায়ের ব্যবস্থা করতে। বুরাইদাহ চাঁদা উঠিয়ে সে নির্দেশ পালন করেন।

তিনি ইয়াযীদ ইবন মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে হিজরী ৬৩ সনে পারস্যের মারভে ইনতিকাল করেন। তিনি আবদুল্লাহ ও সুলাইমান নামে দু'ছেলে রেখে যান।

'উকবা ইবন 'আমের আল-জুহানী (রা)

নাম 'উকবা, ডাকনাম আবু 'আমর, পিতা 'আমের। বনু জুহানা গোত্রের লোক। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন মদীনায় আসেন, 'উকবা তখন মদীনা থেকে বহু দূরে ছাগলের রাখালী করছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) আগমন সংবাদ মদীনার অলি-গলি ও তাঁর আশ-পাশের মরু ভূমি ও মরুদ্যানে ছড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহর সাথে 'উকবার প্রথম সাক্ষাৎ কিভাবে ঘটে তা 'উকবার মুখেই শোনা যাক ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় এলেন আমি তখন মদীনার বাইরে আমার ছাগল চরাচ্ছিলাম। খবরটি আমার কাছে পৌঁছার পর আমি সব কিছু ছেড়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য চলে আসি। রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) করাবেন কি? তিনি আমার পরিচয় জানতে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কে? বললাম ঃ 'উকবা ইবন 'আমের আল-জুহানী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ মরুবাসী বেদুঈনদের বাইয়াত অথবা হিজরাতের বাইয়াত-এর কোনটি তোমার অধিক প্রিয়? আমি বললামঃ হিজরাতের বাই'য়াত। অতঃপর তিনি আমাকে সেই বিষয়ের উপর বাইয়াত করালেন যার উপর মুহাজিরদের বাই'য়াত করাতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াতের পর আমি এক রাত তাঁর সাথে কাটিয়ে আবার মরুভূমিতে আমার ছাগলের কাছে ফিরে গেলাম।

আমরা ছিলাম বারো জন মুসলমান। আমরা মদীনা থেকে দূরে ছাগল চরাতাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো ঃ একদিন পরপর আমরা যদি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে হাজির হয়ে দ্বীনের কথা না শিখি এবং তাঁর উপর যা নাযিল হয় তা না জানি তাহলে আমাদের জীবনে কোন কল্যাণ নেই। প্রতিদিন আমাদের মধ্য থেকে একজন পালাক্রমে মদীনায় যাবে এবং তাঁর ছাগল অন্যরা চরাবে। আমি বললাম ঃ তোমরা পালা করে একজন যাও এবং তার ছাগলগুলির জিম্মাদারি আমি নিলাম। কারও কাছে আমার ছাগলগুলি রেখে মদীনায় যেতে আমি ইচ্ছুক ছিলাম না।

আমার সঙ্গীরা পালা করে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে যেতে লাগলো, আর আমি তাদের ছাগলের পাল চরাতে লাগলাম। তারা ফিরে এলে তারা যা কিছু শুনে বা শিখে আসতো আমি তাদের কাছে শুনে তা শিখে নিতাম। এভাবে কিছুদিন চললো। এর মধ্যে আমার মনে এ অনুভূতি জাগলো ঃ 'তোমার সর্বনাশ হোক! ছাগলের জন্য তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত বা সাহচর্য এবং সরাসরি তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী শোনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছো!' এই অনুভূতির পর আমি আমার ছাগল ফেলে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে মসজিদে নববীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশে মদীনার দিকে চললাম।

আমি মদীনায় পৌঁছলাম। মসজিদে নব্বীতে হাজির হয়ে সর্ব প্রথম শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি বলছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে ওজু করবে সে তার সকল গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হবে যেমনটি সে ছিল তার মা তাকে যেদিন জন্ম দিয়েছিল।' কথাটি আমার খুবই ভালো লাগলো। 'উমার ইবনুল খাত্তাব তখন বললেন ঃ তুমি যদি প্রথম কথাটি শুনতে আরও খুশী হতে। আমি তাঁকে কথাটি পুনরায় বলার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরিক না করে কেউ যদি মারা যায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের সবগুলি দরযা খুলে দেন। জান্নাতের আটটি দরযা। সে এর যে কোনটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ

করবে।' এমন সময় রাসূল (সা) আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁর সামনাসামনি বসলাম। তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কয়েকবার এমনটি করলেন। চতুর্থবার আমি আরজ করলাম ঃ হে আল্লাহর নবী, আমার মা-বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমার দিক থেকে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন? এবার তিনি আমার প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন ঃ একজন তোমার সর্বাধিক প্রিয় না বারোজন? (হায়াতুস সাহাবা—৩/২১৪-১৫, সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা—৪/১৪৪)

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'উকবা সর্বপ্রথম উহুদে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়েন। এরপর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি একজন মুজাহিদ হিসেবে সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। দিমাশ্‌ক জয়ের দিনে তিনি তীর নিক্ষেপে অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। দিমাশক বিজয়ের পর সেনাপতি আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ (রা) তাঁকে মদীনায় পাঠান খলীফাকে এ সংবাদ দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তিনি মাত্র আট দিনে— এক জুম'আ থেকে অন্য জুম'আর মধ্যে রাত দিন বিরামহীন চলার পর মদীনায় খলীফার কাছে সংবাদটি পৌঁছান। সিফ্‌ফীন যুদ্ধে তিনি হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। মিসর জয়ের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে এক সময় তথাকার ওয়ালী বা শাসক নিয়োগ করেন। আবু 'আমর আল-কিন্দী বলেনঃ মু'য়াবিয়া তাঁকে মিসরের খারাজ (রাজস্ব) আদায় ও নামাযের ইমামতির দায়িত্ব অর্পন করেন। পরে যখন তাঁকে অপসারণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি 'উকবাকে রোড্‌স্ আক্রমণের নির্দেশ দেন। উকবা যখন 'রোড্‌সের পথে অগ্রসর হচ্ছেন তখনই তিনি নিজের স্থলে মাসলামার নিযুক্তির কথা শুনতে পেলেন। তখন তিনি মন্তব্য করেনঃ 'দূরে পাঠিয়ে তারপর অপসারণ?' এটা হিজরী ৪৭ সনের কথা। বরখাস্তের পর তিনি অভিযান থেকে হাত গুটিয়ে নেন।

হযরত 'উকবার মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ আছে। সঠিক বর্ণনা মতে হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৫৮ সনে মিসরে ইনতিকাল করেন। তাঁকে বর্তমান কায়রোর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 'মুকাত্তাম' পাহাড়ের পাদদেশে দাফন করা হয়। (আল-ইসাবা—৩/৪৮৯, তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ ১/৪৩)

জ্ঞান ও মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত 'উকবা ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ফারায়েজ ও কাব্য ক্ষেত্রে ছিল তাঁর এক বিশেষ স্থান। আল্লামা জাহাবী বলেন, 'তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, আল্লামাহ, আল্লাহর কিতাবের ক্বারী, ফারায়েজ শাস্ত্রের তত্বজ্ঞানী, প্রাঞ্জল ভাষী ও উঁচুদরের এক কবি।' (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ ১/৪৩)।

পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শিক্ষার প্রতিছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। দারুন আবেগ ও আগ্রহের সাথে তিনি কুরআন পাকের তিলাওয়াত শিক্ষা করতেন। কোন কোন সূরা তিনি খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটেই শিখেছেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) পায়ের ওপর পড়ে নিবেদন করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে সূরাহুদ ও সূরা ইউসুফ একটু শিখিয়ে দিন। এ প্রবল আগ্রহই তাঁকে একজন বিখ্যাত ক্বারী বানিয়ে দেয়।

তিনি ছিলেন সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী। সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। গভীর রাতে যখন নিরবতা নেমে আসতো, তিনি হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা কান লাগিয়ে সে তিলাওয়াত শুনতেন। আল্লাহর ভয়ে তাঁদের হৃদয় বিগলিত হয়ে পড়তো, এবং চোখ সজল হয়ে উঠতো। খলীফা হযরত 'উমার (রা) একবার তাঁকে বলেন ঃ

'উকবা, আমাদের কিছু কুরআন শুনাও। 'উকবা তিলাওয়াত শুরু করলেন। সে তিলাওয়াত শুনে 'উমার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেল।

হযরত 'উকবা নিজ হাতে পবিত্র কুরআনের একটি সংকলন তৈরী করেন। হিজরী নবম শতক পর্যন্ত মিসরের 'জামে উকবা ইবন আমের' নামক মসজিদে এ কপিটি সংরক্ষিত ছিল। কপিটির শেষে

লেখা ছিল 'এটি 'উকবা ইবন 'আমের আল জুহানী লিখেছেন।' এটা ছিল পৃথিবীতে প্রাপ্ত কুরআনের প্রাচীনতম কপি। কিন্তু হতভাগা মুসলিম জাতি আরও অনেক কিছুর মত এই মূল্যবান সম্পদটিও হারিয়েছে। (তাহজীবুত তাহজীব-৭/২৪৩, সুওয়ারুম মিস হায়াতিস সাহাবা-৪/১৪৮-৪৮, মুহাজিরীন—২/২৩৬)।

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি একেবারে পিছিয়ে নন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা পঞ্চান্ন। তার মধ্যে সাতটি মুত্তাফাক আলাইহি এবং একটি বুখারী ও সাতটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বহু বড় বড় সাহাবী দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে তাঁর কাছে হাদীস শুনার জন্য আসতেন। হযরত আবু আইউব কেবল একটিমাত্র হাদীস শুনার জন্য মদীনা থেকে মিসরে যান এবং হাদীসটি শুনেই আবার মদীনার দিকে যাত্রা করেন। হিবরুল উম্মাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসও (রা) তাঁর নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন। তাছাড়া বহু বিখ্যাত তাবেয়ী তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। ইবন 'আসাকির ইবরাহীম ইবন 'আবদির রহমান ইবন 'আউফ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম, মৃত্যুর পূর্বে উমার ইবনুল খাত্তাব লোক পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী—আবদুল্লাহ ইবন হুজাফা, আবুদ দারদা, আবু যার ও উকবা ইবন আমেরকে বিভিন্ন স্থান থেকে ডেকে এনে বলেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ থেকে এত যে হাদীস বর্ণনা কর—এগুলি কী? তাঁরা বললেন ঃ আপনি কি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেন? তিনি বললেন ঃ না। তবে তোমরা আমার কাছে থাকবে। যতদিন আমি জীবিত আছি আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। 'উমার যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁকে ছেড়ে তাঁরা দূরে কোথাও যাননি। (হায়াতুস সাহাবা—৩/২৪০-৪১)

ফিকাহ শাস্ত্রেও হযরত 'উকবার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। দ্বীনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত জ্ঞান যথা ঃ খিতাবাহ (বক্তৃতা-ভাষণ), কবিতা ইত্যাদিতে তাঁর ছিল বিরাট দখল।

'উকবা (রা) যদিও একজন উঁচু দরের সাহাবী ছিলেন, তথাপি দ্বীনী দায়িত্ব পালনে ভীষণ ভয় পেতেন। তিনি এক সময় মিসরে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন, তবে পরে ইমামতি এড়িয়ে চলতেন। আবু 'আলী হামাদানী বলেন ঃ একবার এক সফরে লোকেরা তাঁকে বলে, যেহেতু আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, আপনি নামায পড়াবেন। বললেন ঃ না।আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তি ইমামতি করে এবং সঠিক সময়ে সঠিকভাবে নামায পড়ায়, ইমাম ও মুকতাদী উভয়ের জন্য সওয়াব আছে। আর যদি কোন ত্রুটি হয় তাহলে ইমামকে জবাবদিহি করতে হবে এবং মুকতাদীর কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব নেই।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সেবা করা ছিল তাঁর একমাত্র হবি। সফরে, তিনি প্রায়ই রাসূলুল্লাহর (সা) খচ্চর 'আশ্-শুহবা'-র লাগাম ধরে টেনে নেওয়ার দায়িত্ব পালন করতেন। এই সেবা ও সাহচর্যকালে তিনি দ্বীনী-জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ একবার আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) বাহন টেনে নিয়ে চলছি এমন সময় তিনি বললেন ঃ 'উকবা, আমি কি তোমাকে পাঠযোগ্য দু'টি উত্তম সূরার কথা বলবো? আমি আরজ করলাম ঃ বলুন। তিনি বললেন ঃ সূরা দু'টি হলো ঃ কুল আ'উজু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আ'উজু বিরাব্বিন নাস।

তিনি রাসূলকে (সা) এতই সম্মান করতেন যে, তাঁর বাহনের ওপর বসাও বে-আদবী বলে মনে করতেন। একবার তিনি সফরে নির্ধারিত খিদমতের দায়িত্ব পালন করছেন, এমন সময় রাসূল (সা) সওয়ারী পশুটি থামিয়ে বসিয়ে দেন। সওয়ারীর পিঠ থেকে নেমে এসে তিনি বলেন ঃ 'উকবা, তুমি বাহনের পিঠে সওয়ার হও। 'উকবা বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার বাহনে সওয়ার হব? রাসূল (সা) আবারও নির্দেশ দিলেন। 'উকবা একই উত্তর দিলেন। অবশেষে বারবার পীড়াপীড়ির পর আদেশ পালনার্থে 'উকবা বাহনের পিঠে উঠে বসেন, আর রাসূল (সা) পশুর লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই তাঁকে নিজের বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিয়ে চলতেন। এ কারণে তাঁকে 'রাদীফু রাসূলিল্লাহ'—(রাসূলিল্লাহর বাহনের পেছনে আরোহণকারী বলে ডাকা হতো।

মানুষের দোষ গোপন করা ছিল হযরত 'উকবার বিশেষ গুণ। কারও কোন দোষ প্রচার করাকে তিনি খুবই নিন্দনীয় মনে করতেন। একবার তাঁর সেক্রেটারী এসে বললো, আমাদের প্রতিবেশী

লোকগুলি মদ পান করছে। তিনি বললেনঃ করতে দাও, কাউকে বলোনা। সেক্রেটারী বললো, আমি পুলিশকে খবর দিই। তিনি বললেনঃ খুবই পরিতাপের বিষয়! এড়িয়ে যাও। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারও কোন দোষ গোপন করলো সে যেন একটি মৃতকে জীবিত করলো। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪২৩)

সামরিক বিদ্যা বিশেষতঃ তীরান্দাযীর প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। এ বিদ্যা অর্জনের জন্য তিনি অন্যদেরকেও উৎসাহিত করতেন। একবার খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে ডেকে তিনি বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, আল্লাহ একটি তীরের বিনিময়ে তিনজনকে জান্নাত দান করবেন—তীরটির প্রস্তুতকারী, আল্লাহর রাস্তায় তীরটি বহনকারী ও তীরটির নিক্ষেপকারী। তিনি একথাও বলেছেনঃ সকল প্রকার খেলা-ধুলার মধ্যে মাত্র তিনটি খেলা জায়েয—তীরান্দাযী, অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণ এবং নিজ স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশা। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ বিদ্যা অর্জন করে ভুলে গেছে সে মূলতঃ একটি বিরাট সম্পদ হারিয়েছে।' (মুসনাদু ইমাম আহমাদ-৪/১৪৮)

তিনি যুদ্ধের বহু অস্ত্র-শস্ত্র জমা করেন। মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির খোঁজ নিয়েদেখা গেল তাঁর ঘরে সত্তরের চেয়ে কিছু বেশী ধনুক রয়েছে। আর সেই ধনুকগুলির সাথে আছে বেশ কিছু তীর ও ফলা। সবগুলিই তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে যান। (সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা-৪/১৫০-৫১)

হযরত উকবা (রা) ছিলেন সচ্ছল ব্যক্তি। তাঁর চাকর-বাকরও ছিল। তাসত্বেও নিজের সব কাজ নিজ হাতে করতেন।

হযরত 'উকবা (রা) মিসরে অন্তিম রোগ শয্যায়। এ অবস্থায় সন্তানদের ডেকে এই উপদেশটি দান করেনঃ 'আমার সন্তানেরা! আমি তোমাদের তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করছি, ভালো করে স্মরণ রেখ। (১) নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে রাসূলুল্লাহর হাদীস গ্রহণ করো না। (২) 'আবা (সামনে খোলা ঢিলে-ঢালা মোটা জুব্বা) পরলেও কখনও ঋণগ্রস্ত হয়ো না। (৩) তোমরা কবিতা লিখবে না। কারণ তাতে তোমাদের অন্তর কুরআন ছেড়ে সেই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।' (হায়াতুস সাহাবা-৩/২০১)

মোট কথা ছাগলের রাখাল হযরত 'উকবার মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) স্বল্পকালীন সাহচর্যে তার সেই প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটে। উত্তরকালে তিনি সাহাবাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম, শ্রেষ্ঠ কারী, শ্রেষ্ঠ বিজয়ী সেনাপতি ও শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত হন। যখন তিনি ছাগলের রাখালী ছেড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন তখন তিনি ঘুনাক্ষরেও একথা জানতেন না যে, একদিন তিনি দিমাশ্‌ক বিজয়ী বাহিনীর অগ্রসৈনিক হবেন এবং দিমাশকের 'বাবে তূমা'য় তাঁর একটি বাড়ী হবে। যেদিন তিনি মদীনায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেন সেদিন তাঁর মনে একবারও একথা উদয় হয়নি যে, একদিন তিনি মিসর বিজয়ের অন্যতম নেতা, তথাকার ওয়ালী হবেন এবং কায়রোর 'মুকাত্তাম' পাহাড়ে তাঁর একটি বাড়ী হবে। ইসলাম তাঁর সুপ্ত প্রতিভার এমন বিকাশ ঘটায় যে তিনি ছাগলের রাখালী থেকে এত কিছু হন।

আবু বারযাহ্ আল-আসলামী (রা)

আবু বারযাহ্‌র আসল নামের ব্যাপারে রিজাল শাস্ত্রবিদদের যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মতানুসারে নাদলা ইবন 'উবাইদ তাঁর নাম এবং আবু বারযাহ্ কুনিয়াত বা উপনাম। (আল-ইসাবা- ৪/১৯)

মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা পর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার পর কাফিরদের সাথে যত সংঘর্ষ হয়েছে তার সবগুলিতে তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সঃ) সাথে ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলে কারীম (সা) তাঁর চরম শত্রুকেও ক্ষমা করে দেন। তবে শত্রুতা ও বিদ্রোহের সীমা লংঘনকারী কতিপয় দুষ্কৃতিকারীকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল। আবদুর রহমান ইবন খাতাল ছিল এমনি একজন। এ ব্যক্তি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার এক মুসলমান দাসকে হত্যা করে ইসলামী দণ্ড 'কিসাস' থেকে বাঁচার জন্য 'মুরতাদ' (ইসলাম ত্যাগ) হয়ে মক্কায় পালিয়ে যায়। তার ছিল দু'টি দাসী। তারা মক্কার বাজারে মুহাম্মাদের (সা) নিন্দাসূচক গীত গেয়ে বেড়াতো। মক্কা বিজয়ের দিন কোন উপায় না দেখে নরাধম ইবন খাতাল নিরাপত্তার আশায় কা'বার গিলাফ আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকলো। সাহাবীরা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, ইবন খাতাল কা'বার গিলাফের আশ্রয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ লাভের সাথে সাথে আবু বারযাহ ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে সা'ঈদ ইবন হুয়াইরিস আল-মাখযূমী ও আবু বারযাহ্ আল-আসলামী একযোগে আবদুর রহমান ইবন খাতালকে হত্যা করেন।
(আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ; সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৪১০)

হযরত রাসূলে পাকের (সা) জীবদ্দশা পর্যন্ত আবু বারযাহ্ মদীনায় বসবাসরত ছিলেন। হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি বসরার বাসিন্দা হন। সিফ্‌ফীন যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) পক্ষে এবং নাহরাওয়ানে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। খুরাসান অভিযানে তিনি ছিলেন একজন মুজাহিদ।

হযরত আবু বারযাহ্‌র (রা) মৃত্যুর সময়কাল সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কারও মতে হিঃ ৬০, আবার কারও মতে হিঃ ৬৫ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। দ্বিতীয় মতটি অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, মারওয়ান ও আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) সংঘর্ষের সময় পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এবং তিনি বলতেন, তারা সব দুনিয়ার জন্য ঝগড়া-বিবাদ করছে। (হায়াতুস সাহাবা- ২/৪০৭) তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র ছেলে মুগীরাকে রেখে যান।

হযরত আবু বারযাহ (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দীর্ঘ সাহচর্যের সুযোগ পেয়েছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য সংখ্যা তিনি স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬৪। তারমধ্যে ২৭টি মুত্তাফাক আলাইহি। দু'টি বুখারী ও চারটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু বারযাহ্‌র (রা) স্বভাবে যুহ্‌দের একটা ভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি দামী কাপড় পরতেন না এবং ঘোড়ায়ও সওয়ার হতেন না। গেরুয়া রঙ্গের দু'খানি কাপড় দিয়ে সতর ঢেকে চলতেন। তাঁরই এক সমসাময়িক সাহাবী 'আয়িজ ইবন উমার। তিনি যেমন মূল্যবান কাপড় পরতেন তেমনি ঘোড়ায়ও সওয়ার হতেন। এক ব্যক্তি তাঁদের দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হযরত আয়িজের

নিকট এসে বললোঃ আপনি আবু বারযাহ্কে দেখুন, তিনি পোশাক-আশাকে আপনার বিরোধিতা করেন। আপনি দামী 'খুয' কাপড় পরেন, ঘোড়ায় চড়েন। আর তিনি এ দু'টি জিনিসই পরিহার করেন।' কিন্তু সাহাবীদের ভ্রাতৃত্ব ছিল বাহ্যিক পোশাক-আশাক ও চাল-চলন থেকেও অতি গভীর ও দৃঢ়। হযরত আয়িজ লোকটিকে জবাব দেনঃ আল্লাহ্ আবু বারযাহ্র ওপর রহম করুন! আজ আমাদের মধ্যে তার সমপর্যায়ের আর কে আছে? লোকটি হতাশ হয়ে সেখান থেকে আবু বারযাহ্র নিকট গেল এবং তাঁকে বললোঃ 'আপনি আয়িজকে একটু দেখুন। আপনার চাল-চলন তাঁর পসন্দ নয়। তিনি ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে ঘুরে বেড়ান, মূল্যবান 'খুয' কাপড় তাঁর দেহে শোভা পায়।' কিন্তু লোকটি এখানেও একই জবাব পেল। আবু বারযাহ্ লোকটিকে বললেনঃ 'আল্লাহ্ আয়িজের ওপর রহম করুন। আমাদের মধ্যে তাঁর সম-মর্যাদার আর কে আছে?'

একবার এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) একটা শক্ত কথা বলে ফেলে। সংগে সংগে আবু বারযাহ বলে উঠলেনঃ 'আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব?' আবু বকর তাঁকে ধমক দিয়ে বললেনঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) পর আর কারও ক্ষেত্রে এতটুকু অপরাধের এ শাস্তি বৈধ নয়।' (কানযুল 'উম্মাল- ২/১৬১, হায়াতুস সাহাবা- ২/৬৩৮)

গরীব-দুঃখীর সেবা করা ছিল আবু বারযাহ্র বিশেষ বৈশিষ্ট। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি ফকীর মিসকীনকে আহার করাতেন। হাসান ইবন হাকীম তাঁর মার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু বারযাহ্ বিধবা, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সকালে এবং সন্ধ্যায় 'সারীদ' (আরবদের এক প্রকার প্রিয় খাদ্য) আহার করাতেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/১৯৪-৯৫)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সম্পর্কে কোন প্রকার বিদ্রূপ বা হাসি-কৌতুক তিনি বরদাশ্ত করতে পারতেন না। উবাইদুল্লাহ্ ইবন যিয়াদের 'হাউজে কাওসার' সম্পর্কে কিছু জানার বাসনা হলো। তিনি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন 'হাউজে কাওসার' সম্পর্কে কে বলতে পারবে? লোকেরা আবু বারযাহর (রা) কথা বললো। উবাইদুল্লাহ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি গেলেন। তাঁকে আসতে দেখে উবাইদুল্লাহ বিদ্রূপের সুরে বললোঃ 'এই সেই তোমাদের মুহাম্মাদী?' অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে আবু বারযাহ্ জবাব দিলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া! আমি এমন এক যুগে বেঁচে আছি যখন সাহাবিয়্যাতের (সাহচর্যের) মর্যাদাকে হেয় চোখে দেখা হয়।' একথা বলতে বলতে অত্যন্ত রুষ্টভাবে তিনি আসন গ্রহণ করেন। উবাইদুল্লাহ প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন, জবাবে আবু বারযাহ্ বললেনঃ 'যে ব্যক্তি হাউজে কাওসার অস্বীকার করবে সে তার ধারে-কাছেও যেতে পারবে না এবং আল্লাহ তাকে তার থেকে পানও করাবেন না।' একথা বলে তিনি উঠে চলে আসেন।

হযরত আবু বারযাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক যুদ্ধে (মতান্তরে খাইবার) আমরা মুশরিক বাহিনীকে হামলা করে তাদের রুটি তৈরীর সাজ-সরঞ্জাম থেকে দূরে তাড়িয়ে দিই। তারপর আমরা সেগুলি দখল করে খেতে শুরু করি। জাহিলী যুগে আমরা শুনতাম, যারা সাদা রুটি খায় তারা মোটা হয়ে যায়। তাদের পরিত্যক্ত রুটি খাওয়ার পর আমাদের কেউ কেউ তার নিজের কাঁধের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে যে সে মোটা হয়েছে কিনা। (হায়াতুস সাহাবা- ১/৩২৩) এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় সাহাবায়ে কিরাম সাদা মিহি আটা সাধারণত ব্যবহার করতেন না।

ফাদল ইবন 'আব্বাস (রা)

নাম ফাদল, ডাকনাম আবু মুহাম্মাদ। পিতা প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) এবং মাতা লুবাবা বিনতুল হারেস আল হিলালিয়্যাহ। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই। পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। একারণে পিতা আব্বাসকে ডাকা হতো আবুল ফাদল বা ফাদলের পিতা বলে এবং মাতা লুবাবাকে বলা হতো উম্মুল ফাদল বা ফাদলের মা।

বদর যুদ্ধের পূর্বেই পরিবারের অন্যদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন ; কিন্তু মক্কার কাফিরদের ভয়ে প্রকাশ করেননি। মক্কা বিজয়ের অল্প কিছু দিন পূর্বে পিতা হযরত আব্বাস ও ছোট ভাই আবদুল্লাহর (রা) সাথে মদীনায় হিজরাত করেন। হিজরাতের সময় তাঁর বয়স ছিল তের বছর এবং আবদুল্লাহর বয়স আট বছর। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭৩) তিনি মদীনায় হিজরাতের পর সর্ব প্রথম মক্কা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর হুনাইন অভিযানেও যোগদান করেন। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী যখন পরাজয়ের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়ে পালাতে শুরু করে তখনও তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে ময়দানে অটল থাকেন।

বিদায় হজ্জে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একই বাহনে বসা ছিলেন। এ কারণে সেই দিন থেকে তিনি 'রাদিফুর রাসূল' উপাধিতে ভূষিত হন। এই সময় খাইসাম গোত্রের এক যুবক ও এক সুন্দর যুবতী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হজ্জের বিভিন্ন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে আসে। হজ্জের সময় মহিলাদের মুখে নেকাব দেওয়া যেহেতু জায়েয নয়, এ কারণে মহিলাটির মুখ খোলা ছিল। ফাদল ছিলেন সুদর্শন নওজোয়ান। মহিলাটি তার দিকে আড় চোখে তাকাতে থাকে এবং ফাদলও তাকে দেখতে থাকেন, হযরত রাসূলে কারীম (সা) কয়েকবার ফাদলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আজ যে ব্যক্তি স্বীয় চোখ, কান ও জিহ্বা সংযত রাখতে পারবে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (ইবন সা'দ-৪/৩৭, আল-ইসাবা-৩/২০৮ এবং বুখারী শরীফে বাবু হজ্জিল মারয়াতে অধ্যায়ে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।) মিনায় পাথর নিক্ষেপের সময় চাদর উঁচু করে ধরে তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) ছায়াদান করেন। মদীনায় রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে দেন এবং নিজেই তাঁর দায়ন মোহর পরিশোধ করেন।

হযরত ফাদল (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পার্থিব জীবনের সর্বশেষ খিদমাতের সুযোগ লাভে ধন্য হন। অন্তিম রোগশয্যায় রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বশেষ ভাষণ দান করেন। এ ভাষণ দেওয়ার জন্য যে দু'জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে তিনি ঘর থেকে বের হন তাঁদের একজন ফাদল। আর রাসূল (সা) যে ভাষণ দেবেন—একথাটিও ফাদল জনগণের মধ্যে ঘোষণা করেন। (আল-ইসাবা-৩/২০৮) রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর যে ক'জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি পবিত্র দেহ গোসল দেওয়ার সুযোগ লাভ করেন ফাদল (রা) তাঁদের অন্যতম। হযরত আলী (রা) গোসল করান, ফাদল পানি ঢেলে দেন, রাসূলুল্লাহর (সা) কাপড় ধরে রাখেন এবং আউস ইবন খাওলী নামক এক আনসারী পানি এগিয়ে দেন। (আল-ইসতীয়াব, হায়াতুস সাহাবা-২/৩৪১)।

ওয়াকিদী বলেনঃ হযরত ফাদল হযরত উমারের খিলাফতকালে আমওয়াসের প্লেগের মহামারিতে মারা যান। আবার অনেকে বলেছেন, হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে আজনাদাইন অথবা ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হিজরী ১৫ সনে

ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ইমাম বুখারী আজনাদাইনের মতটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। (আল-ইসাবা-৩/২০৯)।

হযরত ফাদল (রা) হতে ২৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবন আব্বাস ও আবু হুরাইরার মত বিশিষ্ট সাহাবীরাও তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া কুরাইব, কুসাম ইবন আব্বাস, আব্বাস ইবন উবাইদিল্লাহ, রাবীয়া ইবন হারেস, উমাইর, আবু সাঈদ, সুলাইমান ইবন ইয়াসার, শাবী, আতা ইবন আবী রিবাহ প্রমুখ তাবেয়ী' তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। (আল-ইসাবা-৩/২০৯)।

তুলাইব ইবন 'উমাইর (রা)

নাম তুলাইব, ডাকনাম আবূ 'আদী। পিতা 'উমাইর ইবন ওয়াহাব, মাতা রাসূলুল্লাহর (মা) ফুফু আরওয়া বিনতু 'আবদুল মুত্তালিব। কুরাইশ বংশের বনী-'আবদী শাখার সন্তান। (আনসাবুল আশরাফ-১/৮৮)

হযরত তুলাইবের জন্ম ও ইসলাম পূর্ব জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইসলামের সূচনা পর্বেই যে তিনি এ কাফিলায় শরিক হন সে কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইতিহাসে বর্ণিত কিছু কিছু ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, তাঁর মামাতো ভাই মুহাম্মাদ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন ভক্তি ও ভালোবাসা। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি কুরাইশদের বৈরী আচরণে তুলাইব ছিলেন সব সময় ক্রুদ্ধ। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি কুরাইশদের রূঢ় আচরণের কঠিন জবাবও তিনি মাঝে মাঝে দিতেন। আর এসব কাজে তাঁর নেক্‌কার মা তাঁকে সবসময় সমর্থন জানাতেন।

আল-হারেস আত-তাঈমী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার দারুল আরকাম বা আরকামের গৃহে অবস্থান কালে 'তুলাইব' ইবন উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর সেখান থেকে বের হয়ে সোজা মা আরওয়া বিনতু 'আবদুল মুত্তালিবের নিকট উপস্থিত হন। মাকে বলেনঃ 'মা, আমি মুহাম্মাদের অনুসরণ করেছি, আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পন করেছি।' মা বললেনঃ 'তোমার সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন তোমার মামার ছেলে। পুরুষদের যে শক্তি ও ক্ষমতা আছে আমার তা থাকলে আমি অবশ্যই মানুষের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতাম।' তুলাইব বললেনঃ 'মা, ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর অনুসারী হতে আপনার সামনে কিসের বাধা? আপনার ভাই হামযা, তিনি তো ইসলাম গ্রহণ করেছেন।' মা বললেনঃ 'আমার অন্য বোনেরা কি করে, আমি সেই প্রতীক্ষায় আছি। আমি তাদের সাথেই থাকবো।'

তুলাইব বললেন ঃ 'যতক্ষণ আপনি তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর সাক্ষ্য না দেবেন, আমি ততক্ষণ আল্লাহর কাছে আপনার জন্য দু'আ করতে থাকবো।' সন্তানের এই অনুরোধ ভাগ্যবতী মা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি ঘোষণা করলেনঃ 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ— আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত বান্দা'। এই দিন থেকে তিনি তাঁর যবান দ্বারা রাসূলুল্লাহকে (সা) সব রকম সহায়তা করতে শুরু করেন এবং পুত্র তুলাইবকে সর্ব অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। (তাবাকাত—৩/১২৩, আল-ইসাবা—২/২৩৩-২৩৪)।

মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্বে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁরা নানাভাবে কুরাইশদের হাতে নির্যাতিত হন। একদিন তুলাইব ও হাতেব ইবন 'আমর মক্কার 'আজইয়াদে আসগার' এলাকায় নামায আদায় করছেন। মক্কার তৎকালীন চরম দুই সন্ত্রাসী ইবনুল আসদা ও ইবনুল গায়তালা তা দেখে ফেলে। তারা তুলাইব ও হাতেবের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে আক্রমণ চালায়। হাতেব ও তুলাইব প্রায় এক ঘন্টা যাবত সে আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং প্রাণ বাঁচিয়ে কোন রকমে পালিয়ে যান। (আনসাবুল আশরাফ—১/১১৭)

মক্কার 'উকবা ইবন আবী মু'য়াইত ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) চরম দুশমন। তাছাড়া সে ছিল অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির। নানাভাবে সে রাসূলুল্লাহকে (সা) কষ্ট দিত। একদিন সে এক ঝুড়ি ময়লা নিয়ে এসে

রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীর দরযায় ফেলতে শুরু করে। ব্যাপারটি তুলাইবের নজরে পড়ে। তিনি ছুটে গিয়ে 'উকবার হাত থেকে ঝুড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর দু'টি কান মলে দেন। 'উকবা খুব ক্ষেপে গিয়ে তুলাইবের পিছু পিছু তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ জানায় এই বলেঃ 'তুমি কি দেখনা, তোমার ছেলে মুহাম্মাদের পক্ষ নিয়েছে?' আবদুল মুত্তালিবের ভাগ্যবতী মেয়ে জবাব দিলেনঃ আচ্ছা তুমিই বল, তাঁর পক্ষ নেওয়ার জন্য তুলাইবের চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি আর কে আছে? মুহাম্মদ তো তার মামাতো ভাই। আমাদের অর্থ কড়ি, জীবন সবই তো মুহাম্মাদের জন্য নিবেদিত।" তারপর তিনি একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। যার অর্থঃ "তুলাইব তাঁর মামাতো ভাইকে সাহায্য করেছে, সে তাঁর রক্ত ও অর্থের ব্যাপারে সমবেদনা জানিয়েছে।"

উল্লেখ্য যে, এই 'উকবা বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। (আনসাবুল আশরাফ ১/১৪৭)

হযরত তুলাইব (রা) ইসলাম গ্রহণের পর বেশ কিছু দিন কুরাইশদের সকল অত্যাচার নিপীড়ন প্রতিরোধ করে মক্কায় অবস্থান করেন। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা যখন চরম রূপ ধারণ করে এবং মক্কায় টিকে থাকা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন হাবশাগামী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর মক্কাবাসীদের সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এমন একটি গুজব শুনে যাঁরা হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসেন তাদের মধ্যে তুলাইবও ছিলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম ১/৩২৪, ৩৬৬)

হাবশা থেকে ফিরে কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করেন। তারপর আবার মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন সালামা আল-'আজলানীর অতিথি হন। রাসূলুল্লাহ (সা) মুনজির ইবন 'আমর আস-সা'য়েদীর সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ইসলামী ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

মুহাম্মাদ ইবন 'উমারের বর্ণনা মতে হযরত তুলাইব বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। তাবারী বলেনঃ বদর যুদ্ধে তাঁর যোগদানের ব্যাপারটি প্রমানিত সত্য। অবশ্য মূসা ইবন 'উকবা, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ও আবূ মা'শার বদর যুদ্ধে যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের নামের তালিকায় তুলাইবের নামটি উল্লেখ করেননি। (তাবাকাত—৩/১২৩)

বদর যুদ্ধের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কর্মকাণ্ডের আর কোন তথ্য সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা যায়, তাঁর মত এমন তেজোদ্দীপ্ত পুরুষ কখনও চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। আমরণ সকল অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

হিজরী ১৩ সনে জামাদিউল উলা মাসে আজনাদাইন যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তবে মুস'য়াব ইবন 'আবদিল্লাহ বলেনঃ তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে শহীদ হন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি কোন সন্তানাদি রেখে যাননি। (তাবাকাত-৩/১২৪, আল-ইসতী'য়াব)

সাওবান ইবন নাজদাহ্ (রা)

নাম সাওবান, পিতার নাম নাজদাহ্, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু 'আবদিল্লাহ। ইয়ামনের প্রসিদ্ধ হিময়ার গোত্রের সন্তান। (আসাহ্হুস্ সিয়ার—৫৯৯) কোন কারণে তিনি দাসে পরিণত হন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে খরীদ করেন এবং পরে আযাদ করে দেন। আযাদ করার সময় তিনি সাওবানকে বলেন, ইচ্ছা করলে তুমি স্বগোত্রীয় লোকদের কাছে চলে যেতে পার অথবা আমার সাথে থাকতে পার। আমার সাথে থাকলে আমার পরিবারের সদস্য বলে গণ্য হবে। সাওবান নিজ গোত্রে ফিরে যাওয়ার চেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে থাকাকেই শ্রেয় মনে করেন।

হযরত রাসূলে কারীমের ওফাতের পর অল্প কিছু দিন তিনি মদীনায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়া মদীনা তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তিনি মদীনা ছেড়ে শামের 'রামলা' নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। মিসর অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং 'রামলা' ছেড়ে 'হিমসে' বসতি স্থাপন করেন। এই হিমসে হিজরী ৫৪ মনে তিনি ইনতিকাল করেন।

হযরত সাওবান ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ খাদেম। ভেতর বাহির সর্ব অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গ লাভের সুযোগ পান। এ কারণে স্বাভাবিকভাবে 'উলুমে নববী' বা নবীর জ্ঞানসমূহে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ১২৭টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি হাদীস হিফ্জ বা মুখস্থ্ করার সাথে সাথে প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বও পালন করতেন। আল্লামাহ্ ইবন 'আবদিল বার বলেছেন, সাওবান সেই সব লোকদের একজন যাঁরা হাদীস মুখস্থ্ করণের সাথে সাথে তার প্রচারের কাজও করেছেন।

হযরত সাওবানের প্রচুর হাদীস মুখস্থ থাকায় অসংখ্য লোক তা শোনার জন্য তাঁর নিকট আসতো। একবার লোকেরা তাঁর নিকট হাদীস শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বলেনঃ কোন মুসলমান আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সিজদাহ্ করলে আল্লাহ তাঁর একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং তাঁর গোনাহসমূহও মাফ করে দেন। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল—৫/২৭৬)

হযরত সাওবানের যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ অন্যদের নিকট থেকে শ্রুত তাঁদের হাদীসসমূহের সত্যাসত্য তাঁর নিকট থেকে যাচাই করতেন। সা'দান ইবন তালহার মত উঁচু স্তরের একজন হাদীস বিশারদ হযরত আবূদ দারদার (রা) নিকট থেকে একটি হাদীস শোনেন এবং তাঁর সত্যাসত্য যাচাই করেন হযরত সাওবানের নিকট থেকে। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর তিনি মদীনার অন্যতম মুজতাহিদ সাহাবী হিসাবে পরিগলিত হন। ('আলামুল মুওয়াক্কিরীন ১/১৫)

হযরত সাওবানের ছাত্রদের গণ্ডিও সুপ্রশস্ত। সা'দান ইবন তালহা, রাশেদ ইবন সা'দ, জুবাইর ইবন নুদাইর, আব্দুর রহমান ইবন গানাম, আবু ইদরীস প্রমুখ ছিলেন তাঁর উল্লেখ যোগ্য ছাত্র।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি তাঁর এত বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল যে, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায় এমন কোন একটি শব্দও তিনি কোন অমুসলিমের মুখ থেকে শুনে সহ্য করতে পারতেন না। একবার এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললোঃ আস্সালামু 'আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ। সাথে সাথে সাওবান ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি সেই ইয়াহুদীকে এমন জোরে এক ধাক্কা দিলেন যে বেচারা পড়তে পড়তে কোন রকম টাল সামলাল। লোকটি একটু স্থির হয়ে তাঁর এত রাগের কারণ কি তা জানতে চাইলো। সাওবান বললেনঃ তুমি কেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' না বলে 'ইয়া মুহাম্মাদ' বললে? লোকটি বললো, এতে এমন কি অপরাধ

হয়েছে? আমি তাঁর খান্দানী নামই উচ্চারণ করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, হাঁ, আমার খান্দানী নাম মুহাম্মাদ।

নবুওয়াতের সম্মান তো বিরাট ব্যাপার। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর যে গোলামী বা দাসত্বের সম্পর্ক ছিল তাও যদি কেউ উপেক্ষা বা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতো, তিনি তাকে সর্তক করে দিতেন। হিমসে অবস্থান কালে একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হিমসের তৎকালীন ওয়ালী 'আবদুল্লাহ ইবন কারাত ইযদী যখন তাঁকে দেখতে এলেন না, তখন তিনি একটি চিঠিতে লিখলেনঃ যদি মূসা ও 'ঈসার দাস তোমার এখানে থাকতো, তুমি তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ নিতে বা দেখতে যেতে। এই চিঠি পেয়ে ওয়ালী এমন ব্যস্ততার সাথে বাড়ী থেকে বের হন যে, লোকেরা মনে করে নিশ্চয় বিরাট কোন কিছু ঘটেছে। এ অবস্থায় তিনি হযরত সাওবানের বাড়ী পৌঁছেন এবং দীর্ঘক্ষণ তাঁর পাশে বসে থাকেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নির্দেশ পালনের ব্যাপারে তিনি এত বেশী সচেতন ছিলেন যে, একবার যে নির্দেশ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে লাভ করেছেন আজীবন তা পালন করেছেন এবং কোন নির্দেশ অমান্য করার বিন্দুমাত্র আশংকা থাকে এমন কাজ তিনি কখনও করেননি। তাবারানী আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ কে বাই'য়াত করবে? সাওবান বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তো বাই'য়াত করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ কারও কাছে কোন কিছু চাইবে না— এ কথার উপর বাই'য়াত। সাওবান বললেনঃ কিসের জন্য ইয়া রাসূলাল্লাহ! বললেনঃ জান্নাতের জন্য। সাওবান এ কথার উপর বাই'য়াত করলেন। আবু উমামা বলেনঃ আমি তাঁকে মক্কায় মানুষের ভিড়ের মধ্যে সওয়ারী অবস্থায় দেখেছি। এ অবস্থায় তাঁর হাত থেকে চাবুকটি পড়ে যায়। সম্ভবতঃ তা এক ব্যক্তির ঘাড়ের উপর পড়ে এবং সে চাবুকটি ধরে ফেলে। অতঃপর সে তা সাওবানের হাতে তুলে দিতে চায়; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে বাহন থেকে নেমে এসে নিজ হাতে তুলে নেন। (হায়াতুস সাহাবা—১/২৪২)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ মানুষের কাছে সাওয়াল করবে না, এ নিশ্চয়তা যে আমাকে দেবে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। একথা শুনে সাওবান বলে উঠলেনঃ আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এরপর তিনি কারও কাছে কিছু চাইতেন না। (আল-ইসাবা—১/২০৪)

ইউসূফ ইবন 'আবদিল হামীদ বর্ণনা করেছেন। সাওবান আমাকে বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আহল বা পরিবারবর্গের জন্য দুআ করলেন। আমি বললাম, আমিও তো আহলি বাইতের (আপনার পরিবার বর্গের) অন্তর্গত। তৃতীয়বার তিনি বললেনঃ হাঁ, তুমি আমার পরিবারের অন্তর্গত। তবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তুমি কোন বন্ধ দরযায় না দাঁড়াবে অথবা কোন আমীরের কাছে কিছু চাইতে না যাবে। (আল-ইসাবা—১/২০৪)

এই সব নির্দেশের পর তিনি জীবনে আর কখনও কারও নিকট কোন কিছু চাননি বলে ইতিহাসে জানা যায়।

'আমর ইবন 'আবাসা (রা)

তাঁর নাম 'আমর, আবু নাজীহ কুনিয়াত বা ডাকনাম। পিতা 'আবাসা ইবন 'আমের এবং মাতা রামলা বিনতুল ওয়াকী'য়া। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যার আল-গিফারীর (রা) বৈপিত্রীয় ভাই। (আল-ইসাবা-৩/৫)

জীবনের প্রথম থেকেই আমর ছিলেন সৎ প্রকৃতির লোক। জাহিলী যুগে যখন গোটা আরব মূর্তি পূজায় লিপ্ত তখনও তিনি এ কাজকে ঘৃণা এবং মূর্তি পূজারীদের পথভ্রষ্ট বলে মনে করতেন। তিনি নিজেকে ইসলামের চতুর্থ ব্যক্তি অথবা ইসলামের এক-চতুর্থাংশ বলে দাবী করতেন। তাঁর কাছে যখন জানতে চাওয়া হলো, আপনি কিসের ভিত্তিতে এ দাবী করেন? তিনি বললেনঃ জাহিলী যুগে আমি মানুষকে পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করতাম। মূর্তির কোন গুরুত্ব আমার কাছে ছিল না। আমি জানতাম, এগুলি যেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না, তেমনি কোন উপকারও করতে পারে না। কারণ, তারা পাথরের মূর্তির পূজা করতো। এ সময় আমিএকজন আহলি কিতাব বা ঐশী ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট সর্বোত্তম দ্বীন সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেনঃ মক্কায় এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে। তিনি নিজ কাওমের ইলাহ্ বা উপাস্য পরিত্যাগ করে অন্য ইলাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাবেন। তিনিই সর্বোত্তম দ্বীন নিয়ে আসবেন। তুমি তাঁর আবির্ভাবের কথা শুনতে পেলে তাঁকে অনুসরণ করবে।

'আমর বলেন, এমন সময় আমি মক্কা থেকে একটি সংবাদ পেলাম। মক্কায় নতুন কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা—একথা আমি কারও কাছে জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না। অবশেষে পশুর পিঠে সওয়ার হয়ে আমি মক্কায় পৌঁছলাম। সেখানে এক আরোহীকে প্রশ্ন করলে সে বললোঃ এখানে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যে তার কাওম বা স্বজাতীয় ইলাহকে ঘৃণা করে। আমি গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করলাম। কারণ, তখন তাঁর স্বজাতীয় লোকেরা চরমভাবে তাঁর বিরোধিতা করছে। অন্য একটি বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'আমরের এ সাক্ষাৎ হয় 'উকাজ মেলায়। প্রথম সাক্ষাতে তাঁদের কথোপকথন ছিল নিম্নরূপঃ

'আমর প্রশ্ন করেনঃ আপনি কে?

—আমি আল্লাহর নবী।

—আল্লাহ কি আপনাকে পাঠিয়েছেন?

—হাঁ।

—কি কি জিনিস সহকারে পাঠিয়েছেন?

—আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করবে, তার সাথে কোন কিছু শরিক করবে না, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে।

—কেউকি এ দাওয়াত কবুল করেছে?

—হাঁ, একজন আযাদ ও একজন দাস।

'আমর বলেন, সে দু'জন হলেন আবু বকর ও বিলাল। অতঃপর 'আমর আরজ করেন, আমাকেও আল্লাহর উপাসকদের মধ্যে শরিক করে নিন। আমি আপনারই সাথে থাকবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যখন চারদিক থেকে আমার বিরোধিতা চলছে তখন কিভাবে তুমি আমার সাথে থাকবে? এখন তোমার স্বদেশ ভূমিতে তুমি ফিরে যাও। যখন আমি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে শুরু করি তখন আমার নিকট চলে এসো। 'আমর বলেন, এভাবে আমি ইসলাম গ্রহণ করি এবং নিজেকে ইসলামের

এক চতুর্থ হিসেবে দেখতে পাই। (আল-ইসাবা-৩/৬, হায়াতুস সাহাবা-১/৭১-৭২)

রাসূলুল্লাহর নির্দেশমত 'আমর ইসলাম গ্রহণ করে স্বগোত্রে ফিরে যান। তবে মক্কায় যাতায়াতকারীদের মাধ্যমে সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) খোঁজ-খবর রাখতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পর ইয়াসরিব বা মদীনার কিছু লোক 'আমরের গোত্রে আসে। তিনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, মক্কা থেকে যে লোকটি মদীনায় এসেছেন, তাঁর অবস্থা কি? তারা বললো, দলে দলে লোক তাঁর দিকে ছুটে আসছে। তাঁর স্বজাতি তো তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল; কিন্তু পারেনি। এখন তিনি মদীনায়।

তাদের কাছে এই খবর পেয়ে 'আমর মদীনায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় দিলে তিনি বললেনঃ হাঁ, তোমাকে আমি চিনেছি, মক্কায় তুমি আমার সাথে দেখা করেছিলে। তখন থেকে 'আমর মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

হযরত 'আমরের মদীনায় আগমনের সময় সম্পর্কে মতভেদ আছে। একটি মতে তিনি বদর যুদ্ধের পূর্বে মদীনায় আসেন এবং বদরে অংশগ্রহণ করেন। তবে প্রসিদ্ধ মতে তিনি খাইবার যুদ্ধের পরে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় আসেন। (আল-ইসাবা-৩/৫)

বদর, উহুদ, হুদাইবিয়া, খাইারসহ বিভিন্ন যুদ্ধ তাঁর স্বদেশ থাকাকালেই শেষ হয়ে যায়। মক্কা বিজয় অভিযানে তিনি সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করেন। তায়িফ অভিযানেও যে তিনি শরিক ছিলেন, এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তায়িফ অবরোধকালে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে, তার জন্য জান্নাতের একটি দরযা খুলে যাবে। এই সুসংবাদ শুনে আমি ১৬টি তীর নিক্ষেপ করি। তায়িফ অভিযানের পর আর কোন যুদ্ধে তার যোগদানের কথা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে তিনি আরও কিছু যুদ্ধে যোগদান করেন।

হযরত 'আমর ইবন 'আবাসার (রা) মৃত্যুর সময়কাল সঠিকভাবে জানা যায় না। সীরাত বিশেষজ্ঞরা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলেছেন, তিনি খলীফা হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতের শেষ দিকে মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং 'আল-ইসাবা ফী-তাময়ী যিস্ সাহাবা' গ্রন্থকার 'আল্লামা ইবন হাজার আল-'আসকালানী' শুধু এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে—যেহেতু 'আলী-মুয়াবিয়ার (রা) দ্বন্দ্ব এবং আমীর মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে কোথাও তাঁকে দেখা যায় না—'উসমানী খিলাফতের শেষদিকে তাঁর মৃত্যুকাল উল্লেখ করেছেন। (আল-ইসাবা-৩/৬) কিন্তু মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের এক বর্ণনায় জানা যায়, আমীর মু'য়াবিয়া (রা) ও রোমানদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তির কারণে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমীর মু'য়াবিয়া (রা) রোমানদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারতেন না। কিন্তু হযরত মু'য়াবিয়া (রা) পরিকল্পনা করেন, তাঁর বাহিনী রোমান সীমান্তে পৌঁছে যাবে, আর এদিকে চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁর বাহিনী সাথে সাথে হামলা চালিয়ে দেবে। এ সময় 'আমর ইবন আবাসা চিৎকার করে বলে বেড়াতেন, অঙ্গিকার পূর্ণ কর, ধোকা দিও না।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি আমীর মু'য়াবিয়ার খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু যদি 'আল-ইসাবা' গ্রন্থকারের মতটি সত্য ধরা হয়, তাহলে এই ঘটনাটি ছিল 'উসমানী খিলাফতকালের, যখন হযরত মু'য়াবিয়া (রা) শামের গভর্নর ছিলেন। তখনও রোমানদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল।

হযরত 'আমর ইবন 'আবাসা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) মুহবত বা সাহচর্যের খুব বেশী সুযোগ পাননি। তবে যতটুকু পেয়েছেন তা পুরাপুরি কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। আমরা তার প্রমাণ পাই মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতে। তিনি 'আরজ করেন—'আল্লিমনী মা

'আল্লামাকাল্লাহু—আল্লাহ্ আপনাকে যা শিখিয়েছেন তারকিছু আমাকেও শিখিয়ে দিন। এ কারণে এত কম সময়ের সাহচর্য সত্তেও হাদীসের গ্রন্থাবলীতে তাঁর বর্ণিত মোট ৪৮টি হাদীস দেখা যায়।

সাহাবীদের মধ্যে ইবন মাস'উদ, আবু উমামা আল-বাহিলী, সাহ্ল ইবন সা'দ ; এবং তাবেঈদের মধ্যে শুরাহবীল ইবন সামাত, সা'দান ইবন আবী তালহা, সুলাইম ইবন 'আমের, আবদুর রহমন ইবন 'আমের, জুবাইর ইবন নাফীর, আবু সালাম ও অন্যরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবা-৩/৫)

আবু নু'ঈম কা'বের মাওলা বা আযাদকৃত দাস থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ একদিন 'আমর ইবন 'আবাসা পশু চরাতে গেলেন। আমি তাঁর খোঁজে দুপুরে বের হলাম। আমি দেখতে পেলাম, 'আমর একস্থানে ঘুমিয়ে আছেন এবং একখানি মেঘ তাঁর ওপর ছায়া দিচ্ছে। আমি তাঁকে জাগালাম। তিনি জেগে আমাকে বললেন, এই ব্যাপারটি আমার ও তোমার মধ্যে গোপন থাকুক। অন্য কারও নিকট প্রকাশ করলে তোমার ভালো হবে না। আমি তাঁর জীবদ্দশায় একথা কারও নিকট বলিনি। (আল-ইসাবা-৩/৬)

ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা (রা)

নাম ওয়ালীদ, পিতা ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা। কুরাইশ গোত্রের বনী মাখযুম শাখার সন্তান। প্রখ্যাত সাহাবী ও সেনানায়ক হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও হিশাম ইবনুল ওয়ালীদের ভাই। একটি বর্ণনায় জানা যায়, তিনি হিশামের সহোদর ও খালিদের বৈমাত্রীয় ভাই।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মক্কী জীবনে ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ করেননি। এ সময় মুসলমানদের সাথে তাঁর আচরণ কেমন ছিল, সীরাত গ্রন্থাবলীতে সে সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ নেই। তবে দেখা যায়, মক্কার কুরাইশ বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং পরাজিত হয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ মতান্তরে সুলাইত ইবন কায়েসের (রা) হাতে বন্দী হন।

(আনসাবুল আশরাফ—১/৩০২)

ওয়ালীদের অন্য দুই ভাই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও হিশাম ইবনুল ওয়ালীদ তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে আসেন। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ দাবী করেন। এত মোটা অংকের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে খালিদ দ্বিধার ভাব প্রকাশ করেন। এতে হিশাম খুব রেগে গিয়ে খালিদকে বলেন ঃ তোমার কি, তুমি তো আর তার ভাই নও ? আবদুল্লাহ যদি এরচেয়ে বেশীও দাবী করে তবুও তাকে মুক্ত করতে হবে। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন ঃ ওয়ালীদ তার কাওমের ধর্মের ওপর থাকা অবস্থায় বন্দী হন এবং চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্তিলাভ করেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) ওয়ালীদের মুক্তির বিনিময়ে তার পিতার ঢাল, বর্ম ও তরবারি দাবী করেন। তার ভাইয়েরা সেই দাবী পূরণ করে তাঁকে মুক্ত করেন। (আনসাবুল আশরাফ—১/২১০)

ওয়ালিদ মুক্তি পেয়ে ভাইদের সাথে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছার পর ভাইদের নিকট থেকে পালিয়ে আবার মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফিরে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ভাইয়েরা ফিরে এসে আবার তাঁর সাথে দেখা করে বলেন, যদি তোমার মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাহলে মুক্তিপণ দেওয়ার পূর্বে হলে না কেন ? শুধু শুধু পিতার স্মৃতিচিহ্নগুলি নষ্ট করলে। ওয়ালীদ তাদেরকে বলেন, অন্য কুরাইদের মত আমিও মুক্তিপণ প্রদান করে মুক্ত হতে চেয়েছিলাম। মুক্তির পূর্বে আমি ইসলামের ঘোষণা এজন্য দিইনি যে, যাতে কুরাইশরা এমন কথা বলতে না পারে, আমি ফিদিয়া বা মুক্তিপণ দেওয়ার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ভাইদের সাথে আবার মক্কার পথে যাত্রা করেন। পথে তাঁর ভাইয়েরা তো তেমন কিছু বললো না। কিন্তু মক্কায় পৌঁছে অন্যান্য অত্যাচারিত মুসলমানদের মত তাঁকেও বন্দী করলো এবং তাঁর মত অন্য বন্দী—আইয়াশ ইবন রাবী'য়া, হিশাম ইবনুল আস, সালামা ইবন হিশাম প্রমুখের সাথে একঘরে আটক করলো।

ঐতিহাসিকরা বলেছেন, এসব বন্দীদের ওপর কুরাইশরা অমানুষিক নির্যাতন চালাতো। তাদের হত্যারও হুমকি দেয়া হতো।

কালবী বলেন ঃ যাদের কোন গোত্রীয় শক্তি বা জনবল ছিল না এমন একটি দুর্বল সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের অনেকে দ্বীন ত্যাগ করেছে, অনেকে ইসলামে অটল থেকেছে, আবার অনেকে ঈমান না হারিয়ে তাদের আদেশ পালন করেছে। অভিজাত

ঘরের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। যেমনঃ সালামা ইবন হিশাম ইবনুল মুগীরা, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা, 'আইয়াশ ইবন রাবী'য়া প্রমুখ। (আনসাবুল আশরাফ—১/১৯৭)

ইবন ইসহাক বলেন, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ ইবন মুগীরা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, বনু মাখযুমের একদল লোক তাঁর ভাই হিশাম ইবন ওয়ালীদ ইবন মুগীরার নিকট যায় এবং ওয়ালীদকে হত্যার জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়ার আবদার জানায়। তাদের যুক্তি ছিল, তাঁকে হত্যা করলে অন্যদের ব্যাপারে তারা নিরাপদ হতে পারবে। হিশাম তাদের সেই আবদার অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি আরও হুমকি দেন, কেউ তাঁর ভাই ওয়ালীদকে হত্যা করলে তিনি তাদের সর্বাধিক মর্যাদাবান এক ব্যক্তিকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবেন। এই চরম হুমকির মুখে তারা ওয়ালীদকে হত্যার আশা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

(সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩২১)

বদর যুদ্ধের পূর্বে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আইয়াশ ইবন রাবী'য়া, সালামা ইবন হিশাম, হিশাম ইবন 'আস প্রমুখের মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন। বদর যুদ্ধের পর ওয়ালীদ বন্দী হয়ে তাঁদের সাথে যুক্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নাম ধরেও দু'আ করতে লাগলেন। বায্যার আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে সালাম ফিরানোর পর মাথা উঁচু করলেন এবং কিবলামুখী অবস্থায় বললেনঃ হে আল্লাহ, তুমি সালামা ইবন হিশাম, 'আইয়াশ ইবনে রাবী'য়া, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ এবং ঐ সকল দুর্বল মুসলমানকে মুক্তি দাও যারা কোন কৌশল অবলম্বনে অক্ষম এবং যাদের কোন পন্থা জানা নেই।' অন্য একটি বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতুল ফজরে এই দু'আ করতেন। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৮)

বেশ কিছু দিন তাঁর বন্দী দশায় কাটে। একদিন সুযোগ বুঝে তিনি মদীনায় পালিয়ে আসেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর কাছে 'আইয়াশ ও সালামার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। ওয়ালীদ বলেন, তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। একটি বেড়ী দু'জনের পায়ে লাগানো হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে বললেনঃ তুমি আবার মক্কায় যাও। সেখানকার এক কর্মকার ইসলাম গ্রহণ করেছে। প্রথমে তার ওখানে গিয়ে ওঠো। তারপর গোপনে 'আইয়াশ ও সালামার সাথে দেখা করে বল, তুমি আমার প্রতিনিধি, আমার সাথে চলো।

রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মত ওয়ালীদ মক্কায় পৌঁছলেন এবং 'আইয়াশ ও সালামার সাথে দেখা করে রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী তাঁদের কাছে পৌঁছে দিলেন। পরিকল্পনা মত তাঁরা মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তাঁদের পিছু ধাওয়া করেন; কিন্তু ধরতে ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে যান।

এদিকে ওয়ালীদ তাঁর সঙ্গীদ্বয়সহ একটানা ভ্রমণ ও অজানা শঙ্কায় ক্লান্তিতে অসাড় হয়ে পড়ছিলেন। এই সময় কবিতার একটি শ্লোক বারবার তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিলঃ
"ওহে আমার চরন যুগল! আমাকে আমার কাওমের নিকট পৌঁছে দাও।
আজকের এ দিনটির পর আর কখনও তুমি অলস দেখতে পাবে না।"

আজবাস নামক স্থানে তিনি পড়ে গেলে একটি অঙ্গুলি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। তিনি আহত অঙ্গুলিটিকে উদ্দেশ্য করে একটি শ্লোক আওড়াতে থাকেনঃ "ওহে, তুমি একটি অঙ্গুলি ছাড়া আর কিছু নও, যা থেকে রক্ত ঝরেছে।
যা কিছু তুমি লাভ করেছ, তা সবই আল্লাহর রাস্তায়'। (আনসাবুল আশরাফ— ১/২০৯—২১০,

হুদাইবিয়ার চুক্তি অনুযায়ী হযরত রাসূলে কারীম (সা) হিজরী সপ্তম সনে বিগত বছরের কাজা উমরা আদায় করতে মক্কায় যান। ওয়ালীদ এ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। তখনও

তাঁর ভাই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করেননি। এ সম্পর্কে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ বলেনঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আমি যখন দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি, তখন হিজরী ৭ম সনে যুল-কাদাহ্ মাসে হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'উমরাতুল কাজা' আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁদের কারও সামনে পড়তে হয় এই আশঙ্কায় আমি আত্মগোপন করে থাকলাম। তাঁদের কারও সাথে আমার দেখা হলো না। আমার ভাই ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ এই সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। তিনি আমাকে খুঁজে না পেয়ে আমাকে একটি চিঠি লিখেন। চিঠির বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অতঃপর ইসলামের ব্যাপারে আপনার এমন বিরূপ মনোভাব পোষণের কারণে আপনাকে আমার খুব আশ্চর্য মানুষ বলে মনে হয়েছে। অথচ আপনি একজন বড় বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তি। আপনার মত কোন ব্যক্তি কি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেনঃ খালিদ কোথায়? আমি বলেছিঃ শিগগিরই আল্লাহ তাঁকে নিয়ে আসবেন। তিনি তখন বললেনঃ তার মত ব্যক্তি কি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে? তার বুদ্ধি ও চেষ্টা যদি মুসলমানদের পক্ষে হতো, তাহলে তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতো এবং আমি তাকে অন্যদের চেয়ে বেশী মর্যাদা দিতাম। ভাই, যে ভালো কাজ আপনার হাতছাড়া হয়ে গেছে, এখনই আপনি এসে তাতে শরিক হউন।" মূলতঃ এই চিঠি পেয়ে হযরত খালিদ ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে মদীনার দিকে যাত্রা করেন।
(হায়াতুস সাহাবা-১/১৬০, উসুদুল গাবা-৫/৯৩)

হযরত ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদের মৃত্যুর সময়কাল সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা মতে, তিনি আইয়াশ ও সালামাকে মুক্ত করে মদীনায় ফিরে অল্প কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। এই বর্ণনা মতে, মদীনায় পৌঁছে তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির হয়ে বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মৃত, আপনার পরিত্যক্ত একটু কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন দিন। অতঃপর তিনি মারা যান এবং রাসূল (সা) স্বীয় কাপড় দিয়ে তাঁকে কাফন দেন।
(আল-ইসাবা-৩/৬৪০, আনসাবুল আশরাফ—১/২১০-২১১)

কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, একাধিক বর্ণনায় জানা যায়, তিনি হিজরী ৭ম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'উমরাতুল কাজা' আদায়ে শরিক ছিলেন। আল্লামা ইবন 'আবদিল বার লিখেছেনঃ "আর একথা সঠিক যে, তিনি 'উমরাতুল কাজায়' রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।" আর 'উমরাতুল কাজা হিজরী ৭ম সনের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে প্রথম বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় 'উমরাতুল কাজার দুই বছর পূর্বে হিজরী ৫ম সনে তাঁর ওফাত হয়।

তাছাড়া ওয়াকিদী বলেছেনঃ কেউ কেউ মনে করেন, ওয়ালীদ মক্কা থেকে পালিয়ে আবু বাসীরের দলের সাথে যোগ দেন। উল্লেখ্য যে, এই আবুবাসীর হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মদীনায় আসেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠান। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর এক সঙ্গীকে হত্যা করে আবার মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফিরে আসেন। তিনি আবু বাসীরকে মদীনা ত্যাগের নির্দেশ দেন। আবু বাসীর মদীনা ত্যাগ করে লোহিত সাগরের উপকূল এলাকায় চলে যান। এরপর মক্কার আরও কিছু নও মুসলিম যুবক তাঁর সাথে যোগ দেন। তাঁরা কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলা আক্রমণ করে লুটপাট করতেন। ফলে কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অতঃপর কুরাইশরা অনন্যোপায় হয়ে এই দলটিকে মদীনায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ জানায়। রাসূল (সা) তাঁদেরকে মদীনায় ডেকে পাঠান। (আনসাবুল আশরাফ—১/২১০-২১১) তবে বালাযুরী এই বর্ণনাকে সঠিক বলে মনে করেননি। যাই

হউক হিজরী অষ্টম সনের পরে যে তিনি জীবিত ছিলেন এমন কোন প্রমাণ সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা ছিলেন ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদের চাচাতো বোন। ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে বিদেশ-বিভূঁয়ে মারা গেছে। তার জন্য শোক প্রকাশের কেউ এখানে নেই। রাসূল (সা) তাঁকে শোক প্রকাশের অনুমতি দান করেন। উম্মু সালামা রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি পেয়ে খাবার তৈরী করেন এবং পাড়ার অন্য মহিলাদের ডেকে আনেন। হযরত উম্মু সালামা (রা) একটি মরসিয়া বা শোকগাঁথা আবৃত্তি করতে শুরু করেন। তার দু'টি শ্লোক নিম্নরূপঃ

"ওহে চোখ, তুমি ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ ইবন মুগীরার জন্য কাঁদ। আমাদের মধ্যে সে ছিল খরার সময় বৃষ্টি ও রহমত স্বরূপ। নামকাম ও গৌরবে সে ছিল তাঁর পিতার মত। সে তাঁর গোত্রের জন্য একাই যথেষ্ট।"

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মরসিয়াটি শোনার সাথে সাথে বলে উঠলেনঃ উম্মু সালামা, একথা না বলে বরং বলঃ "মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসবে। আর এ থেকেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে এসেছো। (সূরা কাফ—১৯) (আনসাবুল আশরাফ—১/২১০-২১১, আল-ইসাবা—৩/৬৪০)

ইবন হিশাম বলেনঃ মুজাহিদের সূত্রে আমার নিকট পৌঁছেছে। তিনি বলেছেন সূরা ফাত্‌হ-এর নিম্নের আয়াতটি ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ, সালামা ইবন হিশাম, 'আইয়াশ ইবন রাবী'য়া, আবু জান্দাল ইবন সুহাইল ও তাঁদের মত আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছেঃ

"তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হতো, যদি না এমন কিছু মুমিন নর ও নারী থাকতো, যাদেরকে তোমরা জাননা। তোমরা অজ্ঞাতসারে তাদেরকে পদদলিত করতে। ফলে, তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে।"

(সূরা আল-ফাত্‌হ-২৫, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩২১)

সালামা ইবন হিশাম (রা)

নাম সালামা, ডাকনাম আবূ হাশেম। পিতা হিশাম ইবন মুগীরা এবং মাতা দাবা'য়া বিন্‌তু আমের। ইসলামের ঘোরতর শত্রু আবূ জাহলের ভাই।

ডঃ মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ সালামার মা দাবা'য়া বিনতু আমেরের জাহিলী জীবনের এক চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। হাইসাম ও ইবনুল কালবী বর্ণনা করেছেনঃ মুত্তালিব ইবন আবী ওয়াদা'য়া ইবন আব্বাসকে বলেছেনঃ দাবায়া বিনতু আমের ছিলেন হাওজা ইবন আলীর স্ত্রী। হাওজা মারা গেলে দাবা'য়া উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি পিতৃ গোত্রে ফিরে আসেন। সেখানে 'আবদুল্লাহ ইবন জুদ'য়ান আত তাইমী দাবা'য়ার পিতার নিকট তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। তাঁর পিতা রাজী হন এবং আবদুল্লাহর সাথে তাঁকে বিয়ে দেন।

এদিকে দাবা'য়ার চাচাতো ভাই হুযন ইবন 'আবদুল্লাহ দাবায়ার পিতার নিকট তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। দাবায়ার পিতা বলেন, আমি তো তাকে ইবন জুদ'য়ানের সাথে বিয়ে দিয়েছি। হুযন তখন শপথ করে বলে, দাবায়া যদি ইবন জুদয়ানের কাছে যায় তাহলে আমি তার স্বামীর সামনেই তাকে হত্যা করবো।

দাবা'য়ার পিতা ঘটনাটি ইবন জুদ'য়ানকে জানালেন। ইবন জুদ'য়ানও পাল্টা জানিয়ে দিলেন, যদি তিনি দাবায়ার চাচাতো ভাইয়ের দাবী অনুযায়ী কাজ করেন তাহলে 'উকাজ মেলায় তার বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগের ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হবে। দাবায়ার পিতা তার চাচাতো ভাইয়ের নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলে সে নমনীয় হয়ে যায় এবং তার দাবী প্রত্যাহার করে নেয়।

দাবা'য়াকে ইবন জুদ'য়ানের নিকট পাঠানো হলো। আল্লাহর মর্জি যতদিন ছিল, তিনি সেখানে থাকলেন। দাবায়া ছিলেন অতি সুন্দরী যুবতী। ইবন জুদ'য়ানের সাথে দাম্পত্য জীবন চলাকালে একদিন মক্কায় কা'বার তাওয়াফ করছিলেন, এ সময় হিশাম ইবন মুগীরার নজরে পড়লেন। দাবা'য়ার রূপে হিশাম মুগ্ধ হলেন। কা'বার চত্বরে তারা কিছুক্ষণ কথা বললেন, এক পর্যায়ে হিশাম বললেনঃ দাবায়া! এই রূপ ও যৌবন নিয়ে তুমি একজন বৃদ্ধের ঘর করছো? তার নিকট থেকে তালাক নিতে পারলে আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

ঘরে ফিরে দাবা'য়া স্বামী ইবন জুদ'য়ানকে বললেনঃ আমি একজন যুবতী নারী, আর তুমি এক বৃদ্ধ। ইবন জুদ'য়ান বললেনঃ একথা কেন? আমি জানতে পেরেছি, তাওয়াফের সময় হিশাম তোমার সাথে কথা বলেছে। তুমি হিশামকে বিয়ে করবে না—যতক্ষণ তুমি আমার কাছে এ অঙ্গিকার না করছো, আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি না। তোমাকে আরও অঙ্গিকার করতে হবে, যদি তাকে বিয়ে কর তাহলে তুমি আমার এই শর্তগুলি পূরণ করবেঃ ১· উলঙ্গ হয়ে কা'বা তাওয়াফ করবে, ২· এতগুলি উট কুরবানী করবে, ৩· এত পরিমাণ পশমের সূতা কাটবে।

দাবায়া এই শর্তের কথা হিশামকে জানালেন। হিশাম বললেনঃ প্রথম শর্তটির ব্যাপারে আমি কুরাইশদের সাথে আলোচনা করে কা'বার চত্বর সম্পূর্ণ ফাঁকা করে দেব। তুমি শেষ রাতে অন্ধকারে একাকী উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ সেরে নেবে। কেউ দেখার সুযোগ পাবে না। আর তোমার পক্ষ থেকে উট আমি কুরবানী করে দেব। আর সূতা কাটার ব্যাপারটি, তা এটা কোন ধর্ম নয়। কুরাইশরা এটা তৈরী করেছে। আমার প্রতিবেশী মহিলারা তোমার পক্ষ থেকে এ কাজটি করে দেবে।

হিশামের প্রতিশ্রুতি পেয়ে দাবা'য়া স্বামী ইবন জুদ'য়ানকে বলেন, আমি তোমার শর্তে রাজী।

হিশামকে বিয়ে করলে তোমার এ শর্তসমূহ পূরণ করবো। এভাবে ইবন জুদ'য়ানের নিকট থেকে তালাক নিয়ে দাবা'য়া হিশামকে বিয়ে করেন। হিশাম কুরাইশদের সাথে কথা বলে কা'বার চত্বর খালি করে দিলে দাবা'য়া উলঙ্গ হয়ে কা'বা তাওয়াফ করেন। কালবী বলেনঃ মুত্তালিব ইবন আবী ওয়াদা'য়া বলেছেনঃ আমি তখন এক বালক। মসজিদের একটি দরযা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলাম। দেখলাম, দাবা'য়া কাপড় খুলে ফেললো। এভাবে এক সপ্তাহ ধরে সে একটি শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে তাওয়াফ করলো। অন্য শর্ত দু'টিও হিশাম পূরণ করেন। এই হিশামের ঔরসে দাবায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন সালামা ইবন হিশাম। উত্তরকালে এই সালামা হলেন একজন পরীক্ষিত উত্তম মুসলমান।

হিশামের সাথে দাম্পত্য জীবন চলাকালে দাবা'য়ার পূর্ব স্বামী আবদুল্লাহ ইবন জুদয়ান মারা যান। তার মৃত্যুর খবর শুনে দাবা'য়া মন্তব্য করেনঃ তিনি ছিলেন একজন আরব রমনীর এক চমৎকার স্বামী। এর কিছু দিন পর হিশাম মারা গেলে দাবা'য়া বিধবা হন।

পরবর্তীকালে দাবা'য়া ইসলাম গ্রহণ করেন। এদিকে পুত্র সালামাও বড় হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সালামার নিকট তাঁর মাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সালামা তাঁর মায়ের সাথে পরামর্শ করে তাঁর মধ্যে অনীহার ভাব লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহকে (সা) জানান। রাসূল (সা) প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। (ডঃ হামীদুল্লাহ সম্পাদিত আনসাবুল আশরাফ'—১, টীকা নং ৩, পৃঃ ৪৬০—৪৬১)

মক্কায় ইসলামী দাও'য়াতের সূচনা পর্বেই সালামা ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবশায় হিজরাত করেন। কিছু দিন সেখানে থাকার পর আরও অনেক মুহাজিরদের সাথে তিনিও মক্কায় ফিরে আসেন। সকল মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছে— এমন একটি গুজব শুনে তারা মক্কায় আসেন। অনেকেই আবার হাবশায় ফিরে যান। সালামাও যেতে চান, কিন্তু আবু জাহল তাঁকে বাধা দেয়। তাঁর উপর অত্যাচার শুরু হয়। তাঁকে অনাহারে রাখা হয় এবং মারপিটও চলতে থাকে। তবে তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তখন পর্যন্ত ইসলাম তেমন শক্তি অর্জন করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহও (সা) কোন রকম সাহায্য করতে সক্ষম ছিলেন না। তবে নামাযের পর সালামা ও তাঁর মত নির্যাতিতদের জন্য এই বলে দু'আ করতেনঃ 'হে আল্লাহ, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ, সালামা ইবন হিশাম ও 'আয়্যাশ ইবন রাবীয়াকে মক্কার মুশরিকদের কঠোরতা থেকে মুক্তি দাও। 'ওয়ালীদের জীবনীতে সালামার মুক্তি ও মদীনা হিজরাতের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি মক্কায় কাফিরদের হাতে বন্দী থাকা অবস্থায় বদর যুদ্ধ শেষ হয়। বদর যুদ্ধের পর, মতান্তরে খন্দক যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় আসেন। মদীনায় আসার পর সংঘটিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মূতার যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে যারা ময়দান থেকে পালিয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন। এই লজ্জা ও অনুশোচনায় পরবর্তী জীবনে তিনি ঘর থেকে বের হওয়া প্রায় ছেড়ে দেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা থেকে ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। তিনি সালামা ইবন হিশামের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, সালামার হয়েছে কি, আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের সাথে নামাযের জামায়াতে শামিল হতে দেখিনে কেন? সালামার স্ত্রী বললেনঃ আল্লাহর কসম, তিনি বের হতেই পারেন না। বের হলেই মানুষ তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলতে থাকে— 'ইয়া ফুররার, ফাাররতুম ফী সাবীলিল্লাহ, ওহে পলাতক, আল্লাহর রাস্তা থেকে তোমরা পালিয়েছ।" এ কারণে তিনি বাড়ীতেই থাকেন, বাইরে কোথাও যান না। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৮২-৮৩) তবে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাকে "কাররার" বা প্রচণ্ড আক্রমণকারী বলে সম্বোধন করতেন। (আল-ইসাবা—২/৬৯)

হযরত আবুবকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে তিনি শাম বা সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিযানের এক পর্যায়ে হযরত 'উমারের খিলাফতকালে হিজরী ১৪ সনের মুহাররম মাসে সংঘটিত 'মারজে সফর' বা মারজে রোম' নামক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তবে 'উরওয়া, মূসা ইবন 'উকবা, আবু যার'য়া আদ দিমাশ্‌কীর মতে তিনি আজনাদাইন যুদ্ধে শহীদ হন। (আল-ইসাবা-২/৬৯)

সালামার মা দাবা'য়া একটি কবিতায় বলেছেনঃ "হে সম্মানিত কা'বার প্রভুঃ কোন দুশ্চিন্তা নেই। সালামাকে প্রতিটি শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী কর।

অনিশ্চিত কর্মকাণ্ডে তার দু'টি হাত,
যার একটি প্রকাশ পায় এবং অন্যটি দানশীল। (আনসাবুল আশরাফ—১/২০৮)

'আমের ইবন রাবী'য়া (রা)

নাম 'আমের, কুনিয়াত আবু আবদিল্লাহ্ এবং পিতা রাবী'য়া। তাঁর খান্দান হযরত 'উমারের (রা) পিতা খাত্তাব-এর হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ ছিল। খাত্তাব তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, তাঁকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন। এ কারণে প্রথম জীবনে 'আমের ইবনুল খাত্তাব (খাত্তাবের পুত্র 'আমের) নামে পরিচিত হন। কিন্তু কুরআন যখন এ প্রথা বাতিল করে প্রত্যেক মানুষকে তাঁর জন্মদাতা পিতার নামে পরিচয় গ্রহণের নির্দেশ দেয়, তখন হযরত 'আমেরও খাত্তাবের পরিবর্তে নিজের জন্মদাতা পিতা রাবী'য়ার নামে পরিচিত হন।

উল্লেখিত সম্পর্কের কারণে হযরত 'আমের ও হযরত উমারের মধ্যে শেষ জীবন পর্যন্ত অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। হযরত উমারের 'বাইতুল মাকদাস' সফরের সময় হযরত আমের তার সফরসঙ্গী ছিলেন। যে বছর হযরত উসমানকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে হযরত উমার হজ্জে যান, সঙ্গে আমেরও ছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়ার পূর্বে ইসলামের সেই সূচনাপর্বে রাসূলুল্লাহর (সা) আহবানে সাড়া দিয়ে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন, হযরত 'আমের সেই সৌভাগ্যবানদেরই একজন।

শিরক ও তাওহীদের সংঘাত-সংঘর্ষ এবং কাফিরদের যুলুম-নির্যাতনে তিনিও শান্তিতে মক্কায় বসবাস করতে পারেননি। তিনি স্ত্রী হযরত লায়লাকে সংগে করে শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধানে দুইবার হাবশায় হিজরাত করেন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। 'আমেরের স্ত্রী বলেনঃ আমরা হাবশায় হিজরাতের প্রস্তুতি নিচ্ছি। 'আমের কোন প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যান। এমন সময় 'উমার আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখনও সে শিরকের ওপর। আমরা তার হাতে নিগৃহিত হতাম। উমার আমাকে বললোঃ আবদুল্লাহর মা, এ কি! তোমাদের চলে যাওয়ার প্রস্তুতি? বললামঃ হাঁ, আমরা আল্লাহর এক যমীন হতে অন্য যমীনের দিকে যাব। তোমরা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছ, আমাদের ওপর যুলুম করেছ। দেখা যাক, আল্লাহ কোন উপায় বের করে দেন কিনা। উমার বললোঃ আল্লাহ তোমাদের দিনটি মঙ্গলময় করুন। আমেরের স্ত্রী বলেনঃ আমি সেদিন উমারকে এত নরম দেখলাম যা আর কখনও দেখিনি। উমার চলে গেল। আমাদের দেশত্যাগে সে অত্যন্ত কষ্ট পায়। আমের বাড়ী ফিরলে আমি তাঁকে বললামঃ আবদুল্লাহর বাপ, এইমাত্র তুমি যদি উমারের বিষণ্ণতা ও আমাদের প্রতি তার দরদ দেখতে! আমের বললেনঃ তুমি তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছো? বললামঃ হাঁ। তিনি বললেনঃ খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে, তবে তুমি যাকে দেখেছো সে ইসলাম গ্রহণ করবে না। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৫৬)

হযরত আমের (রা) হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে এসে সস্ত্রীক আবার মদীনায় হিজরাত করেন। ইবন ইসহাক বলেনঃ মুহাজিরদের মধ্যে সাবু সালামার পর সর্বপ্রথম মদীনায় আসেন আমের ইবন রাবী'য়া ও আবদুল্লাহ্ ইবন জাহাশ। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৬৩) অনেকের মতে এটা সঠিক নয়। তাঁর পূর্বে আরও কতিপয় ব্যক্তি মদীনায় পৌঁছেন। তবে একথা সত্য যে, তাঁর স্ত্রী হযরত লায়লা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতকারী প্রথম মহিলা।

বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। তাছাড়া ছোট ছোট অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। জীবন বাজি রেখে আল্লাহর বাণী বা কালেমা প্রচারের দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করেন। স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবন আমেরের কাছে প্রায়ই নিজের

গৌরবজনক কর্মকাণ্ডের কথা গর্বের সাথে বর্ণনা করতেন। একবার কথা প্রসঙ্গে বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে অভিযানে পাঠাতেন। দারিদ্রের কারণে পাথেয় হিসেবে সামান্য কিছু খেজুর দিতেন। প্রথম প্রথম আমরা এক এক মুট করে পেতাম, তারপর কমতে কমতে একটি মাত্র খেজুরে এসে ঠেকতো।' হযরত আবদুল্লাহ্ বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেনঃ একটা খেজুরে কিভাবে চলতো? জবাবে তিনি বললেনঃ প্রিয় বৎস! এমনটি বলো না। যখন খেজুর শেষ হয়ে যেত, তখন আমরা এই একটি খেজুরের জন্যও কাতর হয়ে পড়তাম।

হযরত উসমানের খিলাফতের শেষ দিকে যখন ফিতনা ও আত্মকলহ্ চরম রূপ ধারণ করে তখন হযরত আমের (রা) নির্জন-বাস গ্রহণ করেন। রাত-দিন সব সময় রোযা, নামায ও ইবাদাতে মাশগুল থাকতেন। একদা গভীর রাত পর্যন্ত ইবাদাতে মগ্ন ছিলেন, এ অবস্থায় একটু তন্দ্রাভাব আসে। তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ যেন তাকে বলছেন, "উঠো, আল্লাহর কাছে দু'আ কর, তিনি যেন তোমাকে এই ফিত্না থেকে বাঁচান—যিনি তাঁর অন্য নেক বান্দাদের রক্ষা করেছেন।" হযরত আমের সংগে সংগে উঠে বসেন। এই ঘটনার পর তাঁর নির্জনতা অবলম্বন ও ইবাদাতের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এরপর থেকে কেউ আর তাঁকে ঘর থেকে বের হতে দেখেনি। এ অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হযরত উসমানের শাহাদাতের কয়েকদিন পর ইনতিকাল করেন। অতিরিক্ত নির্জনতা অবলম্বনের জন্য কেউ জানতে পারেনি তিনি কবে অসুস্থ হন এবং কবেই বা মৃত্যুবরণ করেন। হঠাৎ তাঁর জানাযা দেখে লোকেরা অবাক হয়ে যায়।

মুসয়াব ইবন যুবাইর বলেনঃ 'আমের হিজরী ৩২ সনে মারা যান। আবু উবাইদার মতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ৩৭ সন। ওয়াকিদী বলেন, হযরত উসমানের শাহাদাতের অল্প কিছুদিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (আল-ইসাবা-২/২৪৯)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমার, আবদুল্লাহ্ ইবন যুবাইর, আবু উমামা ইবন সাহল প্রমুখের সূত্রে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যা বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

আমের ইবন রাবী'য়া থেকে বর্ণিত। আরবের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসে। আমের তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। লোকটি সে কথা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বর্ণনা করে। সে আবার ফিরে এসে আমেরকে বলে, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এমন একটি উপত্যকার মালিকানা চেয়েছি, যার থেকে উত্তম উপত্যকা আরবে দ্বিতীয়টি নেই। আমি ইচ্ছা করেছি তার কিছু অংশ আপনাকে দান করবো। যা আপনার ও আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কাজে আসবে। আমের বললেনঃ তোমার ঐ জমির কোন প্রয়োজন আমার নেই। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ "মানুষের হিসাব-নিকাশ নিকটবর্তী হয়েছে অথচ এখনও তারা অমনোযোগী হয়ে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে।" (সূরা আল-আম্বিয়া-১) আমের বলেন, এ আয়াত আমাদেরকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ করে তোলে। (আল-ইসাবা-২/২৫১-৫২)

উসমান ইবন তালহা (রা)

নাম উসমান, পিতার নাম তালহা ইবন আবী তালহা এবং মাতার নাম উম্মু সাঈদ সালামা। মক্কার কুরাইশ বংশের বনু আমর শাখার সন্তান। জাহিলী যুগে পবিত্র কা'বার হাজেব বা তত্ত্বাবধায়ক ও চাবির রক্ষক ছিলেন। ইসলামী যুগেও এ দায়িত্ব পালন করেন। (উসুদুল গাবা ৩/৩৭২) উসমান ইবন তালহার পিতা তালহা, তিন ভাই মুসাফি', কিলাব ও হারেস এবং তাঁর চাচা 'উসমান ইবন আবী তালহা উহুদ যুদ্ধে কাফির অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়। তাঁর পিতা তালহা হযরত আলীর (রা) সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আলী (রা) তরবারির এক আঘাতে তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম ১ম খণ্ড, টীকা নং ৩, পৃঃ ৪৭০)

'উসমান ইবন তালহার ইসলামপূর্ব জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মক্কায় মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়নে শরীক হতেন কি-না সে সম্পর্কেও ইতিহাসে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। একটি ঘটনা জানা যায়, হযরত মুসয়াব ইবন 'উমাইর (রা) মক্কায় দারুল আরকামে গোপনে ইসলাম গ্রহণের পর চুপে চুপে নামায আদায় করতেন। একদিন 'উসমান ইবনে তালহা তা দেখে ফেলেন এবং তাঁর মা ও গোত্রের কানে পৌঁছে দেন। ফলে তারা মুসয়াবকে বন্দী করে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩০১)

হযরত উম্মু সালামার (রা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞরা উসমান ইবন তালহার নামটি বারবার উচ্চারণ করেছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই রকম ঃ হযরত উম্মু সালামা (রা) যখন মক্কার কুরাইশদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে স্বামী আবু সালামার (রা) সাথে মিলিত হওয়ার জন্য একাকী মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে মক্কার অদূরে তানয়ীমে পৌঁছেন, তখন এই 'উসমান ইবন তালহা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ আবু উমাইয়্যার মেয়ে, কোন দিকে যাবে ? তিনি বললেন ঃ মদীনায় স্বামীর কাছে। উসমান বললেন ঃ তোমার সাথে আর কেউ নেই ? উম্মু সালামা বললেন, আমার এই ছোট্ট শিশু সালামা ছাড়া আর কেউ নেই। অতঃপর উসমান উম্মু সালামার উটের রশি ধরে টেনে চলতে লাগলেন এবং মদীনার উপকণ্ঠে কুবার বনী আমর ইবন 'আউফের পল্লীতে পৌঁছে উম্মু সালামাকে বললেন ঃ আল্লাহর নামে প্রবেশ কর, তোমার স্বামী এখানে আছে। একথা বলে 'উসমান আবার মক্কার পথ ধরেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৬৯-৭০) হযরত উম্মু সালামা (রা) যখন মদীনায় হিজরত করেন, 'উসমান তখনও অমুসলিম।

উসমান ইবন তালহার ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। কোন মতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়, কোন মতে হিজরী ৮ম সনে, আবার কোন মতে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরী অষ্টম সনে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও হযরত 'আমর ইবনুল আসের সাথে মদীনায় গিয়ে ইসলামের ঘোষণা দেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ বলেন ঃ আমি যখন মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম তখন মনে মনে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যাব কার সাথে ? বিষয়টি নিয়ে সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার সাথে আলোচনা করলাম। সে আমার প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে বললো, কেউ আমার সাথে না থাকলেও আমি কক্ষণও তার অনুসারী হবো না। এরপর আমি ইকরামা ইবন আবী জাহলের নিকট গিয়ে একই কথা বললাম। সেও সাফওয়ানের মত জবাব দিল। তারপর আমি উসমান ইবন তালহার সাথে দেখা করে বললাম ঃ আমাদের অবস্থা তো এখন সেই খেঁকশিয়ালের মত যে একটি গর্তের মধ্যে আছে, আর সেই গর্তে পানি ঢালা হচ্ছে। এক

সময় অবশ্যই তাকে বের হয়ে আসতে হবে। উসমান আমার কথা বুঝতে পেরে সায় দিল এবং আমার মত একই ইচ্ছা প্রকাশ করলো। আমি বললামঃ আগামী কাল ভোরেই আমি মদীনার পথে রওয়ানা হচ্ছি। অতঃপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আগামীকাল ভোরে আমরা পৃথক ভাবে মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে ইয়াজুজ' নামক স্থানে পৌঁছবো এবং সেখান থেকে এক সাথে যাত্রা করবো। কেউ আগে পৌঁছলে অন্যের জন্য অপেক্ষা করবো। প্রভাত হওয়ার পূর্বেই আমরা 'ইয়াজুজ' পৌঁছে যাত্রা শুরু করলাম। 'হাদ্দা' নামক স্থানে পৌঁছে আমর ইবনুল আসের সাথে আমাদের দেখা হলো। আলাপ করে জানা গেল তিনিও একই উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। তারপর আমরা তিনজন এক সাথে মদীনায় পৌঁছে, রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হই। প্রথমে আমি, তারপর 'উসমান ও আমর রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ করি। সে ছিল অষ্টম হিজরীর সফর মাস। (হায়াতুস সাহাবা -১/১৬১-৬২, কবি আবদুল্লাহ ইবন যাব'য়ারী তালহার ইসলাম গ্রহণকে স্বাগতঃ জানিয়ে সে সময় একটি কাসীদা রচনা করেছিলেন। তার কিছু অংশ ইবন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন (সীরাত-২/২৭৮)। অন্য একটি বর্ননা মতে, উসমান হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খালিদ ও আমরের সাথে মদীনায় যান। (আল-ইসাবা ৩/৪৬০)। অপর দিকে মক্কা বিজয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ননা দ্বারা বুঝা যায় মক্কা-বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে 'উসমান কা'বার চাবি লাভ করার পর সেই দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে বাহ্যতঃ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, মক্কা বিজয়ের পর একজন অমুসলিমের হাতে রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বার চাবি তুলে দিতে পারেন কি? চাবি দেওয়ার ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রশ্ন হচ্ছে, মক্কা বিজয়ের পূর্বেও কা'বার চাবি ছিল উসমানের নিকট। মক্কা বিজয়ের পূর্বে একজন মুসলমানের হাতে কা'বার চাবি থাকবে, আর কুরাইশরা তা মেনে নেবে, এ কি সম্ভব? এ সব প্রশ্নের সমাধান এ ভাবে হতে পারে, তিনি খালিদ ও 'আমরের সাথে পূর্বেই মদীনায় গিয়ে ইসলামের ঘোষণা দিয়ে মক্কায় চলে আসেন? কিন্তু মক্কার লোকেরা তা হয়তো জানতোনা। (আসাহ্হুস সিয়ার-৩০৪-৩০৬)

জাহিলী যুগ থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত কা'বার তত্ত্বাবধান ও চাবি রক্ষকের দায়িত্ব উসমানের ওপর ন্যস্ত ছিলো। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত রাসূলে কারীম (সা) কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য তাঁর নিকট চাবি চাইলেন। তিনি বাড়ীতে গিয়ে তাঁর মায়ের নিকট চাবি চাইলে তিনি দিতে অস্বীকার করেন। সম্ভবতঃ তখনও উসমানের মা ইসলাম গ্রহণ করেননি। 'উসমান কোষমুক্ত তরবারি উঁচু করে ধরে মাকে বললেন, চাবি দিন অন্যথায় এই তরবারি পিঠে বসিয়ে দেব। এ ভাবে 'উসমান মার নিকট থেকে জবরদস্তি চাবি এনে নিয়ে হযরত রাসূলে কারীমের হাতে অর্পন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দরজা খুলে কা'বার ভেতরে প্রবেশ করেন। উসমানও সংগে ছিলেন। দরযা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর কা'বা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে আসেন। অতঃপর রাসূল (সা) মসজিদে বসলেন। 'আলী (রা) কা'বার চাবিটি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আরজ করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, চাবিটি আমাদের দায়িত্বে অর্পন করুন। সিকায়াহ্ ও হিজাবাহ্ (হাজীদের পানি পান ও কা'বার রক্ষণাবেক্ষন) উভয় দায়িত্ব এখন থেকে বনু হাশিমের হাতে দান করুন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, সে দিন 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব কা'বার চাবিটি হস্তগত করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁকে সমর্থন করেছিল বনু হাশিমের আরও কিছু লোক। সিকায়াহ্ বা পানি পান করানোর দায়িত্ব পূর্ব থেকেই আব্বাসের ওপর ন্যস্ত ছিল।

বনু হাশিমের এ দাবীর মুখে হযরত রাসূলে করীম (সা) বললেনঃ উসমান ইবন তালহা কোথায়? উসমানকে ডাকা হলে রাসূল (সা) তাঁর হাতে মতান্তরে উসমান ও তাঁর চাচাতো ভাই শাইবার হাতে চাবিটি দিয়ে বললেনঃ এই তোমার চাবি। এখন থেকে এই চাবি চিরদিনের জন্য তোমাদের হাতে

থাকবে। কেউ তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে সে হবে অত্যাচারী। (সীরাতু ইবন হিশাম ২/৪১১-১২)

ইবন সা'দ লিখেছেন ঃ কাবার চাবি পূর্ব থেকেই উসমান ইবন তালহার দায়িত্বে ছিল। তিনি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার কা'বার দরজা খুলতেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ভিন্ন এক দিন দরজা খুলে দেওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত শক্তভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সে দিন তাঁকে বলেছিলেন, ওহে উসমান, এমন একদিন আসবে যখন এ চাবি আমারই আয়ত্বে থাকবে এবং আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই অর্পন করবো। উসমান বলেছিলেন ঃ সম্ভবতঃ সেদিন গোটা কুরাইশ বংশের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। রাসূল (সা) তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেন ঃ না, বরং সেই দিনটি হবে কুরাইশদের প্রকৃত ইয্যত ও সম্মানের দিন। তাই মক্কা বিজয়ের দিন উসমান যখন রাসূলুল্লাহর (সা) হাত থেকে চাবিটি নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি উসমানকে পুনরায় ডেকে অতীতের সেই ঘটনার কথা স্মরন করিয়ে দেন। উসমান তখন বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল।'

আজও কা'বার চাবি মক্কার শাইবী গোত্রের লোকের হাতে বিদ্যমান। এই শাইবী গোত্র হযরত উসমান ইবন তালহার (রা) চাচাতো ভাই শাইবা ইবন উসমান ইবন আবী তালহার বংশধর। এই শাইবা ইবন উসমান হুনাইন যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা উসমান ইবন আবী তালহা উহুদ যুদ্ধে কাফির অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়। আর তাঁর মা উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুসয়াব ইবন উমাইরের বোন উম্মু জামীল হিন্দা বিনতু 'উমাইর। ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর একটি বর্ণনা মতে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার চাবিটি শাইবা ও উসমান উভয়ের হাতে এক সাথে অর্পন করেন। চাবিটি তখন উসমান ইবন তালহা ইবন আবী-তালহার হাতে থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর উসমানের চাচাতো ভাই শাইবা ইবন 'উসমান ইবন আবী তালহা গ্রহণ করেন। তখন থেকে তাঁর অধঃস্তন পুরুষদের হাতে কা'বার চাবি বিদ্যমান। (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃঃ ৩০৫)

মক্কা বিজয়ের পর হযরত উসমান ইবন তালহা মদীনায় চলে যান এবং রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর কা'বার চাবি রক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য আবার মক্কায় ফিরে যান এবং এখানে হিজরী ৪২ সনে ইনতিকাল করেন। অবশ্য অন্য একটি বর্ননা মতে তিনি খলীফা হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালের প্রথম দিকে আজনাদাইনের যুদ্ধে শাহাদাত বরন করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১ টীকা-৩, পৃঃ ৪৭০)

হযরত উসমান ইবন তালহার শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও উন্নত নৈতিকতার প্রমান পাওয়া যায় হযরত উম্মু সালামার হিজরাতের ঘটনার মধ্যে। হযরত উম্মু সালামা তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আল্লাহর কসম, তাঁর চেয়ে অধিকতর কোন ভদ্র লোক আমি আরবে আর কখনও দেখিনি। যখন তিনি আমাকে সংগে নিয়ে কোন মানযিলে পৌঁছতেন, আমার নামার জন্য উট বসিয়ে দূরে সরে যেতেন। আমি উটের হাওদা থেকে নেমে একটু দূরে সরে গেলে তিনি আবার ফিরে এসে উটটি গাছের সাথে বাঁধতেন এবং আমার নিকট থেকে একটু দূরে কোন গাছের তলায় শুয়ে পড়তেন। আবার যাত্রার সময় হলে উট প্রস্তুত করে আমার কাছাকাছি নিয়ে এসে তিনি সরে যেতেন এবং বলতেন; উটে আরোহন কর। আমি উটের পিঠে ঠিকমত বসার পর তিনি ফিরে আসতেন এবং লাগামটি ধরে নিয়ে চলা শুরু করতেন। এভাবে তিনি আমাকে মদীনায় পৌঁছে দেন"। (সীবাতু ইবন হিশাম—১/৪৬৯-৭০) হোয়াতুস সাহাবা-১/৩৫৮-৩৫৯) এই ছিল হযরত উসমান ইবন তালহার (রা) ইসলাম পূর্ব জীবনের নৈতিকতার বাস্তব রূপ।

হাজ্জাজ ইবন ইলাত (রা)

নাম হাজ্জাজ, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু কিলাব, মতান্তরে আবু মুহাম্মাদ ও আবু আবদুল্লাহ। পিতা ইলাত ইবন খালিদ। বনী সুলাইম গোত্রের সন্তান।

ইবন সা'দ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খাইবারে তখন তিনি তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। ইবন শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত সত্য বলে স্বীকার করে তাঁর কাছে লোক পাঠান। (আল-ইসাবা-১/৩১৩) তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ কাহিনী ইতিহাসে দেখা যায়। ইবন আব আদ-দুনিয়া 'হাওয়াতিফুল জিন' গ্রন্থে এবং ইবন আসাকির ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ হাজ্জাজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ছিল এমন। তিনি একটি কাফিলার সাথে মক্কায় যাচ্ছেন। একটি নির্জন ভীতিজনক উপত্যকায় রাত হলে তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হাজ্জাজের সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে অনুরোধ করে বলে! আবু কিলাব, তুমি রাত জেগে বসে বসে তোমার নিজের ও সঙ্গীদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করতে থাক। হাজ্জাজ পাহারাদারির দায়িত্ব নিয়ে জেগে জেগে নিম্নোক্ত কথাগুলি জপতে থাকেনঃ

'উয়িজু নাফসী ওয়া উয়িজু সাহবী,
মিন কুল্লি জিন্নিয়্যিন বিহাজান নাকবি,
হাত্তা আউবা সালেমান ওয়া রাকবী।'

"আমি আমার নিজের ও আমার সঙ্গীদের জন্য পানাহ চাই, এই গিরিপথের সকল জিন থেকে, যাতে আমি ও আমার কাফিলা নিরাপদে ফিরে যেতে পারি।"

তিনি উপরোক্ত কথাগুলি জপছেন। এমন সময় অদৃশ্য থেকে কারও কণ্ঠে কুরআনের নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনতে পানঃ

> 'ওহে জিন ও মানব জাতি! আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর! কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ছাড়া।' (সূরা আর রাহমান-৩৩)

তাঁরা মক্কায় পৌঁছে কুরাইশদের মজলিসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। কুরাইশরা বলেঃ আবু কিলাব, তুমিও তো দেখছি বে-দ্বীন হয়ে গিয়েছ। এতো সেই বাণী যা মুহাম্মাদের ধারণা মতে তার ওপর নাযিল হয়। জবাবে হাজ্জাজ বলেনঃ আল্লাহর কসম, আমি ও আমার সঙ্গীরা এ বাণীই শুনতে পেয়েছি। তাদের এ আলোচনার মাঝখানে 'আসী ইবন ওয়ায়িল উপস্থিত হয়। লোকেরা তাকে বলেঃ আবু হিশাম, এই আবু কিলাব কি বলছে, শুনেছ? বিষয়টি সে জানতে চাইলে লোকেরা তাকে অবহিত করে। সবকিছু শুনে সে বলেঃ এতে অবাক হওয়ার কি আছে? তারা যার কাছ থেকে শুনেছে, সে-ই মুহাম্মাদের ওপর ভর করে তার মুখ দিয়ে বলে থাকে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৭৬-৭৭, আল-ইসতিয়াব) এই ঘটনার পর তিনি খাইবার, মতান্তরে মদীনায় গিয়ে ইসলামের ঘোষণা দেন।

হাজ্জাজের সহধর্মীণী তখনও মক্কায় বসবাস করেন। তাঁর সকল সম্পদও সেখানে। ইসলাম গ্রহণের পর এসব সহায়-সম্পদ মদীনায় সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। অন্যথায় তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা কুরাইশরা জানতে পেলে সব হাতিয়ে নেবে। তাঁর সম্পর্কে মক্কাবাসী পৌত্তলিকরাও সন্দিহান ছিল। তাঁর অর্থ-সম্পদ সহজে মক্কা থেকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভবও ছিল না। এ কারণে হাজ্জাজ মক্কা গিয়ে গুজব ছড়িয়ে দেন যে, খাইবারে মুহাম্মাদ (সা) পরাজিত হয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে খবরটি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কার মুশরিকদের এভাবে খুশী করে তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদের (সা) সকল আসবাবপত্র বিক্রি হচ্ছে। আমার বাসনা, অন্য ব্যবসায়ীদের পৌঁছার পূর্বেই আমি সেগুলি খরীদ করি। মক্কার বিভিন্ন লোকের নিকট আমার বহু অর্থ-কড়ি পাওনা আছে। তোমরা একটু চেষ্টা করলে সহজে আদায় হতে পারে। মক্কাবাসীরা এই ভাল কাজটির জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেল। তারা চেষ্টা তদবীর করে তাঁর পাওনা অর্থ আদায় করে দিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিত চাচা হযরত 'আব্বাস (রা) তখন মক্কায়। তিনি নিজের বাড়ীতে বসে সবকিছু শুনছেন। তিনি এত ব্যথা পেলেন যে, খবরের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য ঘর থেকেও বের হলেন না। তিনি একটি ছেলের মাধ্যমে হাজ্জাজকে ডেকে পাঠালেন। হাজ্জাজ গেলেন এবং 'আব্বাসকে (রা) আসল কথা খুলে বললেন। তিনি বললেনঃ আমার বকেয়া আদায়ের জন্য আমি একথা ছড়িয়েছি। আমি নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। মক্কাবাসীরা জানতে পেলে আমার প্রাপ্য এক কপর্দকও দেবে না। আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (সা) নিরাপদেই আছেন। খাইবারে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) খাইবারের নেতা হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যাকে বিয়ে করে তাঁর সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করছেন। আমি কুরাইশদের ক্ষমতার আওতা থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই গোপন তথ্য কারও নিকট প্রকাশ করবেন না।

অঙ্গিকার অনুযায়ী হযরত 'আব্বাস (রা) তিনদিন সম্পূর্ণ চুপ থাকলেন। চতুর্থ দিন যখন নিশ্চিত হলেন যে, হাজ্জাজ মক্কাবাসীদের নাগালের বাইরে চলে গেছে, তখন তিনি পোশাক পাল্টে হাজ্জাজের বাড়ী গেলেন এবং তার স্ত্রীর নিকট আসল ঘটনা প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি কা'বার চত্বরে আসলেন। সেখানে আগে থেকে এই বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তিনি লোকদের বললেনঃ মুহাম্মাদ (সা) খাইবার জয় করেছেন এবং হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যা এখন তাঁর স্ত্রী। বনী আবী হাকীক তথা ইয়াসরিবের নেতৃবৃন্দের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হাজ্জাজ তোমাদের ধোকা দিয়ে তার অর্থ-সম্পদ নিয়ে চম্পট দিয়েছে। লোকেরা প্রশ্ন করলো, আপনি কার কাছে এসব কথা শুনলেন? বললোঃ হাজ্জাজের কাছে। লোকেরা হাজ্জাজের স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনিও সমর্থন করলেন। পঞ্চম দিনে মদীনা থেকেও খবর এসে গেল। কিন্তু এখন তাদের করণীয় কিছুই নেই। শিকার তাদের নাগালের বাইরে। তারা চুপ হয়ে গেল। (ইবন সাদ ৪/২, পৃঃ ১৪-১৫)

খাইবার যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পূর্বে হাজ্জাজ ইসলাম গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধেই তিনি সর্বপ্রথম মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি মদীনার বাইরে ছিলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠান। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে বনী সুলাইমের পথে মক্কায় প্রবেশ করেন। এই বাহিনীতে 'আব্বাস ইবন মিরদাস, খুফাফ ইবন নুদবাহ ও হাজ্জাজ ইবন 'ইলাত— এ তিনজন তিনটি পতাকা বহন করেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/১৬৭)

হাজ্জাজ ছিলেন ধনী ব্যক্তি। তিনি মক্কা থেকে তাঁর সকল সম্পদ সরিয়ে আনতেও সক্ষম হয়েছিলেন। মদীনায় তিনি নিজের জন্য একটি বাড়ী ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। (আল ইসাবা—১/৩২৭)

তাঁর মৃত্যুকাল সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা আছে। একটি মতে তিনি হযরত 'উমার ফারুকের (রা) খিলাফতকালের প্রথম দিকে মৃত্যুবরণ করেন। আর অন্য একটি মতে তিনি হযরত 'আলী (রা) ও 'আয়িশার (রা) মধ্যে সংঘটিত উটের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। প্রথম বর্ণনাটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। উটের যুদ্ধে হাজ্জাজ নন বরং তাঁর ছেলে শহীদ হন।

কুদামাহ্ ইবন মাজ'উন (রা)

নাম কুদামাহ্, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু 'উমার। পিতা মাজ'উন ইবন হাবীব এবং মা সুখাইলা বিনতুল আনবাস। (টীকা ঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫৩) কুরাইশ বংশের বনী জুমাহ্ শাখার সন্তান। হযরত 'উমারের বোন সাফিয়্যা বিনতুল খাত্তাব তাঁর স্ত্রী।

হযরত কুদামাহ্ ইসলামের সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) আহবানে যে সকল ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন 'উসমান ইবন মাজ'উন ও তাঁর অন্য দুই ভাই কুদামাহ্ ও আবদুল্লাহ্ অন্যতম। তিনি দুই হিজরাতের অধিকারী। ইসলাম গ্রহণের পর অন্য দুই ভায়ের সাথে প্রথমে তিনি হাবশায় হিজরাত করেন। অতঃপর মক্কাবাসীরা সকলে ইসলামের দীক্ষা নিয়েছে এমন একটি মিথ্যা গুজব শুনে অনেকে হাবশা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে কুদামাহ্ও ছিলেন। সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৬৭)

হযরত কুদামাহ্ হাবশা থেকে ফিরে মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। বদর যুদ্ধের পূর্বে আবার মদীনায় হিজরাত করেন এবং বদরে যোগদান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তারপর উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

খলীফা হযরত 'উমার (রা) কুদামাহ্কে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালেই তিনি মদ পানের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং তাঁর ওপর মদ পানের নির্ধারিত শাস্তি বা 'হদ' জারি করা হয়। তিনি হযরত 'উমারের সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করেননি এবং একজন বদরী সাহাবী হিসাবে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন বিশ্বাসযোগ্য হলেও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে হযরত 'উমারের নিকট তাঁর অপরাধ প্রমাণ হয়ে যায়। এজন্য খলীফা তাঁর ওপর 'হদ' জারি করেন। ঘটনার বর্ণনায় জানা যায়, একবার বনু আবদি কায়সের সরদার 'জারূদ' খলীফা 'উমারের নিকট উপস্থিত হয়ে কুদামাহ্র বিরুদ্ধে মদ পানের অভিযোগ দায়ির করেন। খলীফা জারূদকে বললেন, তুমি ছাড়া এ ঘটনার আর কোন সাক্ষী আছে কি ? জারূদ হযরত আবু হুরাইরাকে (রা) সাক্ষী মানলেন। উমার (রা) আবু হুরাইরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। আবু হুরাইরা বললেন, তিনি কুদামাহ্কে কখনও মদ পান করতে দেখেননি, তবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বমি করতে দেখেছেন। উমার (রা) বললেন, শুধু এ সাক্ষ্যে অপরাধ প্রমাণ হয় না। আরও অনুসন্ধানের জন্য তিনি কুদামাহ্কে বাহরাইন থেকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। কুদামাহ্ মদীনায় পৌঁছলেন। জারূদ আবারও খলীফার নিকট তাঁর ওপর 'হদ' জারি করার দাবী জানালো। উমার (রা) তাঁকে বললেন, তুমি সাক্ষী না বাদী ? জারূদ বললো, সাক্ষী। খলীফা বললেন, তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করেছ, এখন চুপ থাক। অতঃপর জারূদ আবারও খলীফার নিকট 'হদ' জারির তাকিদ দিল। তার এই বাড়াবাড়ির কারণে হযরত উমারের মনে সন্দেহ দেখা দিল। তিনি জারূদকে বললেন ঃ তোমার জিহ্বা সংযত রাখ, অন্যথায় তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যুত্তরে জারূদ খলীফাকে বললো, 'উমার, আপনার চাচাতো ভাই মদ পান করেছে আর আপনি উল্টো আমাকে শাসাচ্ছেন—এ তো কোন ইনসাফের কথা নয়।

এ পর্যায়ে হযরত আবু হুরাইরা (রা) খলীফাকে বললেন, ইয়া আমীরাল মু'মিনীন, আমাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে আপনি সংশয় পোষণ করলে কুদামাহ্র স্ত্রী তথা ওয়ালীদের মেয়ে হিন্দাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। 'উমার (রা) তাকে ডেকে পাঠান। তিনিও স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। (আল-ইসাবা-৩/২২৮)

এবার 'উমারের (রা) 'আদল ও ইনসাফ বা সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা উথলে উঠলো। তিনি কুদামাহকে বললেন, কুদামাহ্, শাস্তি গ্রহণের জন্য তৈরী হয়ে যাও। জবাবে কুদামাহ্ বললেন, তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী যদি ধরেও নেওয়া যায় আমি মদ পান করেছি, তবুও আমার ওপর 'হদ' জারি করার কোন অধিকার আপনার নেই। 'উমার (রা) প্রশ্ন করলেন, কেন? কুদামাহ্ পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদাহ্র ১১ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনান। আল্লাহ বলছেনঃ 'যারা ঈমান এনেছে এবং 'আমলে সালেহ বা সৎকাজ করেছে, তারা যা খেয়েছে তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই। যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে।'

(সূরা মায়িদাহ্- ১১)

উমার (রা) বললেন, কুদামাহ্, তুমি আয়াতটির অর্থ বিকৃত করছো। তুমি আল্লাহকে ভয় করলে অবশ্যই হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকতে। হযরত কুদামাহ্ তখন অসুস্থ ছিলেন। এ কারণে খলীফা অন্যান্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে কিছুদিনের জন্য 'হদ' জারি বা শাস্তিদান মুলতবী রাখেন। কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর 'হদ' মুলতবী রাখা উমারের জন্য ছিল অসহনীয়। তিনি দ্বিতীয়বার সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। এবারও সকলে 'হদ' মুলতবী রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু খলীফা উমার (রা) বললেনঃ আমি আল্লাহর সাথে মিলিত হই, আর তার বোঝা আমার কাঁধে চাপুক, এ অবস্থার চেয়ে সে চাবুকের নীচে মৃত্যুবরণ করুক—এটাই আমার অধিক কাম্য। তিনি আর দেরী করলেন না। কুদামাহ্র অসুস্থতার মধ্যেই তার ওপর হদ জারি করেন এবং তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পর দু'জন আবার একসাথে হজ্জ আদায় করেন। মদীনায় ফেরার পথে উমার (রা) এক স্থানে ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে কুদামাহ্র সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার নির্দেশ লাভ করেন। ঘুম থেকে জেগেই তিনি কুদামাহ্কে ডেকে পাঠান। কিন্তু কুদামাহ্ আসতে অস্বীকৃতি জানান। উমার (রা) দ্বিতীয়বার লোক পাঠিয়ে বলেন, স্বেচ্ছায় না এলে জোর করে ধরে আনা হবে। কুদামাহ্ আসলেন। খলীফাই প্রথম আলোচনার সূচনা করলেন। অতঃপর দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর একমাত্র কুদামাহ্ ছাড়া আর কোন বদরী সাহাবী মদ পানের অভিযোগে সাজা প্রাপ্ত হননি। (আল-ইসাবা-৩/২২৯)

হযরত কুদামাহ্র (রা) মৃত্যুসন সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। প্রসিদ্ধ মতে তিনি হযরত আলীর (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৩৬ সনে ৬৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। অন্য একটি মতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ৫৬।

হিশাম ইবনুল 'আস (রা)

নাম হিশাম, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবুল 'আস ও আবু মুতী'। ইবন হিব্বান বলেনঃ জাহিলী যুগে হিশামের কুনিয়াত ছিল আবুল 'আস অর্থাৎ অবাধ্যের পিতা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তা পরিবর্তন করে রাখেন আবু মুতী'—অনুগতের পিতা। (আল-ইসাবা-২/৬০৪) তাঁর পিতা আল-'আস ইবন ওয়ায়িল। কুরাইশ গোত্রের বনী সাহ্‌ম শাখার সন্তান। মিসর বিজয়ী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আমর ইবনুল 'আসের ছোট ভাই।

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বয়সের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে না। হিশাম 'আমর অপেক্ষা ছোট হলেও বড় ভাইয়ের চেয়ে অধিকতর সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। 'আমর যখন পৌত্তলিকতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছেন, হিশামের ললাটে তখন ইসলামের নূর ঝলক দিচ্ছে। মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের সূচনাপর্বেই তিনি তা কবুল করেন এবং মক্কাবাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুহাজিরদের একটি কাফিলার সাথে হাবশায় চলে যান। কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর এই মিথ্যা গুজব শুনেন যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম কবুল করেছে, তখন অনেকের সাথে তিনিও মক্কায় ফিরে আসেন। এখান থেকে আবার মদীনায় হিজরাতের পরিকল্পনা করেন; কিন্তু তাঁর পিতা ও খান্দানের লোকদের হাতে বন্দী হন। এ সম্পর্কে 'উমার ইবনুল খাত্তাবের বর্ণনা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি বলেনঃ

"আমরা মদীনায় হিজরাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমি, 'আইয়াশ ইবন রাবী'য়া ও হিশাম ইবনুল 'আস—এ তিনজন মক্কা থেকে ছয় মাইল দূরে 'তানদুব' উপত্যকায় বনী গিফারের 'উদাত' নামক কূপের নিকট এই অঙ্গীকার করলাম আমাদের প্রত্যেকেই আগামীকাল সকালে এখানে উপস্থিত হবে। কেউ ব্যর্থ হলে অবশ্যই সে বন্দী হবে। আমি ও 'আইয়াশ সময়মত হাজির হলাম; কিন্তু হিশাম বন্দী হয়ে অত্যাচারিত হলো। আমরা মদীনায় পৌঁছে কুবার বনী 'আমর ইবন 'আওফের অতিথি হলাম। এদিকে 'আইয়াশকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আবু জাহল ইবন হিশাম ও হারিস ইবন হিশাম মদীনায় এলো। তারা দু'জন ছিল 'আইয়াশের চাচাতো ভাই এবং সকলেই একই মায়ের সন্তান। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মক্কায়।

তারা 'আইয়াশকে বললো, তোমার মা শপথ করেছে, তোমাকে না দেখে চুলে চিরুণী দেবে না, রোদ থেকে ছায়াতেও যাবে না। তুমি ফিরে চল। 'আইয়াশের অন্তর মায়ের জন্য নরম হয়ে গেল। 'উমার' বলেনঃ আমি তাকে বার বার অনুরোধ করলাম তাদের সাথে ফিরে না যাওয়ার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'আইয়াশ তাদের সাথে মক্কার দিকে যাত্রা করলো। কিছু দূর যাওয়ার পর তারা 'আইয়াশকে বেঁধে ফেলে এবং অত্যাচার করতে করতে মক্কায় নিয়ে যায়। সেখানে তাকে বন্দী করে রাখা হয়।

'উমার বলেন, আমরা তখন মদীনায় বলাবলি করতাম যারা এভাবে নিজেদেরকে বিপদের সম্মুখীন করেছে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসলেন এবং কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলোঃ

বল, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

'উমার বলেনঃ আমি আয়াতটি লিখে গোপনে মক্কায় হিশামের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। হিশাম বলেন, আমি সে আয়াতটি মক্কার 'যী-তুওয়া' নামক স্থানে বসে পাঠ করতাম; কিন্তু কিছুই বুঝতাম

না। অবশেষে তা বুঝার তাওফীক দানের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম। তারপর আমি বুঝলাম, এ আয়াত আমাদের শানে নাযিল হয়েছে। অতঃপর আমি মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলাম।

(হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৫-৩৪৬, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৭৪—৪৭৬, আল-ইসাবা-৩/৬০৪)

ইবন হিশাম বলেন। আমার বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মদীনায় একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ 'আইয়াশ ইবন রাবী'য়া ও হিশাম ইবনুল 'আসের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কে আমাকে সাহায্য করতে পারে? ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাদের ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করবো। অতঃপর তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। গোপনে মক্কায় প্রবেশ করে তিনি এক মহিলাকে দেখলেন, খাবার নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আল্লাহর বান্দী, কোথায় যাচ্ছ? সে বললোঃ আমি যাচ্ছি এই দুই বন্দীর কাছে। অর্থাৎ 'আইয়াশ ও হিশামের কাছে। ওয়ালীদ মহিলাকে অনুসরণ করে বন্দীশালাটি চিনে নিলেন। তাদেরকে একটি ছাদবিহীন ঘরে বেঁধে রাখা হয়েছিল। যখন রাত হলো, ওয়ালীদ দেওয়াল টপকে তাঁদের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং একটি পাথরের সাহায্যে তাঁদের বাঁধন কেটে দিলেন। তারপর তিনজন একসাথে বেরিয়ে ওয়ালীদের উটে সওয়ার হয়ে মদীনায় পালিয়ে আসেন। তাঁদের একমাত্র বাহন উটটি হোঁচট খেলে ওয়ালীদের একটি আংগুল আহত হয়ে রক্ত-রঞ্জিত হয়। তিনি স্বীয় অঙ্গুলিকে উদ্দেশ্য করে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেনঃ

"হাল আন্‌তি ইল্লা উসবুয়িন দামাইতি
ওয়া ফী সাবীলিল্লাহি মা লাকীতি।"

"ওহে, তুমি একটি অঙ্গুলি ছাড়া আর তো কিছু নও, যা রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। তোমার যা কিছু হয়েছে, তাতো আল্লাহর রাস্তায়।"

(সীরাতু ইবন হিশাম—১/৪৭৬)

বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ মক্কায় হিশামের বন্দী দশায় শেষ হয়। খন্দক যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় আসেন। খন্দকের পর কাফিরদের সাথে যতগুলি যুদ্ধ হয়েছে, সবগুলিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ওয়াকিদী বলেনঃ মক্কা বিজয়ের পূর্বে রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) হিশামকে এক অভিযানে পাঠান।

(আল-ইসাবা-৩/৬০৪)

সেনা পরিচালনা, বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন—এসব ছিল হিশামের খান্দানের বিশেষ বৈশিষ্ট। এ পরিবারের সন্তানেরা তরবারির ছায়াতলেই বেড়ে ওঠতো। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে তাঁর এ বৈশিষ্টের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় জানা যায়, প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে নুঈম ইবন 'আবদুল্লাহ ও অন্য কতিপয় ব্যক্তির সাথে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে ইসলামের দা'ওয়াত দানের জন্য তার দরবারে পাঠান। এ প্রসঙ্গে হিশাম বলেনঃ কয়েক ব্যক্তির সাথে আমাকে হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠানো হয়। আমরা 'গুতা' বা দিমাশকে পৌঁছে জাবালা ইবন আয়হাম আল-গাস্‌সানীর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। আমাদের সাথে কথা বলার জন্য তিনি একজন দূত পাঠালেন। আমরা বললামঃ আমাদেরকে সম্রাটের কাছে পাঠানো হয়েছে, আমরা কোন দূতের সাথে কথা বলবো না। অনুমতি দিলে আমরা তাঁরই সাথে কথা বলবো। অবশেষে জাবালা আমাদেরকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

জাবালা আমাদেরকে বললেনঃ আপনাদের বক্তব্য কী? হিশাম বলেন, আমি তাঁর সামনে ইসলামের দা'ওয়াত তুলে ধরি। তখন তাঁর ও সভাষদবৃন্দের পরিধানে ছিল কালো পোশাক। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের পরিধানে এ পোশাক কেন? তিনি বললেনঃ আমরা এ পোশাক

পরেছি এবং শপথ করেছি, শাম থেকে তোমাদের তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এগুলি খুলবো না। আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম ! আপনার এই সিংহাসন এবং আপনাদের সম্রাটের সাম্রাজ্য ইন্‌শাআল্লাহ আমরা ছিনিয়ে নেব। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা) এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। জাবালা বললেন ঃ আপনারা নন ; বরং তাঁরাই এর উপযুক্ত যাঁরা দিনে সিয়াম সাধনা করে এবং রাতে 'ইবাদাতে দণ্ডায়মান থাকে। আপনাদের সিয়াম কেমন ?' আমি আমাদের সিয়ামের পরিচিতি তুলে ধরলাম। তখন জাবালার চেহারা কালো হয়ে গেল। অতঃপর তিনি একজন দূতসহ আমাদেরকে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

হিশাম বলেন ঃ আমরা দূতের সাথে চলতে লাগলাম। যখন আমরা নগরের নিকটবর্তী হলাম, আমাদের সাথের দূতটি বললো ঃ আপনাদের এই সওয়ারী পশু সম্রাটের নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। আপনারা চাইলে আমি আপনাদের জন্য তুর্কী ঘোড়া ও খচ্চরের ব্যবস্থা করতে পারবো। আমরা বললাম ঃ আমাদের এই পশুর ওপর সওয়ার হওয়া ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় আমরা শহরে প্রবেশ করবো না। আমাদের অনমনীয়তার কথা সম্রাটকে জানানো হলে তিনি আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে সম্রাটের কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম।

এভাবে হিশাম ইবনুল 'আস ও তাঁর সঙ্গীরা যখন রাজ দরবারের বাইরে নিজ নিজ পশুর পিঠ থেকে নামছিলেন তখন সম্রাট তাদেরকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তারা যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করছিলেন, বাতাসে আন্দোলিত খেজুর গাছের পাতার মত তারা কাঁপছিল। সম্রাট লোক মারফত তাদের জানিয়ে দেন যে, এভাবে জোরে জোরে দ্বীন প্রচারের অধিকার তাঁদের নেই। তাঁরা সম্রাটের কাছে গেলেন।

সম্রাট সিংহাসনে এবং রোমান সমরবিশারদরা নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। সম্রাট হাসিমুখে তাদের বললেন ঃ আপনারা নিজেদের মধ্যে যেভাবে সালাম ও সম্ভাষণ বিনিময় করেন, সেইভাবে আমাকে সম্ভাষণ জানালেন না কেন ? সম্রাটের পাশেই বসা ছিল একজন প্রাঞ্জল আরবী ভাষী। তাঁরা বললেন ঃ আমাদের সম্ভাষণ আপনার জন্য বৈধ নয় ; আর আপনাদের সম্ভাষণও আমাদের মুখে উচ্চারণ আমাদের জন্য উচিত নয়। সম্রাট প্রশ্ন করলেন ঃ আপনারা নিজেদের মধ্যে এবং আপনাদের বাদশাহ্‌কে কিভাবে সম্ভাষণ জানান ? তাঁরা বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকা। সম্রাট আবার প্রশ্ন করেন ঃ আপনাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য কি ? তাঁরা বলেন ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবর—আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর তাঁরা সম্রাটের নিকট দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় যথা—সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির পচিয় তুলে ধরেন।

এই প্রতিনিধিদল সম্রাটের অতিথি হিসাবে তিন দিন তাঁর নিকট অবস্থান করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে এই দাওয়াতী মিশনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। (আল-ইসাবা—২/৪৭১, হায়াতুস সাহাবা-১/২০৪, ৪০৫, ৩/৫৫৭—৫৬২) অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে তাবলীগী মিশন নিয়ে যিনি গিয়েছিলেন তিনি এ হিশাম নন, তিনি অন্য আর এক হিশাম।

(আল-ইসাবা—৩/৭০৪)

খলীফা হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে দু'একটি সংঘর্ষের পর রোমানরা আজনাদাইনে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। হিজরী ১৩ সনের জুমাদা আল-উলা মাসে সংঘর্ষ শুরু হয়। ওয়াকিদী উম্মু বকর বিনতুল মিসওয়ারের সূত্রে উল্লেখ করেছেন ঃ এ যুদ্ধে হিশাম যখন কিছু মুসলিম সৈনিকের মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি লক্ষ্য করলেন, স্বীয় মুখাবরণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শত্রু ব্যূহের মাঝ বরাবর এগিয়ে গেলেন এবং চিৎকার করে বলতে থাকলেন ঃ ওহে মুসলিম সৈনিকবৃন্দ, আমি হিশাম ইবনুল 'আস। তোমরা আমার সাথে এস। তোমরা জান্নাত থেকে পালাচ্ছ ?

এই খাত্‌নাবিহীন লোকেরা তোমাদের তরবারির সামনে টিকে থাকতে পারে না।' হিশামের সাথে যোগ দিয়ে মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। রোমান বাহিনী একটি সংকীর্ণ পথের মুখে জমা হয়। পথের বিপরীত দিক থেকে হিশাম আক্রমণ চালান। রোমানরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে এবং তাঁর লাশের ওপর দিয়ে পালিয়ে যায়। মুসলিম সৈন্যরা সেখানে পৌঁছে তাঁর পেষা লাশটি পদদলিত হওয়ার ভয়ে শত্রু বাহিনীর পিছু ধাওয়া করতে ইতস্ততঃ করতে লাগলো। তখন তাঁর বড় ভাই 'আমর (রা) এসে বললেনঃ ওহে লোক সকল, আল্লাহ্ তাকে শাহাদাত দান করেছেন, তার রূহটি উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তার দেহটি এখানে পড়ে আছে। অতঃপর মুসলিম সৈন্যরা তাঁর লাশের ওপর দিয়ে সংকীর্ণ পথটি অতিক্রম করে শত্রু বাহিনীর পিছু ধাওয়া করে। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) সেই ছড়ানো-ছিটানো লাশ একত্রিত করে দাফন করেন। (আল-ইসাবা—৩/৬০৪) তবে ইবনুল মুবারকের মতে, তিনি খলীফা উমারের যুগে ইয়ারমুক যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

(আল-ইসতীয়াব, টীকা-আল-ইসাবা-৩/৫৯৩-৫৯৫)

হিশাম ইবনুল 'আস তাঁর ভাই 'আমর ইবনুল' আস অপেক্ষা বয়সে ছোট হলেও বড় ভাইয়ের চেয়ে বেশী নেক্কার ছিলেন। হিশামের শাহাদাতের পর একবার কতিপয় কুরাইশ ব্যক্তি খানায়ে কা'বার পেছনে বসে তাদের দুই ভাইয়ের সম্পর্কে আলোচনা করছিল। এমন সময় তাঁরা 'আমরকে তাওয়াফরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলোঃ আপনাদের দু'জনের মধ্যে কে উত্তম—আপনি না আপনার ভাই হিশাম? তিনি বললেনঃ আমার ও তার পক্ষ থেকে আমি বলছি। তার মা হাশেম ইবনুল মুগীরার মেয়ে, আর আমার মা একজন দাসী। আমাদের পিতা আমার চেয়ে তাকে বেশী ভালোবাসতেন। আর প্রত্যেক পিতার তার সন্তানের ব্যাপারে দূরদৃষ্টির কথা তো তোমাদের জানা আছে। আমরা দু'জন ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করেছি, সব সময় সে আমাকে পরাজিত করেছে। আমি ও সে—দু'জনই যুদ্ধে যোগদান করি এবং সারারাত দু'জনই শাহাদাত লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করি। আল্লাহ্ তার দু'আ কবুল করলেন এবং আমার দু'আ ব্যর্থ হলো। (আল-ইসাবা—১/৬০৪)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের দু'ভাইয়ের ঈমানী দৃঢ়তার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেনঃ "আসের দুই পুত্র হিশাম ও 'আমর মু'মিন।'

হিশামের শাহাদাতের খবর শুনে হযরত 'উমার ফারূক (রা) মন্তব্য করেছিলেনঃ আল্লাহ্ তাঁর ওপর রহমত নাযিল করুন। তিনি ইসলামের একজন উত্তম সেবক ছিলেন।

যূ-শিমালাইন 'উমাইর ইবন 'আবদি 'আমর (রা)

আসল নাম 'উমাইর, ডাকনাম আবূ মুহাম্মাদ, লকব বা উপাধি যূ-শিমালাইন। পিতার নাম 'আবদু 'আমর। খুযা'য়া গোত্রের সন্তান। তিনি সকল কাজ দু'হাত দিয়ে করতেন বলে "যূ-শিমালাইন" দু'খানি দক্ষিণ হস্তের অধিকারী তাঁর উপাধিতে পরিণত হয়।

তাঁর পিতা 'আবদু 'আমর ইবন নাদলা মক্কায় এসে 'আবদ ইবন হারেস ইবন নাদলা ইবন যাহ্‌বার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে থেকে যান। 'আবদ নিজ কন্যা নু'ম বিনতু 'আবদকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। তারই গর্ভে পুত্র যূ-শিমালাইন ও কন্যা রায়তা জন্ম গ্রহণ করেন। (তাবাকাত ইবন সা'দ—৩/১৬৭)

উল্লেখ্য যে, সীরাত গ্রন্থ সমূহে যূ-শিমালাইন অর্থাৎ দু'খানি ডান হাতের অধিকারী এবং যুল ইয়াদাইন বা দু'খানি হাতের অধিকারী এ দু'টি লকব বা উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদ্বয়ের কথা পাওয়া যায়। এ দু'টি উপাধি কি একই ব্যক্তির না ভিন্ন দু'ব্যক্তির এ সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতের অমিল দেখা যায়। অধিকাংশের মতে উপাধি দু'টি একই ব্যক্তির যেমনঃ ইবন সা'দ তার তাবাকাতে শিরোনাম দিয়েছেন "যুল ইয়াদাইন ওয়া ইউকালু যূ-আশ-শিমালাইন" অর্থাৎ যুল-ইয়াদাইন এবং তাঁকেই যু-আশ্-শিমালাইন বলা হয়। (তাবাকাত—৩/১৬৭)

কিন্তু তাঁদের এ মত অনেকের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে মূলতঃ তাঁরা ভিন্ন দু'ব্যক্তি। হাদীসের দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যুল-ইয়াদাইন নামক ব্যক্তির একটি ঘটনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) চার রাক'য়াতের স্থলে দুই রাক'য়াত নামায আদায় করে সালাম ফিরান। সাহাবীরা তো সবাই হতভম্ব। কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না। যুল-ইয়াদাইন ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি কম করে দেওয়া হয়েছে না আপনি ভুল করেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের নিকট তাঁর কথার সত্যতা যাচাই করলেন। সবাই যুল-ইয়াদাইনকে সমর্থন করে বললেনঃ আপনি দুই রাক'য়াতই আদায় করেছেন। সত্যতা যাচাইর পর তিনি বাকী দু'রাক'য়াত আদায়ের শেষে সহু সিজদাহ করেন। (বুখারীঃ আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইমামের সন্দেহ হলে তিনি কি মুকতাদিদের কথা গ্রহণ করবেন?)

উপরোক্ত হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরাইরা (রা)। তিনি হিজরী সপ্তম সনে খাইবার যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্যদিকে যূ-শিমালাইন তাঁর পাঁচ বছর পূর্বে বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। সুতরাং যুল-ইয়াদাইন ও যূ-শিমালাইন একই ব্যক্তি হতে পারেন না। তাছাড়া দু'জনের নামেও পার্থক্য আছে। একজনের নাম 'খিরবাক ও অন্যজনের নাম 'উমাইর। (সিয়ারুস সাহাবা, মুহাজিরীন—২/৩২৭) আবূ 'উমার বলেনঃ বদরে যে যূ-শিমালাইন শহীদ হন তিনি যুল-ইয়াদাইন নন। (আল-ইসাবা—৩/৩৩)

হযরত যূ-শিমালাইন কখন এবং কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায় হিজরাত করে হযরত সা'দ ইবন খাইসামার অতিথি হন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াযীদ ইবন হারেসের সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

ইসলাম গ্রহণের পর খুব বেশী দিন তিনি বাঁচেননি। মদীনায় আসার পর তিনি ও তাঁর দ্বীনি ভাই ইয়াযীদ মহান বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তিনি কাফির আবূ উসামা যুহাইর ইবন মু'য়াবিয়া আল-জুশামীর হাতে শহীদ হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ত্রিশ বছর। তাঁর দ্বীনি ভাই ইয়াযীদও এ যুদ্ধে শহীদ হন।

(তাবাকাতঃ ৩/১৬৮ আনসাবুল আশরাফ—১/২৯৫)

মু'য়াইকিব ইবন আবী ফাতিমা (রা)

মু'য়াইকিব ছিলেন দাওস গোত্রের সন্তান। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি দাসে পরিণত হয়ে মক্কার সাঈদ ইবনুল আসের নিকট উপনীত হন। (আনসাবুল আশরাফ—১/২০০) অন্য একটি বর্ণনা মতে তিনি আয্‌দ গোত্রের সন্তান এবং মক্কার বনী আবদি শামসের হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন।

ইসলামী দাও'য়াতের সূচনা পর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাবশাগামী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। হাবশা থেকে খাইবার যুদ্ধের সময় মদীনায় আসেন। একটি বর্ণনামতে তিনি আবূ মূসা আল আশ'য়ারীর সাথে মক্কা থেকে মদীনায় আসেন এবং খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় তাঁর বদর যুদ্ধ ও বাই'য়াতে রিদওয়ানে যোগদানের কথা পাওয়া যায় এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি খাইবার যুদ্ধের পূর্বে মদীনায় আসেন। তাঁদের মতে তিনি হাবশায় হিজরাত করেননি। তবে ওয়াকিদী বলেন ঃ 'যারা বলে তিনি হাবশায় হিজরাত করেছিলেন, আমি তাদের কাছে শুনেছি, মু'য়াইকিব হাবশা থেকে জা'ফর ইবন আবী তালিবের সাথে সরাসরি মদীনায় চলে যান। (আনসাবুল আশরাফ-১/২০০)

তবে একথা সঠিক যে তিনি খাইবার যুদ্ধের পর মদীনায় আসেন। বদর ও খাইবারে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ইবন সা'দও তাঁকে ঐ সকল সাহাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন যাঁরা সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণ করলেও বদরে যোগদানের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

হযরত রাসূলে কারীমের জীবদ্দশায় নবুওয়াতের 'খাতাম' বা মোহর তাঁরই দায়িত্বে থাকতো। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর ও হযরত উমার (রা) তাঁকে বিশেষ সম্মান দেখাতেন। উপরোক্ত দু'জনের খিলাফতকালে অর্থবিষয়ক সকল কর্মকাণ্ড দেখাশুনা ও বাইতুল মালের রক্ষকের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। শেষ বয়সে তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। খলীফা তাঁর চিকিৎসার সব রকম চেষ্টা করেন। কোথাও কোন ভালো চিকিৎসকের সন্ধান পেলে তাঁদেরকে ডেকে তিনি তাঁর চিকিৎসা করাতেন। কিন্তু কোন উপকার হয়নি। তবে ভবিষ্যতে আরও বেড়ে যাওয়ার আশংকা দূর হয়। মানুষ সাধারণতঃ কুষ্ঠ রোগীদের সাথে ওঠা-বসা ও পানাহার পরিহার করে চলে ; কিন্তু হযরত 'উমার তাঁকে সংগে নিয়ে একই দস্তরখানে খেতে বসতেন।

একবার খলীফা 'উমার (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের রাতের খাবার দেওয়া হলো। খলীফা ঘর থেকে বেরিয়ে মু'য়াইকিব ইবন আবী ফাতিমাকে তাঁদের সাথে খাবারের জন্য ডাকলেন। উপস্থিত লোকেরা ভীত হয়ে পড়লো। 'উমার (রা) মু'য়াইকিবকে বললেন ঃ 'তুমি আমার কাছে বস। আল্লাহর কসম, তোমার ছাড়া এ রোগ অন্য কারও হলে আমি তার সাথে এক থালায় খেতাম না। তুমি তোমার দিক থেকে খুশীমত খাও। মু'য়াইকিব তাঁদের সাথে বসে এক থালায় আহার করেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৫৮) অন্য একটি বর্ণনামতে 'উমার বলেন ঃ 'সে যদি রাসূলুল্লাহর সাহাবী না হতো, আমি তার সাথে খেতাম না।' (আনসাবুল আশরাফ-১/২০০)

খলীফা হযরত 'উমারের (রা) পর খলীফা হযরত 'উসমান (রা) তাঁর প্রতি একই রকম আচরণ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মোহর শেষ পর্যন্ত তাঁরই জিম্মায় ছিল। এ মোহরটি তাঁরই হাত থেকে 'বীরে মা'উনা'— বা মা'উনা নামক কূপে পড়ে যায়। যে বছর মোহরটি পড়ে যায় সেই বছরের শেষ দিকে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। বালাজুরী বলেন ঃ খলীফা উসমানের যুগে যে বছর

আফ্রিকা অভিযান চালানো হয় সেই বছর তিনি ইনতিকাল করেন। (আনসাবুল আশরাফ—১/২০০) ইতিহাসে মুহাম্মাদ ইবন মু'য়াইকিব নামে তাঁর এক পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি তাঁর পিতা মু'য়াইকিব থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি এমন কোন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন না। তবে লেখা-পড়ায় তাঁর দক্ষতা ছিল। হযরত 'উমার (রা) যখন নিজের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন তখন সেই ওয়াক্‌ফনামাটি মু'য়াইকিব রচনা করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। হাদীস গ্রন্থসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত বেশ কিছু হাদীস পাওয়া যায়। তার মধ্যে দু'টি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং একটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আবান ইবন সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা)

হযরত আবানের পিতার নাম আবু উহায়হা সা'ঈদ ইবনুল 'আস এবং মাতার নাম হিন্দা বিন্‌তু মুগীরা। তাঁর বংশের উপরের দিকের পঞ্চম পুরুষ আব্‌দ মান্নাফে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। (উসুদুল গাবা-১/৩৫)

তাঁর পিতা সাঈদ ছিল কুরাইশদের এক মর্যাদাবান ব্যক্তি। সে হিজরী ২য় অথবা ৩য় সনে কাফির অবস্থায় তায়িফে মারা যায় এবং তাকে সেখানেই দাফন করা হয়। (আনসাবুল আশরাফ-১/১৪২, ৩৬৮) তার কয়েকজন সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। ইসলামের সূচনা পর্বেই তাঁদের মধ্যে খালিদ ও 'আমর ইসলাম গ্রহণ করে হাবশায় হিজরাত করেন। আল-ইসাবা—১/১৩) আবান তাঁর অন্য দুই ভাই 'উবাইদা ও আল-আসের সাথে পৌত্তলিক থেকে গেলেন। তাঁর দুই ভাই খালিদ ও 'আমরের ইসলাম গ্রহণে দারুন ব্যথা পান। সে ব্যথার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচিত একটি কাসীদায়। তার একটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ

'হায়! দ্বীনের ক্ষেত্রে 'আমর ও খালিদ যে মিথ্যারোপ করেছে, জারীবার মৃত লোকগুলি যদি তা দেখতো!' (আল-ইসাবা—১/১৩, উসুদুল গাবা-১/৩৫)

আবান তাঁর অন্য দুই ভাইয়ের সাথে মিলে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের বিরোধিতা করতে থাকেন। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে লড়বার জন্য 'উবাইদা ও আল-'আসের সাথে মক্কা থেকে বের হলেন। 'উবাইদা ও আল-'আস মুসলমানদের হাতে শোচনীয়ভাবে নিহত হলো। আবান কোন রকমে প্রাণ নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন।

আবানের ইসলাম পূর্ব জীবন সম্পর্কিত একটি ঘটনার কথা ইবন হিশাম উল্লেখ করেছেন। ইসলাম পূর্ব যুগে রাসূল (সা) তাঁর কয়েকজন কন্যাকে মক্কার কুরাইশ যুবকদের সাথে বিয়ে দেন। কুরাইশদের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) সংঘাত শুরু হলে কুরাইশ নেতারা রাসূলুল্লাহর (সা) জামাতাদের নিকট তাঁর কন্যাদের তালাক দেওয়ার আবেদন জানায়। রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা রুকাইয়্যা ছিলেন 'উতবা ইবন আবী লাহাবের স্ত্রী। কুরাইশরা 'উতবাকে বললো ঃ তুমি মুহাম্মাদের কন্যাকে তালাক দাও। সে এই শর্তে রাজী হলো যে, যদি তারা আবান ইবন সা'ঈদের মেয়ে অথবা সা'ঈদ ইবন আসের মেয়ের সাথে তাকে বিয়ে দিতে পারে তাহলে সে রুকাইয়্যাকে তালাক দেবে। তারা 'উতবার দাবী মেনে নিয়ে সা'ঈদ ইবন আসের মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে রুকাইয়্যাকে তার নিকট থেকে ছাড়িয়ে দেয়। (সীরাতু ইবন হিশাম—১/৬২৫)

হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর পয়গামসহ হযরত উসমানকে (রা) মক্কার কুরাইশদের নিকট পাঠালেন। উসমান (রা) 'বালদাহ' উপত্যকা দিয়ে মক্কার দিকে যাচ্ছেন। কুরাইশরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ কোথায় যাও? 'উসমান তাঁদেরকে সেই কথাই বললেন যা তাঁকে রাসূল (সা) বলে দিয়েছিলেন। এমন সময় আবান ইবন সা'ঈদ কুরাইশদের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে 'উসমানকে স্বাগতম জানালেন। উসমানের সাথে তাঁর আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আবান নিজের ঘোড়াটিকে প্রস্তুত করে তার পিঠে 'উসমানকে উঠালেন এবং তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলেন। অতঃপর আবান 'উসমানকে মক্কায় নিয়ে আসেন। (হায়াতুস সাহাবা—১/১৫৬)

'উসমান আবানের বাড়ীতে আসার পর আবান তাঁকে বলেন ঃ আপনার পোশাকের এ অবস্থা কেন? 'উসমানের জামা ছিল হাঁটু ও গোঁড়ালির মাঝামাঝি পর্যন্ত। আবান আরও বলেন ঃ আপনার

কাওমের লোকদের মত জামা লম্বা করেন না কেন ? 'উসমান বললেন : আমাদের নবী এভাবে জামা পরেন। আবান বলেন : আপনি কা'বা তাওয়াফ করুন। 'উসমান বললেন : আমাদের নবী কোন কাজ না করা পর্যন্ত আমরা তা করতে পারিনা। আমরা শুধু তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকি। (হায়াতুস সাহাবা—২/৩৫৮-৫৯, আল-ইসতীয়াব-৩৫, সীরাতু ইবন হিশাম—২/৩১৫)

আবান যদিও দীর্ঘকাল যাবত ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন, তবুও এ সময় সত্যের সন্ধান থেকে মোটেও বিরত থাকেননি। এ সময় তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তখনকার দিনে শাম বা সিরিয়া ছিল জ্ঞানী-গুনী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কেন্দ্র। ব্যবসার কাজে আবানের সেখানে যাতায়াত ছিল। একবার তিনি সেখানকার এক খৃষ্টান 'রাহিব'কে কথা প্রসঙ্গে বললেন, আমি হিজাযের কুরাইশ গোত্রের সন্তান। এই গোত্রের এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি বলে দাবী করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকেও ঈসা ও মূসার মত নবী করে পাঠিয়েছেন। রাহিব লোকটির নাম জিজ্ঞেস করলেন। আবান বললেন : লোকটির নাম মুহাম্মাদ। রাহিব আসমানী কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী একজন নবীর আত্মপ্রকাশের বয়স, বংশ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর বক্তব্য শুনে আবান বললেন : এগুলির সবই তো সেই লোকটির মধ্যে বিদ্যমান। রাহিব তখন বললেন : আল্লাহর কসম, তাহলে সেই ব্যক্তি সমগ্র আরবের ওপর আধিপত্য বিস্তারের পর সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করবেন। তুমি যখন ফিরে যাবে, আল্লাহর এই নেক বান্দার নিকট আমার সালাম পৌঁছে দেবে। শামের এই রাহিব বা পাদ্রীর নাম 'ইয়াকা'। এবার যখন আবান শাম থেকে ফিরলেন তখন তাঁর পূর্বের রূপ আর নেই। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতার শক্তি তাঁর শেষ হয়ে গেছে। (উসুদুল গাবা ১/৩৫, আল-ইসাবা—১/১৩)

পিতৃ-পুরুষের ধর্মের কথা চিন্তা করে এবং সমবয়সীদের নিন্দা ও বিদ্রূপের কথা ভেবে আবান কিছুদিন সম্পূর্ণ চুপ থাকলেন। কিন্তু সত্যের প্রতি যে আবেগ তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলে, তা তিনি দীর্ঘদিন দমন করে রাখতে সক্ষম হলেন না। এদিকে তাঁর ভাই 'আমর ও খালিদ হাবশা থেকে ফিরে আবানের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন। অতঃপর তিনি খাইবার যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরাত করেন। তাঁরা তিন ভাই একত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে খাইবার অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা—১/১৩)

অন্য একটি বর্ণনা মতে আবান মদীনায় পৌঁছার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর আমীর বানিয়ে তাঁকে নাজদের দিকে পাঠিয়ে দেন। এঅভিযানে সফল হয়ে যখন তিনি মদীনায় ফিরে আসেন তখন খাইবার বিজয় শেষ হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় হাবশার অন্যান্য মুহাজিরদের সংগে করে হযরত আবু হুরাইরা মদীনায় আসেন। তাঁরা দু'জন এক সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান। রাসূল (সা) খাইবারের গনীমতের মাল থেকে কিছু অংশ তাঁদেরকে দেন। নাজদ অভিযান ছাড়াও আরও কিছু ছোট ছোট অভিযানে ইমারাত বা নেতৃত্ব তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে লাভ করেন।

হযরত আবান হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে তায়িফ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তায়িফে আবানের পিতার কবরটি দেখে বলে ওঠেন : এই কবরের অধিবাসীর প্রতি আল্লাহর লানাত বা অভিসম্পাৎ। সে ছিল আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরনকারী। 'আবান ও তাঁর ভাই আমর সাথে সাথে আবু বকরের কথার প্রতিবাদ করে তাঁর পিতা আবু কুহাফার কিছু নিন্দা করেন। তখন রাসূল (সা) বললেন : 'তোমরা মৃতদের গালি দিও না। মৃতদের গালি দিলে জীবিতদের কষ্ট দেওয়া হয়।' (আনসাবুল আশরাফ—১/১৪২, ৩৬৮)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবানকে হযরত 'আলা ইবনুল হাদরামীর স্থলে বাহরাইনের শাসক

নিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের খবর শুনে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। (ইসতী'য়াব—১/৩৫) হযরত আবান রাসূলুল্লাহর (সা) কাতিব বা লেখকের দায়িত্বও পালন করেন। (আনসাবুল আশরাফ—১/৫৩২)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। তাঁর হাতে গণ বাই'য়াত শেষ হওয়ার পরও যে ক'জন কুরাইশ ব্যক্তি কিছু দিন যাবত বাই'য়াত থেকে বিরত থাকেন, আবান তাঁদের একজন। বনী হাশেমের লোকেরা বাই'য়াত গ্রহণ করলে তাঁর আপত্তি দূর হয় এবং তিনি বাই'য়াত করেন।

খলীফা হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহর নিয়োগকৃত কোন শাসক বা কর্মচারীকে অপসারণ করেননি। আবানও ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাসক। আবানকে তাঁর দায়িত্বে ফিরে যাওয়ার জন্য আবু বকর (রা) অনুরোধ করেন। কিন্তু আবান খলীফার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কোন কোন বর্ননায় জানা যায়, খলীফার বার বার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ইয়ামনের শাসন কর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইবন সাদ বর্ননা করেন ; আবান যখন খলীফার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন তখন হযরত উমার একদিন আবানকে বললেন, ইমাম বা নেতার অনুমতি ছাড়া এভাবে কর্মস্থল ত্যাগ করা তো তাঁর উচিত হয়নি। এখন আবার তাঁর নির্দেশে সেখানে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে ? আবান বললেন; আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আমি আর কারও জন্য কাজ করবো না। যদি করতাম তাহলে আবু বকরের মর্যাদা, তাঁর ইসলামে অগ্রগামিতা ইত্যাদি কারণে তাঁর 'আমেল' বা কর্মচারী হতাম। অগত্যা আবু বকর (রা) বাহরাইনে আর কাকে পাঠানো যায় সে বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। 'উসমান (রা) বললেন; যেহেতু তাঁর পূর্বে 'আলা ইবনুল হাদরামী সেখানে ছিলেন, তাই তাঁকেই সেখানে পাঠানো হোক। 'উমার বললেন ; আবানকেই সেখানে আবার যেতে বাধ্য করা হোক। কিন্তু আবু বকর (রা) তা করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন; যে ব্যক্তি বলে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আর কারও জন্য কাজ করবো না তাঁকে আমি বাধ্য করতে পারিনে। অতপর 'আলা ইবনুল হাদরামীকে বাহরাইনের শাসক নিয়োগ করেন। (হায়াতুস সাহাবা— ২/৫৯)

হযরত আবানের মৃত্যুর সময় কাল সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা মত দেখা যায়। মূসা ইবন 'উকবা ও অধিকাংশ বংশবিদ্যা বিশারদদের মতে হযরত আবু বকরের খিলাফতকালের শেষ দিকে হিজরী ১৩ সনে আজনাদাইনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইবন ইসহাকের মতে তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে এবং অন্য কিছু লোকের মতে 'মারজুস সাফারের দিন শাহাদাত লাভ করেন। আবার অন্য একটি বর্ননায় জানা যায়, তিনি খলীফা 'উসমানের খিলাফতকালে হিঃ ২৭ সনে মারা যান এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে হযরত যায়িদ ইবন সাবিত 'মাসহাফে উসমানী সংকলন করেন। তবে প্রথমোক্ত মতটি সঠিক বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

'আমর ইবন উমাইয়া (রা)

নাম 'আমর, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু উমাইয়া। পিতার নাম উমাইয়া। বনী কিনানা গোত্রের সন্তান। ইবন হিশাম তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির কাছাকাছি সময়ের জাহিলী 'আরবের একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরূপে উল্লেখ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/২০৪, ২০৭) তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিকদের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। উহুদের পরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরাত করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর সর্ব প্রথম বীরে মাউনা-এর ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেন। ঘটনাটি ছিল এই রকম ঃ উহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ মাসে নাজদের বনী—কিলাব গোত্রের সরদার আবু বারা' 'আমের ইবন মালেক ইবন জা'ফর মুলায়িবুল আসিন্নাহ্ মদীনায় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করেন। সে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে বললো ঃ আপনি যদি নাজদবাসী কিলাব গোত্রের নিকট আপনার কিছু সংগী পাঠাতেন তাহলে তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করতো। রাসূল (সা) বললেন ঃ নাজদীদের ব্যাপারে আমার শঙ্কা হয়। কিন্তু আবূ বারা' প্রেরিত দলটির নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করায় রাসূল (সা) মুনজির ইবন 'আমেরের নেতৃত্বে চল্লিশ মতান্তরে সত্তর জনের একটি দল পাঠিয়ে দেন। তাঁরা 'বীরে মা'উনা' নামক স্থানে পৌঁছে তাঁবু ফেলে অবস্থান করতে থাকেন এবং ইসলামের দা'ওয়াত সম্বলিত রাসূলুল্লাহর (সা) পত্রটি হারাম ইবন মালজানের মাধ্যমে 'আমের ইবন তুফাইলের নিকট পৌঁছে দেন।

'আমের ইবন তুফাইল দূত হারামকে হত্যা করে এবং 'আসিয়্যা, রা'ল, জাকওয়ান প্রভৃতি গোত্রে মুসলিম দলটির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দ্রুত বেরিয়ে পড়ার ঘোষণা দেয়। তারা সমবেত হয়। এদিকে হারামের ফিরতে দেরী দেখে মুসলমানরা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। কিছু দূর যেতেই তাঁরা রা'ল, জাকওয়ান প্রভৃতি গোত্রের মুখোমুখি হয়। তারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলিম দলটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে সকলকে হত্যা করে। একমাত্র 'আমর ইবন উমাইয়্যা প্রাণে রক্ষা পান। তিনি শত্রু বাহিনীর হাতে বন্দী হন। তাঁকে 'আমের ইবন তুফাইলের সামনে আনা হলো। যখন সে জানতে পেল 'আমর ইবন উমাইয়্যা মুদার গোত্রের লোক তখন তাঁকে এই কথা বলে ছেড়ে দিল যে, 'আমার মার একটি দাস মুক্ত করার মান্নত ছিল।' তবে অপমানের চিহ্ন স্বরূপ তাঁর মাথার সামনের দিকের চুল কেটে দেয়। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৮৪, ১৮৫)।

এই বীরে মা'উনা'র ঘটনায় প্রখ্যাত সাহাবী 'আমের ইবন ফুহাইরাও শাহাদাত বরণ করেছিলেন।। 'আমর ইবন উমাইয়্যাকে বন্দী করে যখন 'আমের ইবন তুফাইলের সামনে আনা হলো তখন সে 'আমের ইবন ফুহাইরার লাশের দিকে ইঙ্গিত করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ এই লোকটি কে ? 'আমর ইবন উমাইয়া বল্লেন ঃ 'আমের ইবন ফুহাইরা। তখন 'আমের ইবন তুফাইল বলেছিল ঃ আমি দেখলাম, সে নিহত হওয়ার পর তার লাশ শূন্যে আকাশের দিকে বহুদূর উঠে গেল, তারপর আবার তা নেমে এল। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯৫)।

'আমর ইবন উমাইয়া 'বীরে মা'উনার শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মদীনার দিকে চলার পথে যখন 'কারকারা' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন বিপরীত দিক থেকে আগত দু'জন লোকের সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি যে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন লোক দু'টিও সেখানে এসে বসলো। তাদের

সাথে আলাপ-পরিচয়ে 'আমর ইবন উমাইয়্যা যখন জানতে পেলেন তারা বনী 'আমের গোত্রের লোক তখন তিনি চুপ থাকলেন। তারা ঘুমিয়ে পড়লে 'আমর তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে দু'জনকেই হত্যা করেন। তিনি মনে করেছিলেন, বনী 'আমের রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের সাথে যে আচরণ করেছে, এটা তার একটা বদলা হবে। 'আমর মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বলেছিলেনঃ 'আমর, তুমি এমন দু'টি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছ যে, আমাকে অবশ্যই তাদের দিয়াত বা রক্তমূল্য আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ ঘটনার পূর্বেই বনী 'আমেরের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) চুক্তি হয়েছিল। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৮৬) অতঃপর রাসূল (সা) তাদের দিয়াত আদায় করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫৬৪)

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'আমর ইবন উমাইয়াকে ইসলামের দা'ওয়াত সম্বলিত একটি পত্রসহকারে হাবশা যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই পত্রে রাসূল (সা) নাজ্জাশীকে হাবশায় অবস্থিত মুহাজিরদের আতিথেয়তার সুফারিশ করেন এবং হযরত উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফইয়ান, যিনি তখনও পর্যন্ত হাবশার মুহাজিরদের সাথে সেখানে অবস্থান করছিলেন—তাঁর সাথে নিজের বিয়ের পয়গাম পাঠান। উল্লেখ্য যে, উম্মু হাবীবা ছিলেন উবাইদুল্লাহ ইবন জাহাশের স্ত্রী। প্রথম ভাগে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। সেখানে স্বামী উবাইদুল্লাহ ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এই দাওয়াত পত্র পেয়ে নাজ্জাশী হযরত জা'ফর ইবন আবী তালিবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহর (সা) পত্রের জবাবে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রে তাঁর ইসলাম গ্রহণ, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সালাম, মুহাজিরদের প্রতি আতিথেয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) পত্র অনুসারে তাঁর পক্ষ থেকে নাজ্জাশী নিজেই উম্মু হাবীবাকে বিয়ের পয়গাম দেন। তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) উকিল হন এবং বিয়ের পর রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে চারশো দীনার মোহর আদায় করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/২২৪, ৩২৪ হায়াতুস সাহাবা-১/১৫৮, ৩/৫৯৬-৯৭)

এই 'আমর ইবন উমাইয়া যখন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দূত হিসেবে নাজ্জাশীর নিকট পৌঁছেন তখন সেখানে তৎকালীন ইসলামের চরম দুশমন 'আমর ইবনুল 'আস ও উপস্থিত ছিল। সে 'আমর ইবন উমাইয়াকে তার হাতে অর্পনের জন্য নাজ্জাশীর নিকট আবদার জানায় যাতে সে তাঁকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে পারে এবং কুরাইশদের নিকট নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৭৬-৭৭)

হাবশায় যে সকল মুহাজির অবস্থান করছিলেন, দু'টো জাহাজে করে 'আমর ইবন উমাইয়্যা তাঁদেরকে নিয়ে খাইবার যুদ্ধের সময় মদীনায় পৌঁছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৫৯)

হাবশার এই দৌত্যগিরি শেষে মদীনায় ফেরার পর আবু সুফইয়ানের এক দুষ্কর্মের প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব অর্পন করা হয় তাঁর ওপর। ঘটনাটি এই ঃ আবু সুফইয়ান রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যার জন্য কিছু লোককে উৎসাহিত করে। একব্যক্তি এই দায়িত্ব কাঁধে নেয় এবং আবু সুফইয়ান তাঁকে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে। সে মদীনায় আসে এবং সরাসরি মসজিদে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছে। রাসূল (সা) তাঁর উদ্দেশ্য জেনে ফেলেন। তিনি লোকটিকে দেখিয়ে বলেন, সে কোন ধান্ধায় এসেছে। লোকটি রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর প্রায় আক্রমণ করতে বসেছিল, ঠিক সে সময় হঠাৎ হযরত উসাইদ ইবন হুদাইর (রা) তাঁকে পাঁজা করে ধরে ফেলেন। লোকটির কাপড়ের নীচ থেকে একটি খঞ্জর বেরিয়ে পড়ে। অপরাধ প্রকাশ্য ছিল, কোন সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু রাহমাতুল লিল 'আলামীন তাঁকে মা'ফ করে দেন। সে আবু সুফইয়ানের পুরো ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়।

যেহেতু এই ঘটনার মূল নায়ক আবু সুফইয়ান এবং তারই জন্য মক্কার কুরাইশ ও মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বক্ষণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান থাকে একারণে হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'আমর ইবন উমাইয়া ও

সালামা ইবন আসলাম মতান্তরে জাব্বার ইবন সাখার আল-আনসারীকে এক গোপন অভিযানে মক্কায় পাঠান। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যদি সুযোগ হয় তাহলে এই অশান্তির মূল নায়ককে চির দিনের জন্য দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে।

'আমর ও সালামা গোপনে মক্কায় পৌঁছলেন, কিন্তু মুয়াবিয়া কা'বার তাওয়াফ করা অবস্থায় তাদেরকে দেখে ফেলেন। কুরাইশদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল। তারা বলাবলি করলো, তাদের আগমন নিঃসন্দেহে বিনা কারণে নয়। নিশ্চয় তারা কিছু একটা অঘটন ঘটাবে। এদিকে 'আমর ও সালামা যখন দেখলেন, তাদের আগমণের বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে, তখন তাঁরা মক্কার বাইরে চলে যান। পথে উবাইদুল্লাহ ইবন মালিক এবং বনী হুজাইলের এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান। 'আমর 'উবাইদুল্লাহকে এবং সালামা দ্বিতীয় লোকটিকে হত্যা করেন।

এদিকে কুরাইশরা তাঁদের সন্ধানে মক্কার চারদিকে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেয়। 'আমর ও সালামা এমন দুই গোয়েন্দার দেখা পেলেন। তাঁরা গোয়েন্দা দু'জনের একজনকে হত্যা করেন এবং অন্যজনকে বন্দী করে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে আসেন। (সীরাতু ইবন হিশাম২/৬৩৩-৩৪)

আহমাদ ও তাবারানীর এক বর্ণনায় জানা যায়, খুবাইব বিন 'আদী মক্কার কাফিরদের হাতে শহীদ হন এবং তাঁর লাশ একটি কাঠের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) খুবাইবের লাশ আনার জন্য গোপন মিশন মক্কায় পাঠান। তিনি গোপনে মক্কায় পৌঁছে কাঠ বেয়ে উঠে রশি কেটে দেন এবং খুবাইবের লাশ মাটিতে পড়ে যায়। এমন সময় কুরাইশরা টের পেয়ে তাঁকে ধাওয়া করে এবং তিনি লাশ ফেলে পালিয়ে যান। অবশ্য অন্য বর্ণনায় জানা যায়, মিকদাদ ইবন আসওয়াদ ও যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম এ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং তাঁরাই এ অভিযান চালান। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯৬-৯৭)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত 'আমর ইবন উমাইয়া দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর পরবর্তী জীবনের বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) শাসনকালে হিজরী ৬০ সনের পূর্বে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন।

হাদীসের গ্রন্থ সমূহে 'আমর ইবন উমাইয়া থেকে বর্ণিত বিশটি হাদীস পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ, জা'ফর, ফাদল, যাবারকান, শা'বী, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমন, আবু কিলাবা, জুরমী এবং আবুল মুহাজির তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্র।

তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম বীর ও সাহসী ব্যক্তি। এ কারণে রাসূল (সা) দুঃসাহসিক অভিযানগুলির দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করতেন। মৃত্যুকালে জা'ফর, আবদুল্লাহ ও ফাদল নামে তিন ছেলে রেখে যান।

মিসতাহ্ ইবন উসাসা (রা)

প্রকৃত নাম 'আউফ, ডাকনাম আবূ 'আববাদ, এবং লকব বা উপাধি মিসতাহ। পিতা উসাসা ইবন 'আববাদ এবং মা হযরত আবূ বকরের খালা মতান্তরে খালাতো বোন। মাতা-পিতা দু'জনেই ইসলামের সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা—৩/৪০৮)

মিসতাহ্ ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ও যায়েদ ইবন মুযায়্যিনের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। তাঁর হিজরাতের সময়কাল সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি বদর যুদ্ধের পূর্বেই হিজরাত করে মদীনায় চলে যান এবং বদর যুদ্ধে তাঁর যোগদানের কথা ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায়। বনী মুসতালিক যুদ্ধে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে, 'ইফ্‌ক' বা উম্মুল মু'মিনীর 'আয়িশার (রা) প্রতি অপবাদের ঘটনাটি ঘটে। মুনাফিকরা যখন অপবাদটি ছড়িয়ে দেয় তখন তাতে কিছু নিষ্ঠাবান মুমিন সাহাবী ও জড়িয়ে পড়েন। মিসতাহ্ এই দলেরই একজন।

'ওয়াকিয়া'-ই-ইফ্‌ক' নামে প্রসিদ্ধ ঘটনাটির প্রতি পবিত্র কুরআনের সূরা নূর-এর ১১নং আয়াত সহ কয়েকটি আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই ঃ উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) বনু মুসতালিকের যুদ্ধে (৬ হিজরী) রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁরা এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। 'আয়িশা (রা) শিবির হতে কিছু দূরে বাহ্যক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যান। তখন তাঁর গলার হারটি সেখানে পড়ে গেলে তিনি তা খুঁজতে থাকেন। এ দিকে তাঁর হাওদা পর্দায় ঘেরা থাকায় তিনি ভেতরে আছেন মনে করে কাফিলা সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে যায়। পশ্চাৎবর্তী রক্ষী সাফওয়ান (রা) তাঁকে দেখতে পেয়ে নিজের উটের পিঠে উঠিয়ে নেন এবং উটের রশি ধরে পায়ে হেঁটে কাফিলার সাথে মিলিত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই নানা অপবাদ ছড়াতে থাকে। সূরা নূরের আয়াত গুলিতে 'আয়িশার (রা) পবিত্রতার ঘোষণা করা হয় এবং অপবাদ রটনাকারীদের কঠোর শাস্তির কথা ব্যক্ত করা হয়।

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মিসতাহ্ ঘটনাটি তাঁর মায়ের কাছে বর্ণনা করেন। মিসতাহর মা আবার একদিন রাতে কোন কাজে 'আয়িশার (রা) বাড়ীতে যান। 'আয়িশা তখন পিতৃগৃহে মায়ের কাছে। তৎকালীন আরবে বাড়ীতে পেশাব-পায়খানার স্থায়ী কোন জায়গা নির্দিষ্ট থাকতো না। মেয়েরা সাধারণত ঃ রাতে বাড়ীর বাইরে মরু ভূমিতে গিয়ে বাহ্যক্রিয়া সম্পন্ন করতো। 'আয়িশা (রা) মিসতাহর মাকে সংগে করে বাড়ীর বাইরে প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করতে যান। পথে মিসতাহর মা নিজের আঁচলে জড়িয়ে হোঁচট খান। হোচট খাওয়ার পর আরবের প্রথা অনুযায়ী তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে যায় 'মিসতাহর ধ্বংস হোক।' এতে 'আয়িশা আপত্তি জানিয়ে বলেন, একজন মুহাজির মুসলমান, যিনি বদরে যুদ্ধ করেছেন তাঁকে এভাবে বদ-দু'আ করছেন ? মিসতাহর মা তখন বললেন ঃ 'আবূ বকরের মেয়ে, তুমি কি কিছু শোননি ?' তখন মিসতাহর মা তাঁকে পুরো ঘটনা বলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম—১/২৯৯-৩০০, হায়াতুস সাহাবা—১/৫৮৭)

দরিদ্র মিসতাহ্ ছিলেন হযরত আবূবকরের (রা) খালাতো ভাই। আবূ বকর (রা) সব সময় তাঁর সাথে ভালো ব্যবহার ও আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন তিনি 'ইফ্‌ক' এর ঘটনার সাথে মিসতাহর জড়িত থাকার কথা জানতে পারলেন এবং কুরআন তাঁদের প্রচারনাকে মিথ্যা অপবাদ হিসেবে ঘোষণা করলো তখন আবূ বকর মিসতাহকে সাহায্য দান বন্ধ করে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, এখন থেকে আমি মিসতাহর জন্য এক কর্পদকও ব্যয় করবো না। তখন সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয় স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহ ত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন ? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা নূর—২২)

আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা) আবার আগের মত সাহায্য দিতে শুরু করেন। বুখারী ও মুসলিমে 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়। (আল-ইসাবা—৩/৪০৮)

তবে যেহেতু একজন সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনায় তিনি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং কুরআনও তাদের জন্য নিম্নোক্ত শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছিল ঃ যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে।' (সূরা-নূর-৪) এ কারণে অন্যদের সাথে তাঁকেও এ শাস্তি দান করা হয়। মিসতাহর সাথে আর যে ক'জন নিষ্ঠাবান বিখ্যাত সাহাবী শাস্তি ভোগ করেন তাঁরা হলেন— হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত ও উম্মুল মু'মিনীর হযরত যয়নাব বিনতু জাহাশের বোন হামনা বিনতু জাহাশ (রা)। (সীরাতু ইবন হিশাম ১/৩০২, হায়াতুস সাহাবা—১/৫৯০)

আমাদের স্বরণ রাখতে হবে, হযরত মিসতাহর (রা) মত যে সকল নিষ্ঠাবান সাহাবী 'ইফ্ক' এর ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা নিতান্তই মুনাফিকদের প্রচারনার শিকার হয়েছিলেন। অন্যথায় হযরত মিসতাহর (রা) মত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এতে জড়িয়ে পড়তে পারেন না। তাছাড়া তাঁরা তাওবাহ্ করেছেন এবং এর শাস্তিও মাথা পেতে নিয়েছেন। আল্লাহ্, আল্লাহর রাসূল, উম্মুল মু'মিনীর 'আয়িশা (রা), আবূ বকর (রা) তথা গোটা মুসলিম উম্মাহ তাঁদের ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তাঁদের প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমানের পরিপন্থী কাজ হবে। হযরত মিসতাহর (রা) সব চেয়ে বড় পরিচয় হযরত 'আয়িশার (রা) মন্তব্যে ফুটে উঠেছে। তিনি প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী, গৃহত্যাগী মুহাজির এবং বদর যুদ্ধের একজন মুজাহিদ। আর এদের প্রশংসায় পবিত্র কুরআনের কত আয়াতই না নাযিল হয়েছে।

হযরত মিসতাহ কখন ইনতিকাল করেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। একটি মতে হিজরী ৩৪ সনে হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। অপর একটি মতে হিজরী ৩৭ সনে সিফ্‌ফীনে হযরত আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করার পর সেই বছর মারা যান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। (উসুদুল গাবা—৪/৩৫৫, আল-ইসাবা—৩/৪০৮ তাবাকাত—৩/৫২(

মারসাদ ইবন আবী মারসাদ আল-গানাবী (রা)

মারসাদের পিতার নাম আবূ মারসাদ কান্নায ইবন হুসাইন। মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বেই পিতা-পুত্র উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বদর যুদ্ধের পূর্বেই হিজরাত করে মদীনায় চলে যান। মারসাদ মক্কায় হামযা ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং মদীনায় হিজরাতের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী 'উবাদা ইবন সামিতের ভাই আউস ইবন সামিতের সাথে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্কে স্থাপন করে দেন। (তাবাকাত— ৩/৪৮, আল-ইসাবা— ৩/৩৯৮)

হযরত মারসাদ ও পিতা আবূ মারসাদ কান্নায বদর যুদ্ধের বীর যোদ্ধা। এ যুদ্ধে মারসাদ 'সাবাল' নামক একটি ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশাপাশি অত্যন্ত বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন। উহুদ যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেন। (তাবাকাত— ৩/৪৮, সীরাতু ইবন হিশাম— ১/৬৬৬)

জাহিলী যুগে মক্কার 'ইনাক' নাম্নী এক পতিতার সাথে মারসাদের সম্পর্ক ছিল। ইসলামে ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার পর তিনি সেই পতিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী, সে জন্য যে সকল মুসলমান মক্কায় কাফিরদের হাতে বন্দী অবস্থায় নির্যাতন ভোগ করতো রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে মক্কা থেকে গোপনে মদীনায় নিয়ে আসার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেন। এ উদ্দেশ্যে একবার তিনি মক্কায় যান। রাতটিও ছিল চন্দ্রালোকিত। তিনি চুপি সারে মক্কার একটি গলি দিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় তাঁর সেই পুরাতন প্রেয়সী 'ইনাক' তাঁকে দেখে ফেলে এবং ডাক দেয়। তিনি থেমে যান। সে অত্যন্ত মিষ্টি মধুর ভঙ্গিতে তাঁকে স্বাগতম জানায় এবং সেই রাতটি তার সাথে কাটাবার প্রলোভন দেয়। মারসাদ বলেন, 'ইনাক, আল্লাহ এখন ব্যভিচার নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁর এমন নিরস উত্তরে 'ইনাক দারুণ চোট পায়। সে তখন প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মানুষকে মারসাদের আগমনের কথা জানিয়ে দেয়। আটজন লোক তাঁকে ধাওয়া করে। তিনি একটি নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে পড়েন। শত্রুরা তাঁকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে গেলে তিনি গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে সোজা মদীনার পথ ধরেন। মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'ইনাকের সাথে আমার বিয়েটা দিয়ে দিন।' রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। এর পরই সূরা নূরের এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

'ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী নারী অথবা মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে এবং ব্যভিচারী নারী ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করবে। বিশ্বাসীদের জন্য এগুলি হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।' (সূরা নূর— ২)

'উদাল ও কা-রা গোত্রের কতিপয় লোক উহুদ যুদ্ধের পর মদীনায় আসে। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হয়ে 'আরজ করে, আমাদের গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, আপনি আমাদের সাথে এমন কিছু লোক পাঠান যাঁরা তাদেরকে দ্বীন ও কুরআন শিক্ষা দিতে পারে। ইবন ইসহাকের বর্ণনামতে, রাসূলে কারীম (সা) মারসাদ ইবন আবী মারসাদের (রা) নেতৃত্বে ছয় ব্যক্তিকে পাঠান। তবে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে 'আসিম ইবন সাবিতের নেতৃত্বে রাসূল (সা) দশ ব্যক্তিকে পাঠান। তাঁদের মধ্যে মারসাদও একজন।

দলটি যখন বনু হুজাইলের জলাশয় 'রাজী' নামক স্থানে পৌঁছে তখন 'উদাল ও কা-রার লোকগুলি ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে চিৎকার শুরু করে দেয়। নবু হুজাইলের লোকেরা কোষমুক্ত তরবারি হাতে ছুটে

এসে দলটিকে ঘিরে ফেলে। সাহাবায়ে কিরাম ঘোড়ার ওপর সাওয়ার ছিলেন। তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বনু হুজাইল বললো, আমরা তোমাদের হত্যা করতে চাইনে। তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের নিকট থেকে শুধু কিছু অর্থ আদায় করা আমাদের উদ্দেশ্য। তোমরা নিজেরাই আমাদের কাছে চলে এস, আমরা অঙ্গিকার করছি।

মারসাদ, খালিদ ও আসিম বললেন, আমরা মুশরিকদের অঙ্গিকারে বিশ্বাস করিনা। একথা বলে তারা যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। অন্য দিকে তাঁদের অপর তিন সাথী খুবাইব, যায়িদ ও 'আবদুল্লাহ ইবন তারিক একটু বিনয়ী ভাব দেখিয়ে তাদের হাতে ধরা দেন। যখন শত্রু পক্ষ তাঁদের হাত-পা বাঁধতে শুরু করে তখন আবদুল্লাহ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এটা হলো তোমাদের প্রথম বিশ্বাস ঘাতকতা। তারা 'আবদুল্লাহকে 'জাহরান' নামক স্থানে পাথর মেরে শহীদ করে।

অতঃপর তারা খুবাইব ও যায়িদকে নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হয়। কুরাইশদের হাতে বনু হুজাইলের দুই ব্যাক্তি বন্দী ছিল। তারা এদের দু'জনের বিনিময়ে তাদের দু'জনকে ছাড়িয়ে নেয়। উকবা ইবন হারিস ইবন আমির তার পিতা হারিসের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খুবাইবকে গ্রহণ করে। হযরত খুবাইব (রা) বদর যুদ্ধে এই হারিসকে হত্যা করেন। অন্যদিকে সাফওয়ান ইবন উমাইয়া তার পিতা উমাইয়া ইবন খালাফের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যায়িদকে হাতে নেয়। এ ভাবে কুরাইশদের প্রতিশোধ স্পৃহার শিকার হয়ে তাঁরা দু'জনই অত্যন্ত অসহায় ও নির্মম ভাবে মক্কায় শাহাদাত বরণ করেন। ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'ওয়াকিয়াতু ইউম আল-রাজী', নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইবন সাদ বলেন, 'রাজী'-এর এই ঘটনাটি ঘটে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের ছত্রিশ মাসের মাথায় সফর মাসে। (তারাকাত—৩/৪৮, আসাহহুস্ সীয়ার— ১৬০, সীরাতু ইবন হিশাম— ১৬৯-১৭৪)।

হযরত মারসাদের (রা) যোগ্যতা ও মর্যাদার জন্য এই ঘটনাই যথেষ্ট যে, খোদ রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে দ্বীনের মু'য়াল্লিম বা শিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করেছেন। যেহেতু হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন সেহেতু তাঁর ইলমী যোগ্যতা প্রকাশের সুযোগ হয়নি। তবুও হাদীসের গ্রন্থ সমূহ তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে একেবারে শূন্য নয়। আহমাদ ইবন সিনান আল-কাত্তান তাঁর মুসনাদে, ইমাম বাগাবী ও হাকেম তাঁদের মুসতাদরিকে এবং তাবারানী তাঁর 'আওসাতে' মারসাদ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবা ৩/৩৯৮)

আবু আহমাদ ইবন জাহাশ (রা)

আসল নাম 'আবদ, মতান্তরে আবদুল্লাহ, ডাকনাম আবূ আহমাদ। পিতা জাহাশ ইবন রিয়াব এবং মাতা উমাইমা বিনতু, আবদিল মুত্তালিব। একদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই, অন্য দিকে রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিনতু জাহাশের আপন ভাই। (আনসাবুল আশরাফ—১/৮৮, আলইসাবা- ৪/৩

মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বে আবূ আহমাদ তাঁর অন্য দুই ভাই— আবদুল্লাহ ও উবায়দুলাহর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নেওয়ার পূর্বেই তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কাজটি সম্পন্ন হয়। বালাযুরী বলেছেন, তাঁর অন্য দুই ভাই আবদুল্লাহ ও 'উবায়দুল্লাহ হাবশায় হিজরাত করলেও তিনি হাবশায় হিজরাত করেননি। তিনি আরও বলেছেন, যে সব বর্ণনায় তাঁর হাবশায় হিজবাতের কথা পাওয়া যায় তা সবই ভিত্তিহীন। (আনসাবুল আশরাফ—১/১৯৯)

ইবন ইসহাক আবূ আহমাদের পরিচয় ও মদীনায় হিজরাত সম্পর্কে বলেন ঃ 'আবূ সালামার পর সর্ব প্রথম যাঁরা মদীনায় আসেন, 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নিজ পরিবার এবং অন্য এক ভাই— আবূ আহমাদকেও সংগে নিয়ে আসেন। এই আবূ আহমাদ এক অন্ধ ব্যক্তি। তিনি মক্কার উঁচু-নীচু ভূমিতে কারও সাহায্য ছাড়া ঘুরে বেড়াতেন। আবূ, সুফইয়ানের কন্যা 'ফারয়া' তাঁর স্ত্রী। আর তাঁর মা আবদুল মুত্তালিবের কন্যা উমাইমা।

তাঁরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে মদীনায় চলে এলে একদিন উতবা ইবন রাবীয়া, 'আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিব ও আবূ জাহল ইবন হিশাম তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়ীর পাশ দিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিকে যাচ্ছিল। 'উতবা খালি বাড়ীটির দিকে ইঙ্গিত করে কবি আবূ দুওয়াদ আল-ইয়াদীর একটি কবিতার শ্লোক আওড়িয়ে আফসুসের সুরে বলে ঃ বনী জাহাশের বাড়ীটি একেবারেই খালি হয়ে গেল। আবূ জাহল তার জবাবে বললে ঃ এতো আমাদের ভায়ের ছেলের কাজেরই পরিণাম। সে আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে, আমাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে আমাদের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।......' মদীনায় কুবার বনী 'আমর ইবন আওফের পল্লীতে আবূ সালামা ইবন 'আবদিল আসাদ, আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ও আবূ আহমাদ বসবাস করতেন।" (সীরাতু ইবন হিশাম—১/৪৭০-৪৭২) মদীনায় পৌঁছে প্রথমত ঃ তিনি হযরত মুবাশশির ইবন আবদিল মুনজিরের অতিথি হন।

মক্কায় একদল লোকের সার্বক্ষণিক কাজ ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানো এবং মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া। এই দলটির প্রধান ছিল দুই ব্যক্তি ঃ আবূ সুফইয়ান ও আবূ জাহল। আবূ আহমাদ আগে ভাগে হিজরাত করে তাদের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় সরাসরি তাদের অত্যাচার থেকে বেঁচে যান। তবে আবূ সুফইয়ান তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়িটি অন্যায় ভাবে 'আমর ইবন 'আলকামার নিকট বিক্রী করে দেয়। (সীরাতু ইবন হিশম০—১/৪৯৯) সম্ভবতঃ আবূ সুফইয়ানের মেয়ে 'ফারয়া' ছিল এই বাড়ীর পুত্র বধু, সেই অধিকারে সে বাড়ীটি বিক্রী করে। (সীরাতু ইবন হিশাম—১/৫০০

হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের পর আবূ আহমাদ তাদের বাড়ীর প্রসঙ্গটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উত্থাপন করেন। লোকেরা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে ঃ আবূ আহমাদ, আল্লাহর পথে যা তোমরা হারিয়েছ, এখন তা আবার দাবী কর— রাসূলুল্লাহ (সা) তা পসন্দ করেন না। অন্য একটি বর্ণনা

মতে, আবূ আহমাদের দাবীর পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত উসমানের (রা) মাধ্যমে তাঁকে কিছু বলে পাঠান। হযরত উসমান (রা) সে কথা তাঁকে কানে কানে বলেন। তারপর মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বাড়ী সম্পর্কে আর একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করেননি। পরে তাঁর সন্তানদের কাছে জানা গেছে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে বাড়ীর দাবী ত্যাগ করতে বলেন এবং বিনিময়ে তাঁকে জান্নাতে একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দান করেন।

তবে তিনি আবূ সুফইয়ানের উদ্দেশ্যে একটি জ্বালাময়ী কবিতা রচনা করেন। তার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ

তোমরা আবূ সুফইয়ানকে বলে দাও, সে যা করেছে তার পরিণাম লজ্জা ও অনুশোচনা।
তুমি চাচাতো ভাইদের বাড়ী বিক্রী করে নিজের ঋণ পরিশোধ করেছ।

মানুষের রব আল্লাহর নামে আমি শক্ত কসম করেছি। যাও, নিয়ে যাও, যাও, আমি সেই অর্থ তোমার গলায় কবুতরের গলার মালার মতো মালা বানিয়ে দিলাম, (যা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না বা বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।) (সীরাতু ইবন হিশাম—২/৬৪৪)

রাসূলুল্লাহর (সা) আযাদকৃত দাস যায়িদ ইবন হারিসার সাথে হযরত যয়নাব বিনতু জাহাশের বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে আবূ আহমাদই তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। (সীরাত—২/৬৪৪)

হযরত আবূ আহমাদ মদীনায় ইনতিকাল করেন। (আনসাবুল আশরাফ—১/১৯৯ তবে তাঁর মৃত্যুর সময় সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ আছে। ইবনুল আসীর দৃঢ় ভাবে বলেছেন ঃ তিনি বোন যয়নাব বিনতু জাহাশের পরে মারা গেছেন। অর্থাৎ হিজরী ২০ সনের পরে। কারণ হযরত যয়নাব মারা যান হিঃ ২০ সনে। ইবন হাজার এ মত সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, এমন বর্ণনাও তো আছে যে, আবূ আহমাদের মৃত্যুর পর তাঁর বোন যয়নাব কিছু খোশবু আনিয়ে তাঁর গায়ে লাগিয়ে দেন। বুখারী ও মুসলিমে যয়নাব বিনতু উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমি যয়নাব বিনতু জাহাশের এক ভায়ের মৃত্যুর সময় যয়নাবের ঘরে যাই। তিনি কিছু খোশবু আনিয়ে তাঁর গায়ে লাগিয়ে দেন। ইবন হাজার বলেন, এটা আবূ আহমাদের মৃত্যুর সময়ের ঘটনা হবে। কারণ, যয়নাবের অন্য দুই ভাই আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় উহুদে শহীদ হন এবং উবায়দুল্লাহ মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী অবস্থায় হাবশায় মৃত্যুবরণ করে। তাঁর স্ত্রী উম্মু হাবীবাকে রাসূল (সা) বিয়ে করেন। (আল-ইসাবা—৪/৪)

আমর ইবন সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা)

আমরের ডাকনাম আবু 'উকবা। পিতা সাঈদ ইবনুল 'আস। কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান। মা বনী মাখযূমের কন্যা। আমর হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের ফুফাতো ভাই। (উসুদুল গাবা-৪/১০৬, আল-ইসাবা-২/৫৩৯)

সা'ঈদ ইবনুল 'আসের পাঁচ ছেলে-খালিদ, আবান, সা'ঈদ, আবদুল্লাহ ও আমর। আগে পরে তাঁরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। যুবাইর ইবন বাক্কার বলেনঃ সাঈদ ইবনুল আসের ছেলে আবু উহায়হা সা'ঈদ ইবন সা'ঈদ তায়িফ অবরোধের সময় শাহাদাত বরণ করেন। আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদের পূর্ব নাম ছিল হাকাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তা পরিবর্তন করে 'আবদুল্লাহ রাখেন। 'আমর ইবন সা'ঈদ আজনাদাইনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। খালিদ অতঃপর 'আমর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন ইসহাক বলেন, 'আমরের কোন সন্তানাদি ছিল না। সাঈদ ইবনুল আসের অন্য ছেলে আবান সব শেষে ইসলাম গ্রহণ করেন। ভাইদের বিশেষতঃ খালিদ ও 'আমরের ইসলাম গ্রহণে আবান দারুন ক্ষুব্ধ হন। খালিদ, 'আমর ও আবান তিন জনই কবি ছিলেন। আবান তাঁর দুইভাই-খালিদ ও 'আমর ইসলাম গ্রহণ করার পর তিরস্কার করে একটি কবিতা লিখেন। খালিদ ও 'আমর কবিতায় তার জবাবও দেন। আল-ইসাবা, সীরাতু ইবন হিশাব, উসুদুল গাবা প্রভৃতি গ্রন্থে সেই কবিতার কিছু অংশ সংকলিত হয়েছে। আবান তাঁর ভাইদের তিরস্কার করে যে কবিতাটি রচনা করেন তার একটি পংক্তি এই রকম ঃ

'হায়! 'আমর ও খালিদ দ্বীনের (ধর্ম) ব্যাপারে যে কেমন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তা যদি 'জাবীরা'র মৃত ব্যক্তি দেখতো!

তাঁদের পিতা সা'ঈদ ইবনুল 'আস জাবীরা' নামকস্থানে সমাহিত ছিল। এখানে সেই দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। 'আমর কবিতায় জবাব দেন। তার একটি পংক্তি এমন ঃ 'এখন ঐ মৃতদের কথা ছেড়ে দাও যাঁরা তাঁদের পথে চলে গেছেন। এখন সেই সত্যের দিকে এস যার সত্য হওয়াটা একেবারেই সুস্পষ্ট।'

(আল-ইসাবা— ২/৫৩৯, সীরাতুইবন হিশাম—২/৩৬০)

খালিদ ইবন সা'ঈদের হাবশায় হিজরাতের দুই বছর পর হাবশাগামী দ্বিতীয় দলটির সাথে আমর ইবন সা'ঈদ স্ত্রী ফাতিমা বিনতু সাফওয়ান সহ হাবশায় হিজরাত করেন। ফাতিমা বিনতু সাফওয়ান হাবশায় ইনতিকাল করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম ২/৩৬০) আর 'আমর হাবশা থেকে মুসলিম কাফিলার সাথে জাহাজ যোগে খাইবার যুদ্ধের সময় মদীনায় পৌছেন।

মদীনায় আসার পর মক্কা বিজয় সহ হুনাইন, তায়িফ, তাবুক প্রভৃতি অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। হযরত রাসূল কারীম (সা) সা'ঈদের তিন ছেলে আবান, খালিদ ও আমরকে তিন অঞ্চলের, শাসক নিয়োগ করেন। খালিদ ইয়ামন, আবান বাহরাইন এবং 'আমর মদীনার পশ্চিম অঞ্চল তথা তাবূক, খাইবার, ফিদাক ইত্যাদির শাসক ছিলেন। তাঁরা সকলে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল পর্যন্ত অতি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। হযরত রাসূলে কারীমের ওফাতের পর তাঁরা মদীনায় চলে আসেন। অযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সকলকে তাঁদের পূর্ব পদে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন ঃ 'শাসন কাজ পরিচালনার জন্য আপনাদের থেকে অধিকতর হকদার ব্যক্তি আমি আর কাউকে দেখিনা।' (আল-ইসাবা ২/৫৩৯) কিন্তু সা'ঈদ

ইবনুল 'আসের ছেলেরা খলীফার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে : আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আর কারও 'আমিন বা শাসক হবনা।

হযরত আবুবকর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সিরিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। বিশিষ্ট সাহাবীদের একটি বৈঠকে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও মতামত গ্রহণ করা হয়। একে একে সবাই মত প্রকাশ করছেন, আবার অনেকে নীরব রয়েছেন। এক সময় হযরত 'উমার (রা) সকলকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বলেন : যদি আশু ফল লাভের সম্ভাবনা দেখা যেত অথবা সফর নিকটবর্তী হতো, শুধু তাহলেই কি আপনারা বেরুতেন ? 'উমারের (রা) এ বক্তব্যে 'আমর ইবন সা'ঈদ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আপনি মুনাফিকদের সম্পর্কে প্রয়োগকৃত দৃষ্টান্ত আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন ? আপনি নিজে চুপ করে বসে আছেন কেন ? আপনিই প্রথম শুরু করুন না। এ পর্যায়ে 'উমারের সাথে তাঁর বেশ কথা কাটাকাটি হয়। অতঃপর খলীফা আবু বকর (রা) বলেন, আসলে উমারের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা। সাথে সাথে 'আমরের ভাই খালিদ উঠে দাঁড়ান এবং খলীফার বক্তব্য সমর্থন করে এক ভাষণ দেন। এ ভাবে বিষয়টির মীমাংসা হয়। (হায়াতুস সাহাবা—১৪৪০

শাসনকর্তার পদ প্রত্যাখ্যান করে 'আমর একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসাবে সিরিয়া অভিযানে যোগদেন। হিজরী ১৩ সনে আজনাদাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। মুসলিম বাহিনীর একটু দুর্বলতা দেখলেই তিনি চিৎকার করে নানাভাবে তাদের মনোবল দৃঢ় করার চেষ্টা করেন। একবার অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন, 'যুদ্ধের ময়দানে আমি আমার সাথীদের দুর্বলতা মোটেই দেখতে পারিনে। এখন অমি নিজেই ঢুকে পড়বো।' একথা বলে তিনি শত্রু বাহিনীর মধ্যভাগের ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে চলে যান এবং অত্যন্ত দুঃসাহসের সাথে লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধের শেষে তাঁর লাশ কুড়িয়ে দেখা গেল অসংখ্য আঘাতে সারা দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। গুণে দেখা গেল মোট ত্রিশটি ক্ষত চিহ্ন। অবশ্য ইবন ইসহাক ও মূসা ইবন উকবার মতে আমর 'মারজ আস সাফার' যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। (আল ইসাবা—২/৫৩৯)

ওয়াকিদ ইবন 'আবদিল্লাহ (রা)

নাম ওয়াকিদ, পিতা 'আবদুল্লাহ। বনী তামীম গোত্রের হানজালী ইয়ারবূ'য়ী শাখার সন্তান। জাহিলী যুগে খাত্তাব ইবন নুফাইলের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। (তাবাকাত-৩/৩৯০, আল-ইসাবা-৩/৬২৮)

মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনালগ্নে হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকামের (রা) বাড়িতে প্রবেশের পূর্বেই ওয়াকিদ ইসলাম গ্রহণ করেন'। হিজরাতের নির্দেশ আসার পর তিনি মদীনায় হিজরাত করেন এবং হযরত রিফা'য়া ইবন 'আবদিল মুনজিরের অতিথি হন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) বিশর ইবন বারা' ইবন মা'রূর এর সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম করে দেন। (তাবাকাত— ৩/৩৯০)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় হিজরাতের সতেরোতম মাসটি ছিল রজব মাস। এ মাসে তিনি কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের নেতৃত্বে ১২ মতান্তরে ৯ সদস্যের একটি বাহিনীকে 'নাখলায়' পাঠান। এতে ওয়াকিদ ইবন 'আবদিল্লাহও ছিলেন। তাঁরা নাখলায় পৌঁছে ওৎ পেতে আছেন। এমন সময় কুরাইশদের একটি ছোট্ট বানিজ্য কাফিলা দৃষ্টি গোচর হয়। দিনটি ছিল রজবের একেবারে শেষ দিন। আর রজব মাসটি আরবে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ চার মাসের একটি। সুতরাং এ সময় আক্রমণ করা যাবে কিনা, এ বিষয়ে মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা পরামর্শ করেন। অবশেষে আক্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ওয়াকিদ ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) তীর নিক্ষেপ করেন। সেই নিক্ষিপ্ত তীরে শত্রুপক্ষের 'আমর ইবনুল হাদরামী নিহত হয় এবং উসমান ও হাকাম নামে দুই ব্যক্তি বন্দী হয়।

যেহেতু রক্তপাতের ঘটনাটি সংঘটিত হয় হারাম মাসে এ কারণে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের প্রচারনা চালাতে থাকে। তারা বলে, মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর অনুসারীরা কি আবহমান কাল ধরে মেনে আসা হারাম মাসগুলির পবিত্রতা মানে না? এমন কি রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও ঘটনাটি মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি বাহিনীর লোকদের ডেকে বললেন, 'আমি তো তোমাদের যুদ্ধের অনুমতি দিইনি, তবে কেন তোমরা যুদ্ধ করলে?' এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা, আল বাকারাহর নীচের আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

'হে মুহাম্মাদ, মুশরিকরা তোমার নিকট 'হারাম' মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্ক জিজ্ঞেস করে। তুমি তাদের বলে দাও এ মাসে যুদ্ধ করা বড় পাপের কাজ। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর কুফরী করা, মানুষকে মসজিদে হারামে 'ইবাদাত করা থেকে বিরত রাখা এবং সেখান থেকে তার অধিবাসীদের বের করে দেওয়া আল্লাহর নিকট এ মাসে যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর বড় পাপ কাজ। আর অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ।' (সূরা বাকারাহ—২১৭) আল ইসাবা ৩/৬২৮, আসাহহুস সীয়ার—১২৮)

যাই হোক, 'আমর ইবনুল হাদরামী একজন মুসলমানের হাতে নিহত প্রথম কাফির, উসমান ও হাকাম ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দুই কয়েদী এবং কুরাইশ কাফিলার নিকট থেকে প্রাপ্ত জিনিস ইসলামের প্রথম গনীমাত।

(আসাহহুস সীয়ার—১২৮)

এই ঘটনার পর বনী ইয়ারবু গর্ব করে বলে বেড়াতো আমাদেরই একজন ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম একজন মুশরিককে হত্যা করেছে। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব কাব্য করে বলতেন : 'নাখলায় আমরা আমাদের তীরগুলিকে ইবনুল হাদরামীর রক্ত পান করিয়েছি, যখন ওয়াকিদ যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। (আল-ইসাবা-৩/৬২৮) নাখলার পর বদর, উহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমারের খিলাফত কালের প্রথম দিকে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিলো না। হাদীসের গ্রন্থ সমূহে তাঁর থেকে বর্নিত দুই/একটি হাদীস দেখা যায়।

আবদুল্লাহ ইবন মাখরামা (রা)

পুরো নাম আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ, পিতা মাখরামা ইবন 'আবদিল 'উয্যা এবং মাতা বাহসানা বিনতু সাফওয়ান। কুরাইশ বংশের 'আমেরী শাখার সন্তান। (আল-ইসাবা-২/৩৬৫)
ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা লগ্নে মক্কায় ইসলাম গ্রহন করেন। জা'ফর ইবন আবী তালিবের (রা) সাথে হাবশাগামী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। সেখান থেকে সরাসরি মদীনায় চলে যান এবং হযরত কুলসুম ইবন হিদামের বাড়িতে অতিথি হন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) ফারওয়া ইবন 'আমর আল-বায়াদীর (রা) সাথে তাঁর দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। মদীনায় আসার পর সর্ব প্রথম বদর যুদ্ধে যোগদান করে বদরী সাহাবী হওয়ার মহা সম্মান অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর। বদরের পর, উহুদসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন।

হযরত আবদুল্লাহর (রা) শাহাদাত লাভের এত তীব্র বাসনা ছিলো যে, দেহের প্রতিটি লোম রক্তরঞ্জিত করার জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন'। তিনি দু'আ করতেনঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিও না, যতক্ষন না আমার দেহের প্রতিটি জোড়া আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়।' তাঁর এ দু'আ কবুল হয় এবং অনতিবিলম্বে সে সুযোগও এসে যায়।
হযরত আবুবকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে রিদ্দা বা ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি একজন মুজাহিদ হিসেবে যোগদেন। মুরতাদদের বিরুদ্ধে তিনি এত নির্মম ভাবে যুদ্ধ করেন যে, তাঁর সারা দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। পবিত্র রমজান মাস। তিনি সাওম পালন করছিলেন। সূর্যাস্তের সময় যখন তাঁরও জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাখরামা (রা) খোঁজ নিতে এসেছেন। আবদুল্লাহ ইবন মাখরামা (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইবন উমার, আপনি কি ইফতার করেছেন? তিনি বললেন হাঁ'। আবদুল্লাহ বললেন, 'আমার জন্যও একটু পানি আনুন না।' পানি নিয়ে ফিরে এসে দেখেন তাঁর প্রাণহীন দেহটি পড়ে আছে'। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র একচল্লিশ বছর। (আল-ইসাবা ২/৩৬৫)

ইলম, আমল, তাকওয়া ও পরহিযগারীর দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী। উসুদুল গাবা গ্রন্থকার লিখেছেন, তিনি ছিলেন মাহাত্মের অধিকারী একজন আবেদ ব্যক্তি।

তথ্যসূত্র

১· ইবন সা'দ ঃ তাবাকাত
২· ইবন হাজার আসকিলানী ঃ আল-ইসাবা
৩· ইবন হাজার আসকিলানী ঃ তাহ্জীব আত-তাহ্জীব
৪· ইবন আসীর ঃ উসুদুল গাবা
৫· ইবন আসীর ঃ তাজরীদ আসমা আস-সাহাবা
৬· আল-বালাজুরী ঃ আনসবুল আশরাফ
৭· আজ-জাহাবী ঃ তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ
৮· আজ-জাহাবী ঃ তারীখুল ইসলাম
৯· ইবন কাসীর ঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া
১০· ইবন আসাকির ঃ আত-তারীখুল কাবীর
১১· আয্-যিরিক্লী ঃ আল-আ'লাম
১২· আল-কুরতুবী ঃ আল-ইসতী'য়াব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা)
১৩· ইবন হিশাম ঃ আস-সীরাহ্
১৪· তারাবী ঃ তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক
১৫· মাওলানা ইউসুফ কান্ধালূবী ঃ হায়াতুস সাহাবা
১৬· মু'ঈনুদ্দীন আহ্মাদ নাদবী ঃ মুহাজিরীন
১৭· ডঃ আবদুর রহমান রাফত আল-বাশা ঃ- সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা
১৮· খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ ঃ রিজালুন হাওলার রাসূল
১৯· মুহাম্মাদ খিদরী বেক ঃ তারীখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যা
২০· দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই ইসলামিয়্যা (উর্দু)
২১· হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ।